শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

ফিকহি মাকালাত

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

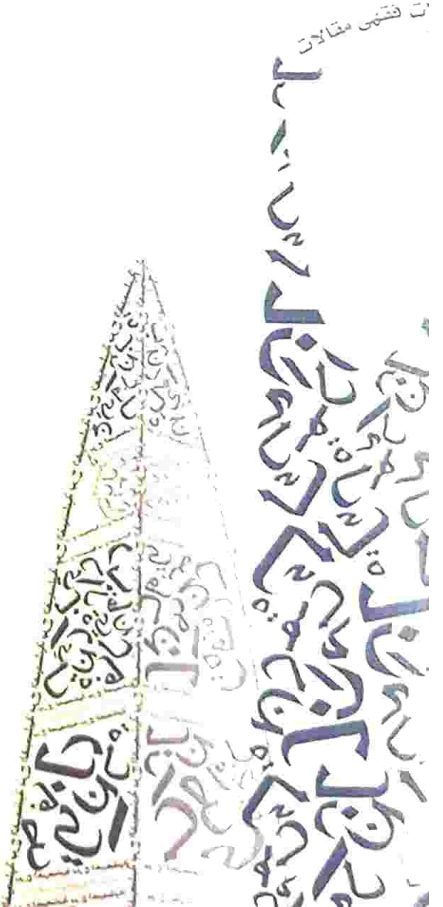

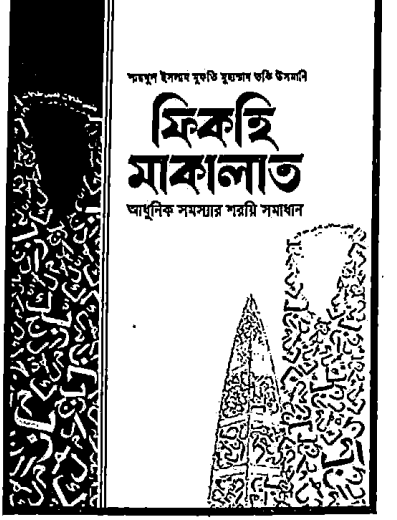

গ্রন্থ সম্পর্কে

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। আধুনিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে তার রচনা-বক্তৃতা পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক উপকার ও কল্যাণ বিতরণ করছে। 'ফিকহি মাকালাত' গ্রন্থটি শায়খুল ইসলামের সেসব রচনার সংকলন-সমষ্টি। এসব রচনার অধিকাংশ সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে আধুনিক সমস্যাবলির সমাধান তুলে ধরা হয়েছে, ফলে মুদ্রাব্যবস্থা, হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পবিত্রতা অর্জন, কাজা নামাজ, ট্রাফিক দুর্ঘটনা, মাতৃদুগ্ধ পান, আমদানি-রপ্তানি, মুদারাবা, জাকাত, জিহাদ, ভোট-নির্বাচন, পশু জবাই, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা, মানব-অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুচারুরূপে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

৬

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-৬

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

ভাষা সম্পাদনা : আহমাদ গালিব

বিষয় সম্পাদনা : মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান

বানান ও ভাষারীতি : মাকতাবাতুল ইসলাম

সম্পাদক মণ্ডলী

১. মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান। ২. মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ। ৩. মুফতি রাওয়াহা। ৪. মুফতি সাইফ আকরামি। ৫. মাওলানা আহমাদ গালিব। ৬. মাওলানা ফরিদ মাসউদ। ৭. মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ মুজাহিদ। ৮. মাওলানা হাসান আহমাদ।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

৬

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

মাকতাবাতুল ইসলাম

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-৬

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক

হাফেজ কুতুবুদ্দিন ইবনু আশ-শায়খ মুহিউদ্দিন আহমাদ

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ : মাকতাবাতুল ইসলাম

মূল্য : BD ৳ ৫১৫, US $ 12, UK £ 10

সার্বিক যোগাযোগ

মাকতাবাতুল ইসলাম

[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১, ০১৯১১৪২৫৬১৫, ০১৯১১৪২৫৮৮৬

ISBN : 978-984-91049-1-9

www.facebook/Maktabatul Islam

www.maktabatul-islam.com

FIQHI MAKALAT 1.ST

Writer : Shaikhul Islam Mufti Mohammad Taqi Osmani

Translatet by : Mufti Iliyas Bin Alauddin

একমাত্র পরিবেশক : অর্পণ প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, boibiswa.com

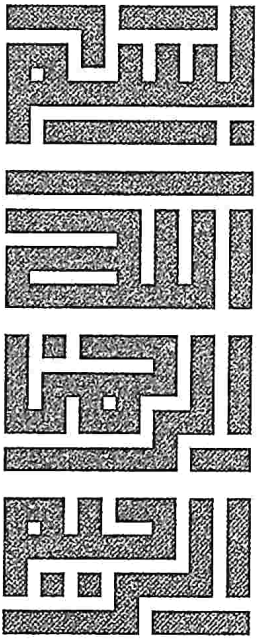
بسم
الله
الرحمن
الرحيم

প্রাক্‌কথন

আলহামদুলিল্লাহ! ফিকহি মাকালাত-এর ষষ্ঠ খণ্ড এখন আপনাদের হাতে। শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে লেখা নতুন মাকালা (প্রবন্ধ) সম্বলিত এ খণ্ডেও এমন অনেক মাকালা রয়েছে, যেগুলো লেখক আরবি ভাষায় লিখেছেন। উর্দু অনুবাদক তা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এখানে সেসব মাকালার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো—

- ট্রাফিক দুর্ঘটনার শরয়ি বিধান

  'ট্রাফিক দুর্ঘটনার শরয়ি বিধান' প্রবন্ধটি ১-৭ মুহাররম ১৪১৪ হিজরিতে ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি কর্তৃক ব্রুনাই দারুস সালাম-এ আয়োজিত অষ্টম অধিবেশনে পেশ করার জন্য 'قوائد ومسائل في حوادث المرور' শিরোনামে লেখেন। পরবর্তীকালে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়।

- ঋণ ও আর্থিক প্রমাণপত্রের বিক্রয় এবং তার শরয়ি বিকল্প

  'ঋণ ও আর্থিক প্রমাণপত্রের বিক্রয় এবং তার শরয়ি বিকল্প' 'بيع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشرعية' নামে আরবি প্রবন্ধটি মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) ১৪১৯ হিজরি সনের রজব মাসে 'ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি' কর্তৃক মানামা, বাহরাইনে অনুষ্ঠিত একাদশ সেমিনারে

পেশ করেন। পরবর্তীকালে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়।

- ইসলামি মারকাজের পক্ষ থেকে বিয়ে-বিচ্ছেদ করা

  'অমুসলিম দেশে ইসলামি মারকাজের পক্ষ থেকে বিয়ে-বিচ্ছেদ করা' প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) منع نكاح المسلمات من قبل المراكز الإسلامية في بلاد غير اسلامية শিরোনামে লেখেন। পরবর্তীকালে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

- ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের বিধান

  'ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের বিধান' প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) আরবি ভাষায় লেখেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ২-৪ ফেব্রুয়ারি মক্কা মুকাররামায় রাবেতা আলামে ইসলামির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সেমিনারে পেশ করার উদ্দেশ্যে 'سماعة الأحكام الشرعية في علاقة المسلمين بغيرهم' শিরোনামে তিনি এটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

- কী পরিমাণ দুধ পান করলে দুধপান সম্পর্কিয় হারামের বিধান প্রযোজ্য হবে?

  'কী পরিমাণ দুধ পান করলে দুধপান সম্পর্কিয় হারামের বিধান প্রযোজ্য হবে?' প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম'-এর প্রথম খণ্ডের দুধপান অধ্যায়ে লেখেন।

- ইসলামে দাসত্বের বাস্তবতা

  'ইসলামে দাসত্বের বাস্তবত' প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) 'الرق في الاسلام' শিরোনামে 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম'-এর প্রথম খণ্ডে লেখেন।

- সংশোধিত হদ বিল কী?

  কিছুদিন আগে জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে 'নারী অধিকার সংরক্ষণ' নামে একটি

বিল পাশ করা হয়েছে। এ বিলের আইনি ভেদ সম্পর্কে কেবল সেসব ব্যক্তি অবগত, যারা আইনের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। সাধারণ মানুষকে এ কথা বলা হচ্ছে যে, এ বিলের মাধ্যমে কষ্টের শিকার নারীরা সুখ ও সমৃদ্ধি পাবে। শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) 'সংশোধিত হদ বিল কী?' শিরোনামের এ প্রবন্ধে উল্লিখিত বিলের বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন। মাসিক 'আল-বালাগে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে।

- সম্মিলিত ইজতিহাদ ও তার প্রয়োজনীয়তা

  গত বছর ২ মুহাররম ১৪৩০ থেকে ৩০ মুহাররম ১৪৩০ হিজরি পর্যন্ত 'তারিখে ফাতাওয়া' শিরোনামে মক্কা মুকাররামায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়। সেখানে জামিয়া দারুল উলুম করাচির নায়েবে মুহতামিম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) 'আল-ফাতাওয়াল জামায়ি' (الفتوي الجَمَاعي) শিরোনামে আরবিতে একটি প্রবন্ধ পেশ করেন। উর্দু ভাষায় যার সারসংক্ষেপ লিখেছেন জনাব আবু সুফিয়ান সাইদ। সৌদিআরবের উর্দু পত্রিকা 'রৌশনি'তে এই সংক্ষিপ্ত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। এরপর এটি মাসিক আল-বালাগেও প্রকাশিত হয়।

পাঠকদের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, এই প্রবন্ধগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার সময় কোথাও সামান্যতম সন্দেহ হলে মূল প্রবন্ধটি দেখবেন। কারণ, অনুবাদক যদিও সঠিক অনুবাদ ও দ্বিতীয়বার দৃষ্টি বুলাতে পূর্ণ চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও বান্দার ইলম ও আমলের স্তর কোথায়?! আর লেখকের সুগভীর ইলমি প্রবন্ধের অবস্থান কোথায়?? মোটকথা, কোথাও কোনো ধরনের ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে সেটিকে বান্দার ইলমের স্বল্পতার ফল মনে করে জানিয়ে দিলে বান্দা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। সেইসঙ্গে উল্লিখিত ত্রুটিকে দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ।

—মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ মায়মান
শিক্ষক : জামিয়া দারুল উলুম করাচি
১৮ জিলহজ ১৪৩২ হি.

সূচি

ট্রাফিক দুর্ঘটনার শরয়ি বিধান-১৫

ঋণ ও ঋণপত্র বিক্রয় এবং তার শরয়ি বিধান-৬৩

অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি সংস্থাগুলোর
মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ-১১১

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো
ব্যবহারের বিধান-১২৯

কী পরিমাণ দুধপান করলে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিধান
প্রযোজ্য হবে?-১৭৫

ইসলামে দাসত্বের বাস্তবতা-১৯৫

সংশোধিত হদ বিল কী? নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল-২১৯

সম্মিলিত ইজতিহাদ-২৩৯

ও তার প্রয়োজনীয়তা-২৩৯

বিস্তারিত সূচি

ট্রাফিক দুর্ঘটনার শরয়ি বিধান ১৭
ইসলামি শরিয়তে ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ ১৯
ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ফিকহি মূলনীতিসমূহ ২২
প্রথম মূলনীতি ২২
দ্বিতীয় মূলনীতি ২৪
সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্বারা কী উদ্দেশ্য? ২৮
তৃতীয় মূলনীতি ৩৮
চতুর্থ মূলনীতি ৪০
প্রথম পয়েন্ট ৪১
দ্বিতীয় পয়েন্ট ৪৬
গাড়ি দুর্ঘটনা ৫০
গাড়ি দুর্ঘটনায় ড্রাইভারের দায়বদ্ধতা ৫০
চালকের ওপর জরিমানা আরোপ করার দলিল ৬০

ঋণ ও ঋণপত্র বিক্রয় এবং তার শরয়ি বিধান ৬৫
(বায়উল কালি বিল-কালি)
ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় ৬৭
ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় করা ৭৩
ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা ৭৫
ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের বিষয়ে মালিকি মাজহাব ৭৯
শাফিয়ি মাজহাব ৮১
বর্তমান সময়ের আর্থিক ঋণপত্র ৮৫
বন্ড ৮৫
বিল অব এক্সচেঞ্জ ৮৮
'বিল অব এক্সচেঞ্জ' বিক্রয়ের হুকুমের সারকথা ৯৩
মালয়েশিয়ার কিছু আলেমের অবস্থান ৯৪
হাওয়ালার ভিত্তিতে 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ডিসকাউন্টের বিধান ১০১

ঋণ বিক্রয়ের বিকল্প পদ্ধতি ১০২
বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টের বিকল্প পদ্ধতি ১০২
কোম্পানির পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত বন্ডের বিকল্প পদ্ধতি ১০৪
রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত বন্ডের বিকল্প পদ্ধতি ১০৫
মুশারাকা বা মুদারাবার সুকুক ১০৬
ইজারা সুকুক ১০৬
রাষ্ট্রীয় আর্থিক বিনিয়োগ ফান্ড ১০৭
সুদমুক্ত ঋণ সার্টিফিকেট ১০৮

অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ ১১৩
দ্বিতীয় প্রশ্ন : ১১৬
মুসলিম জামাতের সদস্য সংখ্যা ১২৩
মুসলিম জামাতের গুণাবলি ১২৫
জামাতের সদস্যদের মতবিরোধের সময় করণীয় ১২৫
বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদে মুসলিম জামাতের ক্ষমতা ১২৭

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের বিধান ১৩১
আহলে জিম্মার সঙ্গে আচরণবিধি ১৩৩
নিরাপদ পরিস্থিতিতে অমুসলিম দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ১৪১
ন্যায় ও ইনসাফ ১৪২
সহমর্মিতা ১৪৮
ভালো কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করা ১৫০
অমুসলিম যোদ্ধাদের সঙ্গে মুসলিমদের ব্যবহার ১৬০
যুদ্ধ অবস্থায় চালু থাকা নীতির সংশোধন ১৬৪
যুদ্ধাবস্থায় ন্যায় ও ইনসাফ ঠিক রাখা ১৬৬

কী পরিমাণ দুধপান করলে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিধান প্রযোজ্য হবে? ১৭৭
প্রথম মাজহাব ১৭৮
দ্বিতীয় মাজহাব ১৭৮
তৃতীয় মাজহাব ১৭৯
চতুর্থ মাজহাব ১৭৯

ইসলামে দাসত্বের বাস্তবতা ১৯৭
দাসত্বের বিধান কি রহিত হয়ে গেছে? ২০৭

সংশোধিত হদ বিল কী? নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল ২২১
অশ্লীলতা ২২৮
'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' কিছু অতিরিক্ত সংযোজন ২৩৩
সারকথা ২৩৭

সম্মিলিত ইজতিহাদ ও তার প্রয়োজনীয়তা ২৪১
সুখবর! ২৫৬

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

ট্রাফিক দুর্ঘটনার শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

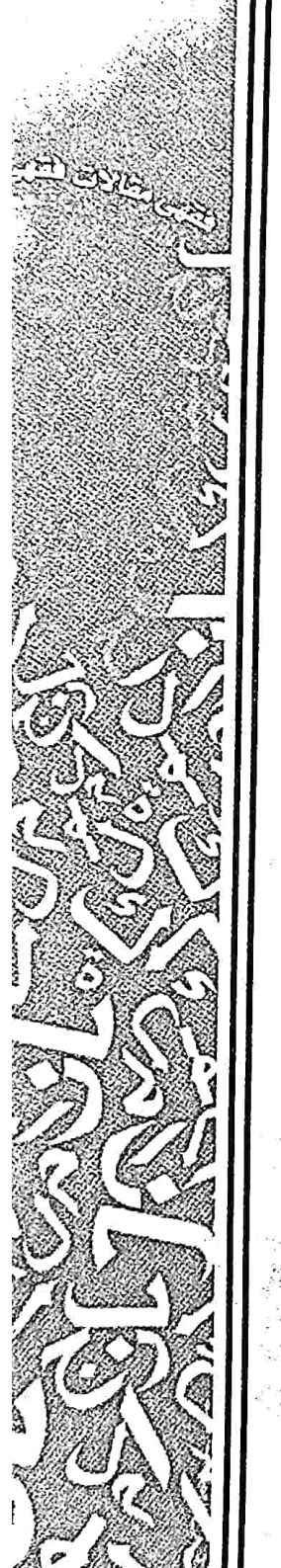

'ট্রাফিক দুর্ঘটনার শরয়ি বিধান' প্রবন্ধটি ১-৭ মুহাররম ১৪১৪ হিজরিতে ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি কর্তৃক ব্রুনাই দারুস সালাম-এ আয়োজিত অষ্টম অধিবেশনে পেশ করার জন্য 'قوائد ومسائل في حوادث المرور' শিরোনামে রচনা করেন। পরবর্তীকালে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়।

—আবদুল্লাহ মায়মান

ট্রাফিক দুর্ঘটনার শরয়ি বিধান

হামদ ও সালাতের পর—

ট্রাফিক দুর্ঘটনা বর্তমানের ফিকহি বিষয়সমূহের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। দুর্ঘটনার প্রকৃতি ও দুর্ঘটনার বিভিন্ন ধরনের কারণে এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজন পড়ে। আধুনিক ও দ্রুত গতিসম্পন্ন যানবাহনের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনার পরিমাণ বেড়ে গেছে। এ কারণে অধিকাংশ দেশে আইনপ্রণয়ন করা হয়েছে।

বিধিবিধানে ইনসাফ ও নিরাপত্তার ধারকবাহক ইসলামি শরিয়ত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে উদাসীন থাকেনি; বরং এর জন্য নিজস্ব নিয়মনীতি ও রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, যার আলোকে নিত্যনতুন ঘটা দুর্ঘটনার বিধান জানতে সক্ষম হবো। উপর্যুক্ত বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী ফকিহগণ 'দিয়ত' নামক পরিচ্ছেদে কুরআন-হাদিসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে এমন সব মূলনীতি ও শাখাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার মাধ্যমে ঘটনার রূপায়নে তাদের দৃষ্টির গভীরতা এবং একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনাকে পৃথক করার ব্যাপারে তাদের পাণ্ডিত্যের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ফিকহি মাজহাব অধ্যয়নের পর এ বিষয়টি সামনে আসে যে, ফিকহি বিধিবিধানের মধ্যে এ পরিচ্ছেদটি এমন একটি পরিচ্ছেদ, যেখানে ফকিহদের মতানৈক্য খুবই কম। বিভিন্ন মাজহাবের কিতাবাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে এই মাসআলার বিভিন্ন

শাখাগত মাসআলা নিয়ে বিশ্লেষণকারীকে এ কথার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, এ মাসআলাগুলো একটি বাতি থেকেই বিচ্ছুরিত ও একই ধাঁচে সাজানো হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে মতানৈক্য তুলনামূলক কম।

কিন্তু এটি স্বাভাবিক কথা যে, ফকিহগণ যে যুগে এমন ঘটনার সংকলন করেছেন, সে যুগে বর্তমানের মতো দ্রুতগতির যানবাহনের অস্তিত্ব ছিলো না। যেমন : মোটরসাইকেল, গাড়ি, রেলগাড়ি, বিমান ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিলো না। যাতায়াতের এ আধুনিক নিয়মের কোনো কিছুই ছিলো না। বিধায় যুক্তিসঙ্গত কারণেই ফকিহগণ তাদের যুগের যানবাহন কেন্দ্রিক আলোচনা করেছেন। যেমন : চতুষ্পদ জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণীর গাড়ি, পালতোলা জাহাজ ও নৌযান ইত্যাদি। অর্থাৎ, তারা যে পরিবেশে জীবনযাপন করেছেন, সে পরিবেশের যাতায়াত ব্যবস্থার উপকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেসব ফকিহদের আলোচনা কুরআন-হাদিস, ইজমা, কিয়াসের ওপর নির্ভর ছিলো। তাদের আলোচনা আমাদের জন্য এমন ব্যাপক নীতির দিশা দিয়েছে, যার আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাতায়াত-ব্যবস্থার নিত্যনতুন উপকরণের মাসাআলার ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব।

সুতরাং বর্তমান সময়ের ফকিহদের জন্য আবশ্যক হলো উল্লিখিত ব্যাপক নীতিমালা সম্পর্কে জেনে সেগুলোকে বর্তমানের জীবন-ব্যবস্থার ওপর প্রয়োগ করা। সেইসঙ্গে সেসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে, যার কারণে আধুনিক ও আগেকার যাতায়াত-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আর সেসব মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে ট্রাফিক-ব্যবস্থার সব শাখাগত মাসআলাকে ব্যাখ্যা করবে। যেন যাতায়াত-ব্যবস্থার সব শাখাগত মাসআলা ও বিধানসমূহ ভিন্ন ভিন্নভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিষয়টি যেহেতু বর্তমান সময়ের আলেমদের কিতাবাদিতে গবেষণা কেন্দ্রিক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির আলোকে আলোচিত হয়নি তাই সেটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি সে শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেটি পূরণে আমার এ ছোট্ট প্রবন্ধ কিছুটা চেষ্টা ও সহযোগিতা করবে।

وأسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفقني للحق و الصواب، ويبعدني عن الزلل والخطل، وهو المستعان و عليه التكيان.

ইসলামি শরিয়তে ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ

ইসলামি শরিয়তের একটি নীতি হলো, কারও জন্য এমন কোনো কাজ করা জায়েজ নেই, যার কারণে অন্য ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেউ যদি তার নিজের কাজের মাধ্যমে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে আইনানুযায়ী সে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দেবে। তবে বিশেষ কিছু অবস্থা এ নীতি থেকে ব্যতিক্রম। যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এই নীতিটি কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআন থেকে নিচের আয়াতটিকে এ বিষয়ের স্পষ্ট দলিল হিসেবে পেশ করা যায়—

﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ . فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾

'এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করেছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিলো। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিলো। আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতে তো) আমি উভয়কেই হিকমত ও ইলম দান করেছিলাম।'

'নাফাশ' বলা হয় নিশাচরকে। ইবনু জারির রহ. তার তাফসির গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন। বর্ণিত আয়াতে যে ক্ষেতের কথা বলা হয়েছে, সেটি ছিলো আঙুর বাগান। যার থোকাও বেরিয়ে এসেছিলো এবং শেষে সে ক্ষেতটি নষ্ট করে দিয়েছিলো। দাউদ আ. মেষগুলো আঙুর বাগানের মালিককে দিয়ে দেওয়ার ফায়সালা করলেন। অর্থাৎ, আঙুর বাগানের মালিকের যে ক্ষতি হয়েছে, তার পরিবর্তে তাকে ছাগলের মালিক বানিয়ে দেওয়া হলো। ইমাম কুরতুবি রহ. তার তাফসির গ্রন্থে বর্ণনা করেন, দাউদ আ. দেখলেন, ছাগলের মূল্য বাগানের ক্ষতির পরিমাণের প্রায় কাছাকাছি। (এ জন্য এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন) তবে সুলাইমান আ. ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, আঙুরের বাগান ছাগলের মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হোক। ছাগলের মালিক ওই বাগান দেখভাল করবে সেটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত আর এ সময়ের মধ্যে ছাগলগুলো বাগানের মালিকের কাছে থাকবে। যেন সে ছাগলগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে।

পবিত্র আয়াত এ দিকে ইঙ্গিত করেছে যে, এই ঘটনার হুকুমের ক্ষেত্রে দাউদ আ.

ও সুলাইমান আ.-এর সিদ্ধান্ত ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। যদিও কুরআন তাদের সিদ্ধান্তের বিশদ আলোচনা করেনি। তবে সুলাইমান আ.-এর সিদ্ধান্তটি যে সুন্দর তা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে।

বিভিন্ন তাফসির অধ্যয়নে এ কথা বুঝা যায় যে, এ ঘটনাতে দাউদ আ. ও সুলাইমান আ.-এর উদ্দেশ্য ছিলো ওই ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপ করা, যার ছাগল আঙুর বাগান নষ্ট করেছে। এবং জরিমানার পরিমাণ এমন হতে হবে যেন ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ বরাবর হয়। আর সে সমতা সৃষ্টির পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে যদিও মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। তারপরও বর্ণিত আয়াতের ঘটনাটি একটি ব্যাপক মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর সেটি হলো, যে ব্যক্তি অন্যের জীবন বা সম্পদের কোনো ক্ষতি করবে, সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

হাদিসে নববিতে এ বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট হাদিস হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসটি—

لا ضرر ولا ضرار.

'নিজের এবং অন্যের ক্ষতিসাধন (ইসলামে জায়েজ) নেই।'[১]

নিজের ক্ষতি করা বা অন্যের ক্ষতির কারণ হওয়াকে হারাম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এ হাদিসটি নিঃসন্দেহে ইসলামি শরিয়তের মূলনীতিসমূহের অন্যতম একটি মৌলিক নীতির কথা বলে। আমরা যদি হাদিসটি নিয়ে একটু চিন্তা করি, তাহলে এ কথা স্পষ্ট হবে যে, হাদিসটি শুধু অন্যের ক্ষতি করা হারাম সাব্যস্ত করার ওপরই ক্ষান্ত হয়নি বরং এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করে, যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতির কারণ হবে, তার ওপরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। তা এ কারণে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নীতিটিকে শুধু 'না' সূচক শব্দে

---

[১] সুনানে ইবনু মাজাহ, অধ্যায় : আহকাম, হাদিস : ২৩৪০। মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩২৭। মুয়াত্তা মালেক, অধ্যায় : আকজিয়া, পরিচ্ছেদ : কজা ফিল মুরাফ্ফাক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২২। (তানবিরুল হাওয়ালেকসহ) আল্লামা বুসিরি রহ. জাওয়াইদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮০ এ বলেন, হাদিসটির সূত্রের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে সেটি 'মুনকাতে'। কেননা ইসহাক ইবনু ওলিদ উবাদা ইবনু সামেত রা.-কে পাননি। যেমনটি ইমাম তিরমিজি ও ইবনু আদি রহ. বলেছেন। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২০৫। তবে উল্লিখিত সূত্র ছাড়াও হাদিসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে। যেমনটি আল্লামা সাখাবি রহ.-এর মাকাসেদে হাসানা, পৃষ্ঠা : ৪৬৮, হাদিস : ১৩১০-এ উল্লেখ আছে।

বয়ান করেই ক্ষান্ত হননি। যা শুধু এ কাজটিকে হারাম হওয়ার কথা বলে। বরং তিনি 'নফি জিনস' (সত্তাগত না-বাচক) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর এর মাধ্যমে এ সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের যেমন অন্যের ক্ষতি করা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক, তেমনি কারও থেকে যদি এমন ক্ষতি সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে সে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। হয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বস্তুটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেবে অথবা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হলে ক্ষতির বদলা দেবে। যেন তার ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির ক্ষতির বিনিময় হয়।

ক্ষতিসাধনকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে 'দিয়তের' সেসব বিধান প্রমাণ বহন করে, কুরআন-হাদিসে যার বিশদ বিবরণ রয়েছে, সেসব বিস্তারিত বিধানের কিছু বিধান আমাদের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার একটি হলো ইমাম মালিক রহ.-এর মুয়াত্তা কিতাবের আকজিয়া অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান—

عن حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء بن عازب . رضي الله عنه . دخلت حائط رجل،فأفسدت فيه،فقضي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وإن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها.

'হারাম ইবনু সাদ ইবনু মুহাইয়িসাহ রা. থেকে বর্ণিত। কোনো একদিন বারা ইবনু আজেব রা.-এর উটনী জনৈক ব্যক্তির বাগান নষ্ট করে ফেলে। সে ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সিদ্ধান্ত দেন যে, দিনের বেলায় সেটি সংরক্ষণ করা বাগানের মালিকের দায়িত্ব। আর রাতে কোনো প্রাণী বাগান নষ্ট করলে সে প্রাণীর মালিক সেটির দায়ভার নেবে।'

বর্ণিত হাদিসটি এ কথার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ যে, কোনো ব্যক্তি অন্যের ক্ষতির কারণ হলে, তাকে সে ক্ষতির দায়ভার নিতে হবে।

একইভাবে ইমাম দারাকুতনি রহ. তার সুনানে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেন—

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن

> ‘নোমান ইবনু বাশির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি তার বাহনকে মুসলিমদের রাস্তার কোনো এক রাস্তায় কিংবা বাজারে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং সে বাহন হাত কিংবা পায়ের মাধ্যমে কাউকে আঘাত করে, তাহলে বাহনের মালিক তার দায় গ্রহণ করবে।[২]

বর্ণিত হাদিসের একজন বর্ণনাকারী সারি ইবনু ইসমাইল হামাজানি রহ. দুর্বল হওয়ার কারণে যদিও সমালোচনা রয়েছে তবে হাদিসের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অতীত ও বর্তমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ একমত। এ সকল মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ফকিহ ও কাজি সাহাবি ও তাবিয়িগণ অন্যের ক্ষতিসাধনকারীর ওপর জরিমানা আরোপ করেছেন। ‘দিয়ত’ পরিচ্ছেদে তাদের অনেক সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া বিদ্যমান। যেগুলো হাদিসের কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

এ সকল মূলনীতি, সিদ্ধান্ত ও ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে মুতাআখখিরিন ফকিহগণ এই অধ্যায়ের বিভিন্ন ফিকহি কায়দা বের করেছেন। আমি সেসব কায়দাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ ট্রাফিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সেগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা উপযুক্ত মনে করছি।

ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ফিকহি মূলনীতিসমূহ

প্রথম মূলনীতি

নিরাপত্তা বজায় রাখার শর্তে মহাসড়কে চলাচল করা মুবাহ (বৈধ) এ নীতিটি অনেক ফকিহ উল্লেখ করেছেন। যার সারাংশ হলো, সড়কে চলাচল করা সব মানুষের অধিকার। কিন্তু তার অধিকারের বিষয়টি এ শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত যে, তার কারণে অন্য কারও এমন কোনো ক্ষতিসাধন হবে না, যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। খালিদ আতাসি রহ. বলেন—

> والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة، بمنزلة المشي، لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه و في حق غيره من وجه،فالإباحة مقيدة بالسلامة.

[২] সুনানে দারাকুতনি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৯। অধ্যায় : দিয়াত ও হুদুদ। হাদিস : ২৮৫।

وإنما تقيدت بها فيما يمكن التحرز عنه، دون ما لا يمكن التحرز عنه، لأنا لو شرطنا عليه السلامة عما لا يمكن التحرز عنه يتعذر عليه استيفاء حقه، لأنه يمتنع عن المشي والسير مخافة أن يبتلي بما لا يمكن أن يتحرزعنه، والتحرز عن الوطء والاصابة بإلبد أو الرجل و الكدم . وهو العض بمقدم الأسنان . و الخبط و . وهوالضرب باليد . والصدم . وهو الضرب بنفس الدابة . وما أشبه ذلك في وسع الراكب، إذا أمعن النظر في ذلك، وأما مالا يمكن التحرز عنه، كما إذا نفحت برجلها، يعني ضربت بحافرها أو ذنبها، فلا يضمن.[৩]

'নিরাপত্তা বজায় রাখার শর্তে রাস্তায় যাতায়াত করা মুবাহ। এটি পায়ে হেঁটে চলার স্থলাভিষিক্ত। কারণ, রাস্তায় চলাচলের অধিকার সবার জন্য সমান। সুতরাং চলাচলকারী একদিকে নিজের অধিকার ব্যবহার করছে, আবার অন্যদিকে অন্যের অধিকারও ব্যবহার করছে। বিধায় তার এ চলাচল নিরাপত্তা বজায় রাখার শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত।

কিন্তু নিরাপত্তা বজায় রাখার শর্ত সেসব কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেসব কাজের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব। যে ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা অসম্ভব সে ক্ষেত্রে শর্তটি প্রযোজ্য নয়। কেননা আমরা যদি নিরাপত্তা বজায় রাখার শর্তটিকে সেসব ক্ষেত্রেও লাগিয়ে দিই, যেখানে দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা অসম্ভব, তাহলে চলাচলকারী তার অধিকার ব্যবহারে সক্ষম হবে না। কারণ, সে এ আশঙ্কায় রাস্তায় চলাচল থেকে বিরত থাকবে যে, কোথাও না আবার এমন কাজের শিকার হয়ে যায়, যা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। পদদলিত করা, হাত-পা দিয়ে আঘাত করা, দাঁত দিয়ে দংশন করা, নিজ বাহন দ্বারা কাউকে কষ্ট দেওয়া, এ ধরনের আরও যেসব কাজ আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আরোহী সচেতন হলে সেগুলো থেকে বাঁচা অসম্ভব নয়। (কাজেই এসব ক্ষেত্রে আরোহী দায়বদ্ধ থাকবে) আর এমন সব আমল যা থেকে বাঁচা সম্ভব নয় যেমন : বাহন নিজ খুর দ্বারা বা লেজ দ্বারা কাউকে আঘাত করা। এ ধরনের ক্ষেত্রে আরোহী দায়বদ্ধ থাকবে না।'[৪]

---

[৩] শরহুল মাজাল্লাহ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৪, মাদ্দাহ : ৯৩২।

[৪] শরহুল মাজাল্লাহ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৪, মাদ্দাহ : ৯৩২।

দ্বিতীয় মূলনীতি

'কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তি কাজে সীমালঙ্ঘন না করলেও দায়বদ্ধ থাকবে' এ নীতিটির মূল কথা হলো, যে ব্যক্তি সরাসরি অন্যের ক্ষতি করবে, সে ওই ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করবে। যদিও ক্ষতিসাধনকারী কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি না করে থাকে। অর্থাৎ, সত্তাগতভাবে তার কাজটি নিষিদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও তাকে দায়ভার নিতে হবে। যেমন : ঘুমন্ত ব্যক্তি অন্যের ওপর গড়িয়ে পড়ার কারণে ওই ব্যক্তির মারা যাওয়া। সত্তাগতভাবে ঘুম কোনো নিষিদ্ধ আমল না হওয়ার পরেও সে ব্যক্তি সরাসরি হত্যার সঙ্গে জড়িত হওয়ায় তাকে 'দিয়ত' (জরিমানা) দিতে হবে।

এ নীতিটিকে অন্যান্য ফকিহও এ ধরনের বাক্যে বর্ণনা করেছেন। নীতিটির বিষয়বস্তুর ওপর সব ফকিহ একমত। ক্ষতির জরিমানা বিষয়ে অনুসরণীয় নীতিসমূহের মধ্য থেকে এ নীতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। তবে কখনো কখনো নীতিটি বুঝতে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং তা শাখাগত মাসআলায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হতে হয়। তাই নীতিটির সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে সেটিকে গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

১. এ নীতির ব্যাপারে এদিক থেকে প্রাথমিক সংশয় সৃষ্টি হয় যে, অনেক ফকিহ নীতিটিকে নিচের শব্দমালায় ব্যাক্ত করেন।

المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

'কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তি দায়বদ্ধ হবে। যদিও সে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি না করে।' 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহতে' (مجلة الأحكام العدلية) ৯২ নম্বর ধারায় নীতিটি এ শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে—কিছু আলেম এ নীতিটির এমন ব্যাখ্যা করেন যে, কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তি দায়বদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কাজটি তার ইচ্ছাকৃতভাবে করা শর্ত নয়। বরং দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো কর্তার সীমালঙ্ঘন হওয়া।'

শায়খ আহমাদ জারকা রহ. 'শরহুল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যা' কিতাবে বলেন—

المباشر للفعل...ضامن لما أتلف بفعله، إذا كان متعديا فيه.

'কোনো কর্তা তার কাজের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুর ব্যাপারে তখন দায়বদ্ধ হবে, যখন সে তার কাজে সীমালঙ্ঘন করবে।'

এখান থেকে বুঝা যায় যে, সরাসরি কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে ওই কাজের মাধ্যমে ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ করার জন্য তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন পাওয়া শর্ত। অথচ ফকিহদের বড়ো একটি অংশ এ কথা বলেছেন যে, কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করার জন্য তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন পাওয়া শর্ত নয়। ইমাম জায়লায়ি রহ. 'তাবইনুল হাকাইক' কিতাবে লেখেন—

وغيره تسبيب، وفيه يشترط التعدي، فصار كحفر البئر في ملكه وفي المباشرة لا يشترط.

'সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়াও দ্বিতীয় একটি পদ্ধতি হলো কাজের কারণ হওয়া। সে ক্ষেত্রে তার ওপর জরিমানা আরোপের জন্য তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন পাওয়া শর্ত। যেমন : নিজের মালিকানা জমিতে কূপ খনন করা। (এখানে সীমালঙ্ঘন নেই) অবশ্য সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করার জন্য সীমালঙ্ঘন শর্ত নয়।'[৫]

ইবনু গানিম বাগদাদি রহ. বলেন—

المباشر ضامن، وإن لم يتعمد ولم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدي.

'সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি তার কৃত কাজের ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ হবে। যদিও সে কাজে তার ইচ্ছে বা সীমালঙ্ঘন না থাকে। অবশ্য কাজের কারণ হিসেবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কেবল সীমালঙ্ঘন করলে ক্ষতির ব্যাপারে সে দায়বদ্ধ হবে।'[৬]

শায়খ মোস্তফা জারকা রহ. তার কিতাব (الفعل الضار والضمان فيه) 'আল-ফে'লুজ জর ওয়াজজিমান ফিহি'-এ এই বৈপরিত্যের সমাধান পেশ করেছেন। যার সারাংশ হলো, সীমালঙ্ঘনের দুটি অর্থ রয়েছে। এ দুটির মাঝে পার্থক্য করা আবশ্যক।

সীমালঙ্ঘনের একটি অর্থ হলো, অন্যের অধিকার বা সংরক্ষিত মালিকানাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা।

---

[৫] তাবইনুল হাকাইক, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪৯।

[৬] মাজমাউজ জামানাত, পরিচ্ছেদ : ১২। উপ-পরিচ্ছেদ : ১।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, শরিয়তের দৃষ্টিতে কাজটি সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়া। চাই সে অন্যের অধিকার বা মালিকানায় সীমালঙ্ঘনকারী হোক বা না হোক।

সীমালঙ্ঘনের প্রথম অর্থ অনুযায়ী সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ সাব্যস্ত করার জন্যও উল্লিখিত সীমালঙ্ঘন পাওয়া শর্ত। আর সীমালঙ্ঘনের দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ করতে তার সীমালঙ্ঘন পাওয়া শর্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে অন্যের খাবার অনুমতি ছাড়া খেয়ে নিয়েছে, তাহলে তার এ কাজটি জায়েজ হয়েছে। বরং এরূপ করা তার ওপর ওয়াজিব ছিলো। এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তিতে তার থেকে কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রথম অর্থের আলোকে তার থেকে সীমালঙ্ঘন পাওয়া গেছে। কারণ, সে অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করেছে। কাজেই এখন খাবারের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি অজ্ঞান বা বেহুঁশ হয়ে কিংবা পা পিছলে অন্যের সম্পদের ওপর পড়ে সেটি নষ্ট করে দেয়, তাহলে সে ওই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেবে। যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে সে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করেনি।

শায়খ মোস্তফা জারকা রহ. যে পার্থক্যের কথা বলেছেন সেটি খুবই সুন্দর ও স্পষ্ট। সুতরাং কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করার ব্যাপারে যারা সীমালঙ্ঘনকে শর্ত করেছেন এবং যারা করেননি এই পার্থক্যের কারণে তাদের উভয়ের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গেলো। এখন সারকথা হলো, সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি যদি কারও জীবন, দেহ বা সম্পদে কোনো ধরনের ক্ষতি করে, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। যদিও কাজটি সত্তাগতভাবে বৈধ হয় বা সে ব্যাপারে তার কোনো ইচ্ছে না থাকে।

২. উপর্যুক্ত নীতি বোঝার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে সংশয় সৃষ্টি হয় তা হলো কোনো কোনো ফকিহ দ্বিতীয় একটি নীতি পেশ করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেটি বর্ণিত নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। নীতিটি এই—

الجواز الشرعي ينافي الضمان.

‘শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো কাজ বৈধ বা জায়েজ হওয়া জরিমানা

আরোপকে বাধাগ্রস্ত করে।' 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ'-এর ৯১ নম্বর ধারায় নীতিটি উল্লেখ আছে।

এ নীতিটি বাহ্যিকভাবে ওই নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যার মাধ্যমে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে শরয়ি দৃষ্টিতে বৈধ কাজের কারণেও ক্ষতির দায়বদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উল্লিখিত নীতির ফলাফল সেসব সাধারণ অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো নিরাপত্তা বজায় রাখার শর্তে শর্তযুক্ত নয়। তবে যেসব অধিকার নিরাপত্তা বজায় রাখার শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত সেসব ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য নয়। যেমন : রাস্তায় যাতায়াতের অধিকার। এ ধরণের অধিকারের ক্ষেত্রে শুধু বৈধ হওয়া জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। পার্থক্যটি শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. এই মাসআলার মধ্যে আলোচনা করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে বসে আছে। তার কারণে অন্য কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এ ক্ষেত্রে তিনি বলেন—

وإذا قعد الرجل في مسجد لحديث أو نام فيه في غير صلاة أو مر فيه فهو ضامن لما أصاب كما يضمن في الطريق الأعظم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه فيه لأنه لو كان مصليا في هذه البقعة لم يضمن ما يعطب به فكذلك إذا كان جالسا فيه لغير الصلاة بمنزلة الجالس في ملكه ... فيكون ذلك مباحا مطلقا والمباح المطلق لا يكون سببا لوجوب الضمان على الحر وأبو حنيفة يقول المسجد معد للصلاة والقعود والنوم فيه لغير الصلاة مقيد بشرط السلامة وإن كان ذلك مباحا أو مندوبا إليه.

'যদি কোনো ব্যক্তি কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্যে মসজিদে বসে থাকে বা নামাজের বাইরে সেখানে ঘুমিয়ে যায়। অথবা মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করে আর এসব কারণে তার মাধ্যমে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সে ওই ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। যেমন মহাসড়কে চলার সময় অন্যের ক্ষতি করলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী সে দায়বদ্ধ থাকবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমতে সে ব্যক্তি দায়বদ্ধ থাকবে না। তাদের দলিল হলো, ওই সময় সে যদি নামাজ পড়তো এবং সে অবস্থায় যদি তার কারণে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতো,

তাহলে সে ক্ষতির বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকতো না। একইভাবে নামাজের বাইরেও যদি মসজিদে বসে থাকে, তাহলে তারও অনুরূপ বিধান হবে। সে ব্যক্তির বিষয়টি এমন, যেন সে তার মালিকানাধীন জায়গায় বসে আছে। সুতরাং সেখানে বসা তার জন্য বৈধ, আর কোনো বৈধ কাজ কোনো স্বাধীন মানুষের ওপর জরিমানা আরোপের কারণ হতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, মসজিদ প্রস্তুত করা হয়েছে নামাজের জন্য। সুতরাং নামাজের অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় মসজিদে বসা বা ঘুমানো নিরাপত্তার শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত হবে। যদিও তার জন্য সেখানে বসা বৈধ ও উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত।'[৭]

সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উল্লিখিত দুটি বিষয় স্পষ্ট হওয়ার পর এ কথাটি সামনে আসলো যে, সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করতে কোনো শর্ত নেই। তবে তার কৃত ক্ষতিটি সংরক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থানে হতে হবে। চাই কাজটি সত্তাগতভাবে বৈধ হোক বা নিষিদ্ধ হোক। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা জরুরি মনে করছি। আর সেটি হলো, নীতিটি বাস্তবায়ন করতে হলে তার জন্য আবশ্যক হলো সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সঠিক উদ্দেশ্য পাওয়া যাওয়া। তাই সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সঠিক উদ্দেশ্য বোঝা আবশ্যক। ফকিহগণ নিচের ভাষায় (মুবাশির) কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন—

حد المباشر : أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل المختار.

'মুবাশিরের সংজ্ঞা হলো, তার কৃত কাজের কারণে এমনভাবে ক্ষতি হবে যে, কাজ ও ক্ষতির মাঝে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী কোনো কর্তার কাজের অনুপ্রবেশ ঘটবে না।'[৮]

সুতরাং কোনো ব্যক্তি তখনই তার কৃত কাজের কারণে ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ

[৭] মাবসুত, (আল্লামা সারাখসি রহ.) খণ্ড : ২৭, পৃষ্ঠা : ২৫। পরিচ্ছেদ : মসজিদ ও বাজারে সংঘটিত বিষয়...।

[৮] শরহুল আশবাহ ওয়ান নাজাইর, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৬।

থাকবে, যখন তার সঙ্গে ক্ষতিসাধনের সম্পর্ক করা সঠিক হবে এবং তার কৃতকাজ ও ক্ষতি সাধনের মাঝে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী কোনো কর্তার কর্ম অনুপ্রবেশ করবে না। যদি স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী কোনো কর্তার কর্ম অনুপ্রবেশ করে, তাহলে সে ব্যক্তি (মুবাশির) সরাসরি কর্তা বলে প্রমাণিত হবে না। বিধায় এমন (মুবাশির) কর্তা ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ হবে না। ফকিহগণ কর্তৃক 'জেনায়াত' অধ্যায়ে উল্লিখিত শাখাগত মাসআলাগুলোতে বিষয়টির স্পষ্টতা মেলে।

১. খালেদ আতাসি রহ. তার 'শরহু মাজাল্লা' কিতাবে বলেন—

وإن الدابة إذا وطئت بيدها أو برجلها وهو راكبها، يضمن ولو في ملكه، لأن هذا مباشرة يضاف التلف إلى تسييرهو عدم ضبطه، إلا إذا جمحت بحيث ليس في إمكانه ردها.

'প্রাণী যদি তার হাত (সামনের পা) কিংবা পায়ের মাধ্যমে কাউকে আঘাত করে, তাহলে চালক তার ক্ষতিপূরণ দেবে। যদিও সেটি তার মালিকানাধীন হোক না কেন। কেননা এটি (مباشر) সরাসরি সংঘটন করা। যেখানে ক্ষতির ব্যাপারটি প্রাণীর চালকের দিকে তাকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে না পারার কারণে সম্পৃক্ত হবে। তবে প্রাণীটি যদি এমন অবাধ্য হয়ে যায় যে, তাকে আয়ত্বে আনা চালকের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে চালক দায়বদ্ধ থাকবে না।'

বাগদাদি রহ. 'মাজমাউজ জামানা' নামক কিতাবে এ মাসআলার মূল উৎস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

سئل الإمام ابو الفضل الكرماني: سكران جمح به فرسه فاصطدم بإنسان فمات، أجاب: إن كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له، فلا يضاف سيره إليه، فلا يضمن، قال: وكذا غير السكران إذا لم يقدر على المنع.

'ইমাম আবুল ফজল কিরমানি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, জনৈক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলো এমতাবস্থায় ঘোড়াটি উম্মাদ হয়ে কাউকে আঘাত করলে সে মারা যায়। (এ ক্ষেত্রে হুকুম কী?) তিনি উত্তর দিলেন, ওই ব্যক্তি যদি ঘোড়াকে আয়ত্বে আনতে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে ঘোড়ার চালক হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে না এবং ঘোড়া পরিচালনার বিষয়টিও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না। ফলে সে

কোনো ক্ষতিপূরণ দেবে না। এরপর বলেন, নেশাহীন ব্যক্তিও যদি ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে তার ক্ষেত্রেও এমন হুকুম হবে।' (তার ওপরও জরিমানা ওয়াজিব হবে না)[৯]

হাম্বালি মাজহাবের ফকিহদের মধ্য থেকে ইবনু মুফলিহ রহ. বলেন—

إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن.[১০]

'চালকের সীমালঙ্ঘন ছাড়া যদি বাহনটি তার অবাধ্য হয়, তাহলে চালকের ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না।'[১১]

হানাফি মাজহাবের ফকিহগণের মধ্যে কাসানি রহ. বলেন—

لو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصاب في فورها ذلك فلا ضمان عليه، لقوله عليه السلام: العجماء جبار، أي البهيمة جرحها جبار، لأنه لا صنع له في نفارها وانفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولد منه لا يكون مضمونا.

'যদি কারও পশু ভেগে যায় এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে ওই সময়ে পশু যে ক্ষতি করবে মালিকের ওপর তার জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে, পশুর মাধ্যমে ক্ষতি হলে সেটি ক্ষমাযোগ্য। কারণ, পশুটি অবাধ্য হওয়া এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার মধ্যে মালিকের কোনো হাত নেই। আর তার পক্ষে পশুর আচরণ থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। সুতরাং পশুর মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতের কোনো জরিমানা দিতে হবে না।'[১২]

এ মাসআলাতে ফিকহে শাফিয়িতে দু-ধরনের মতামত রয়েছে। যেগুলোকে নববি রহ. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

ولو غلبتهما الدابتان، فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان، فالمذهب

---

[৯] মাজমাউজ জমানত, পৃষ্ঠা : ১৮৯।

[১০] আলফুরু ইবনু মুফলিহ, খণ্ড : ৬,পৃষ্ঠা : ৬।

[১১] আল্লামা মারদাবি রহ. 'ইনসাফ' খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৬, নামক কিতাবে বলেন, 'তারগিব', 'ওয়াজিজ' ও 'হাবিস সগির' কিতাবে ওই কথার ওপর দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়েছে।

[১২] বাদায়েউস সনায়ে, খণ্ড : ৭,পৃষ্ঠা : ২৭৩।

أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق، وفي قول أنكره جماعه أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر، إذ لا صنع لهما، ولا اختيار، فصار كالهلاك بآفة سماوية، ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو سائقها،

'যদি দুটি পশু তাদের চালকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং অবাধ্য হয়ে মারামারি করে। আর সওয়ারিরাও তা নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে শাফিয়ি মাজহাবের মতামত হলো, নিয়ন্ত্রণে অক্ষম ব্যক্তির হুকুম নিয়ন্ত্রণকারীর মতো। যেমনটি আগে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় মতামত, যা অনেকেই গ্রহণ করেনি তা হলো, পশু ও আরোহী উভয়ের ক্ষতি জরিমানাহীন হবে। কেননা এখানে তাদের কোনো কাজ বা ইচ্ছার দখল নেই। তাদের ক্ষতিটি হলো প্রাকৃতিক ক্ষতির মতো। আর তদ্রূপ যে ক্ষেত্রে পশু তার চালকের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে সেই ক্ষেত্রেও একই মতানৈক্য রয়েছে।'[১৩]

এ মাসআলায় আমরা দেখতে পাই যে, পশুর মাধ্যমে ক্ষতির ব্যাপারে তার চালক দায়বদ্ধ হবে না। কারণ, পশু অবাধ্য হওয়া এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার ফলে সে নিজের চলাফেরার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পন্ন ও স্বাধীন। সুতরাং এ অবস্থায় সরাসরি কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার সম্পর্ক আরোহীর দিকে করা সম্ভব নয়।

২. অনুরূপভাবে ফকিহগণ এ মাসআলা উল্লেখ করেছেন যে, আরোহী ছাড়া যদি অন্য কোনো ব্যক্তি পশুকে উত্যক্ত করে (এবং সে কারণে পশু কারও কোনো ক্ষতি করে) তাহলে উত্যক্তকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। আরোহীর ওপর নয়। 'হেদায়া' গ্রন্থের প্রণেতা বলেন—

وَمَنْ سَارَ عَلَى دَابَّةٍ فِي الطَّرِيقِ فَضَرَبَهَا رَجُلٌ أَوْ نَخَسَهَا فَنَفَحَتْ رَجُلًا أَوْ ضَرَبَتْهُ بِيَدِهَا أَوْ نَفَرَتْ فَصَدَمَتْهُ فَقَتَلَتْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّاخِسِ دُونَ الرَّاكِبِ) هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلِأَنَّ الرَّاكِبَ وَالْمَرْكَبَ مَدْفُوعَانِ بِدَفْعِ النَّاخِسِ فَأُضِيفَ فِعْلُ الدَّابَّةِ إليه كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِيَدِهِ ، وَلِأَنَّ النَّاخِسَ مُتَعَدٍّ فِي تَسْبِيبِهِ وَالرَّاكِبُ فِي فِعْلِهِ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُهُ فِي التَّغْرِيمِ لِلتَّعَدِّي ،

[১৩] রওজাতুত তালিবিন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩১।

حَتَّى لَوْ كَانَ وَاقِفًا دَابَّتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاكِبِ وَالنَّاخِسِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْإِيقَافِ أَيْضًا .قَالَ (وَإِنْ نَفَحَتْ النَّاخِسَ كَانَ دَمُهُ هَدَرًا) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ ....(وَلَوْ وَثَبَتْ بِنَخْسِهِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ وَطِئَتْهُ فَقَتَلَتْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّاخِسِ دُونَ الرَّاكِبِ) لِمَا بَيَّنَّاهُ .

'কোনো ব্যক্তি যদি পশুর ওপর আরোহণ করে পথ চলে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় কোনো লোক তার পশুকে প্রহার বা উত্যক্ত করার ফলে পশুটি তার ক্ষুরের মাধ্যমে অন্য কাউকে আঘাত করে বা সামনের ও পেছনের কোনো পা দিয়ে লাথি মারে। অথবা ভেগে গিয়ে কাউকে আঘাত করে তাকে মেরে ফেলে। তাহলে এর জরিমানা উত্যক্তকারীর ওপর ওয়াজিব হবে, আরোহীর ওপর নয়। উমর ও ইবনু মাসউদ রা. থেকে এমনটিই বর্ণিত আছে। কারণ, আরোহী ও পশু উভয়ে উত্যক্তকারীর উত্যক্তের কারণে স্বঅবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাই পশুর কাজটি উত্যক্তকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে। কেমন যেন সে নিজ হাতে দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছে। দ্বিতীয়ত উত্যক্তকারী এ দুর্ঘটনার কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর আরোহী তার কাজে কোনো ধরণের সীমালঙ্ঘন করেনি। সুতরাং সীমালঙ্ঘনের কারণে জরিমানা ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে তার দিকটি প্রধান্য পাবে। অবশ্য আরোহী যদি তার পশুকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখে (এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সেটিকে উত্যক্ত করে), তাহলে আরোহী ও উত্যক্তকারী উভয়ের ওপর অর্ধেক করে জরিমানা ওয়াজিব হবে। কারণ, রাস্তায় তার পশু দাঁড় করিয়ে রাখার কারণে সেও সীমালঙ্ঘন করেছে। আর পশু যদি উত্যক্তকারীকেই আঘাত করে বসে তাহলে তার রক্ত জরিমানাহীন হবে। (তার জন্য কোনো দিয়ত দেওয়া লাগবে না) কেননা তখন উত্যক্তকারী নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে বলে বিবেচ্য হবে। তার উত্যক্তের কারণে পশুটি যদি কারও ওপর ঝাঁপ দেয় বা আঘাত করে তাকে মেরে ফেলে, তাহলে উত্যক্তকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। আরোহীর ওপর নয়। যারকারণ আগে বর্ণনা করেছি।'[১৪]

[১৪] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৬৭।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর একটি আসার আছে। যা ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. তার কিতাব 'মুসান্নাফ'-এ উল্লেখ করেছেন—

أقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف على دابة، فنخس الرجل الدابة، فرفعت رجلها فلم تخطئ عين الجارية، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي، فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: على الرجل، إنما يضمن الناخس.

'এক ব্যক্তি এক দাসীকে সঙ্গে নিয়ে কাদিসিয়া থেকে আসে। তখন এক ব্যক্তি আরোহীর পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় পশুটিকে উত্যক্ত করে। ফলে পশুটি পা উঠিয়ে সরাসরি ওই দাসীর চোখে আঘাত হানে। দাসীর মালিক সালমান ইবনু রবিয়া বাহেলি রহ.-এর কাছে বিচার তলব করলে তিনি আরোহীর ওপর জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত দেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর কাছে সংবাদটি পৌঁছলে তিনি বলেন, তার ওপর আবশ্যক ছিলো, উত্যক্তকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব করা।'[১৫]

জাইলায়ি রহ.-এর 'নাসবুর রায়া' কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী ইমাম ইবনু আবু শাইবা রহ. তার 'মুসান্নাফ'-এ এ আসারটি উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম শুরাইহ ও ইমাম শাবি রহ. থেকেও উল্লিখিত আসারটি উল্লেখ করেছেন। 'মুগনিল মুহতাজ' কিতাবের উদ্ধৃতি অনুযায়ী শাফিয়ি মাজহাবের ফকিহদের কাছেও মাসআলাটি অনুরূপ।[১৬]

মোটকথা, এ মাসআলাতেও আরোহীর ওপর জরিমানা আরোপ করা হয়নি। কারণ, পশু যে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে সেটি আরোহীর দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না। কেননা, ক্ষতি করার বিষয়টি সরাসরি আরোহীর পক্ষ থেকে হয়নি। বাগদাদি রহ. 'মাজমাউজ জমানা' কিতাবে লিখেছেন—

جاء راعي أحمرة بها ليعبرها، وجاء من جانب أخر صبي غير بالغ مع العجلة، فقال له الراعي: أمسك الثور مع العجلة حتى تمر الأحمرة،فلم يمكنه امساكه، فمضى ووقع الحمار في النهر لم يضمن، وكذا الراعي إذالم يمكنه امساك الحمار، وإلا يضمن

[১৫] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪২৩।

[১৬] নাসবুর রায়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৮-৩৮৯।

'গাধার রাখাল নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য তীরে (পুলের ওপর) গাধা নিয়ে আসে। বিপরীত দিক থেকে যদি ছোটো অপ্রাপ্তবয়স্ক এক বাচ্চা গরুর গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়। রাখাল তাকে বললো, গরু ও গাড়িকে একটু থামিয়ে রাখো। যেন রাস্তা দিয়ে গাধা পার হতে পারে। কিন্তু বাচ্চার পক্ষে সেটি আটকানো সম্ভব হলো না। তার গরুর গাড়ি পুলের ওপর চলে আসলো ফলে গাধা নদীতে পড়ে গেলো। এ অবস্থায় বাচ্চার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে রাখাল যদি তার গাধাকে আটকাতে অক্ষম হয়। (তাহলে তার ওপরও জরিমানা ওয়াজিব হবে না) তবে যদি আটকাতে সক্ষম হয়, তাহলে তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে।[১৭]

এখানে বাচ্চার গরুর গাড়ির কারণে যে গাধা নদীতে পড়েছে, বাচ্চা তার ক্ষতিপূরণ দেবে না। কারণ বাচ্চা গরুর গাড়ির চালক হওয়া সত্ত্বেও নদীতে পতিত গাধার ক্ষতি তার দিকে সম্পৃক্ত করা সহিহ্ হবে না। কারণ সে সরাসরি সংঘটক নয়।

৪. ফকিহগণ এ মাসআলাটিও উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি পশুর ওপর আরোহন করে এরপর সে পশুটি মৃত অবস্থায় পড়ে যায় এবং সে কারণে কোনো ব্যক্তি মারা যায় কিংবা কোনো জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে আরোহীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। খতিব শিরবিনি রহ. বলেন—

لو سقطت الدابة ميتة، فتلف بها شئ لم يضمنه، وكذا لو سقط هو ميتا على شئ وأتلفه، لا ضمان عليه، فقال الزركشي: وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها بمرض أو عارض ريح شديد و نحوه.

'মৃত অবস্থায় কোনো পশু পড়ে যাওয়ার কারণে কোনো জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হলে আরোহীর ওপর তার জরিমানা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে আরোহীও মৃত অবস্থায় যদি কোনো কিছুর ওপর পড়ে যায় এবং সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলেও তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। জারকাশি রহ. বলেন, মৃত অবস্থায় পড়ে যাওয়ার মাসআলার সঙ্গে অসুস্থ হয়ে বা প্রবল বাতাস ইত্যাদির কারণে পড়ে

[১৭] মাজমাউজ জমানাত, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

যাওয়ার মাসআলাকেও সংযুক্ত করা উচিত। (সে ক্ষেত্রেও জরিমানা ওয়াজিব হবে না)[১৮]

উল্লিখিত অবস্থাতে আরোহীর ওপর জরিমানা আরোপ না করার কারণ হলো, তার মৃত্যু ঘটার মধ্যে তার নিজের কোনো ইচ্ছে বা হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। তাই আরোহীর সঙ্গে সরাসরি ক্ষতি বা ধ্বংসের সম্পর্ক হচ্ছে না। অনুরূপভাবে যদি প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনার কারণে আরোহী পড়ে যায়। যেমন : অসুস্থতা বা প্রবল বাতাসের কারণে। তাহলে জারকাশি রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী সে ক্ষেত্রেও আগের মতো হুকুম হবে। (কেননা সেখানে আরোহীর কোনো ইচ্ছে বা কাজের দখল নেই)

৫. ফকিহগণ এ মাসআলাটিও উল্লেখ করেছেন যে, যদি দুটি নৌযানের মাঝে সংঘর্ষ লাগে, তাহলে সেটি দুজন আরোহীর মধ্যে সংঘর্ষ লাগার মতো। ফলে প্রত্যেকেই একে অপরের জরিমানা দেবে। তবে খতিব শিরবিনি রহ. বলেন—

ومحل هذا التفصيل،إذا كان الاصطدام بفعلهما،أو لم يكن وقصرا في الضبط، أو سيرا في ريح شديد، فإن حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الأظهر،بخلاف غلبة الدابة-أي على أحد قولي الشافعية-فإن الضبط ثم ممكن باللجام ونحوه... إن تعمد أحدهما أو فرط دون الأخر فلكل حكمه.

'বর্ণিত মাসআলার ব্যাখ্যা হলো, যখন তাদের দুজনের কোনো কাজের কারণে ধাক্কা লাগবে। অথবা তারা কোনো কাজ না করলেও দুজনই নৌযান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অবহেলা করে কিংবা প্রবল বাতাসে তারা নৌযান চালায় ফলে যদি শুধু প্রবল বাতাসের কারণে নৌযানদুটির মধ্যে ধাক্কা লাগে, তাহলে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী কারও ওপর জরিমানা আবশ্যক হবে না। তবে পশু অবাধ্য হওয়ার মাসআলাটি এর বিপরীত। শাফিয়ি মাজহাবের এক অভিমত অনুযায়ী সেখানে জরিমানা আরোপ করা হবে। কেননা, লাগাম ইত্যাদির মাধ্যমে পশুকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আর যদি তাদের মধ্য থেকে একজন যদি ধাক্কা দেওয়ার

[১৮] মুগনিল মুহতাজ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২০৪-২০৫।

ইচ্ছে করে বা সীমালঙ্ঘন করে আর অন্যজন এমনটি করা থেকে বিরত থাকে তাহলে প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী বিধান হবে।'[১৯]

এ মাসআলাটি 'কিতাবুল উম' 'রওজাতুত তালেবিন' ও 'তোহফাতুল মুহতাজ' নামক কিতাবেও উল্লেখ আছে। মারদাবি রহ. 'আল-ইনসাফ' কিতাবে লিখেছেন—

وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الأخر وما فيها، هكذا أطلق كثير من الأصحاب، قال المصنف و غيره: محله إذا فرط، قال الحارثي: إن فرط ضمن كل واحد سفينة الأخر وما فيها، إن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما...و إن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون غلبة ريح، فلم يقدر على ضبطها...وقال في المغني: إن فرط المصعد، بأن أمكنه العدول بسفينته، والمنحدر غير قادر ولا مفرط، فالضمان على المصعد، لأنه المفرط.

'দুটি নৌযান যদি পরস্পর ধাক্কা লাগার ফলে ডুবে যায়। তাহলে প্রত্যেক নৌযানের মালিক অন্য নৌযান ও তার মালের ক্ষতিপূরণ দেবে। অনেক ফকিহ এমন শর্তহীন হুকুম বলেছেন। মুসান্নিফ ও অন্যরা বলেন, এ বিধান দায়িত্বে অবহেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হারিসি রহ. বলেন, যদি দায়িত্বে অবহেলা করে, তাহলে প্রত্যেক নৌযানের মালিক অন্য নৌযান ও তাতে থাকা মালের ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি অবহেলা না করে, তাহলে কেউ কাউকে ক্ষতিপূরণ দেবে না। ...আর তার একটি যদি অন্যটির নিচে ঢুকে যায়, তাহলে নিচে ঢুকে যাওয়া নৌযানের মালিক উপরের নৌযানের জরিমানা দেবে। তবে যদি প্রবল বাতাসের কারণে এমন হয় এবং সে নৌযানকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে জরিমানা ওয়াজিব হবে না। 'আল-মুগনি' কিতাবে আছে, উপরের নৌযানের পরিচালক যদি তার দায়িত্বে অবহেলা করে এভাবে যে, তার নৌযান সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিলো, কিন্তু সে সরিয়ে নেয়নি। আবার নিচের নৌযানের পরিচালকও তার নৌযান সরাতে সক্ষম ছিলো না এবং এ ক্ষেত্রে সে কোনো ধরনের

[১৯] মুগনিল মুহতাজ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯২।

অবহেলা করেনি তাহলে এ অবস্থায় উপরের নৌযানের মালিকের ওপর জরিমানা আবশ্যক হবে। কারণ, সে-ই দায়িত্বে অবহেলা করেছে।'

মালিকি মাজহাবে এ মাসআলার সারাংশ হাত্তাব রহ. উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

وقال أبو الحسن : مسألة السفينة والفرس على ثلاثة أوجه إن علم أن ذلك من الريح في السفينة وفي الفرس من غير راكبه فهذا الإضمان عليهم . أو يعلم أن ذلك من سبب النواتية في السفينة ومن سبب الراكب في الفرس فلا إشكال أنهم ضامنون وإن أشكل الأمر حمل في السفينة على أن ذلك من الريح وفي الفرس أنه من سبب راكبه انتهى

'শায়খ আবুল হাসান রহ, বলেন, নৌযান ও ঘোড়ার মাসআলার তিনটি সুরত—

এক. যদি নিশ্চিতভাবে এ কথা জানা যায় যে, বাতাসের কারণে নৌযানে পরস্পর সংঘর্ষ লেগেছে আর আরোহী ছাড়া অন্য কোনো কারণে ঘোড়ার দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাহলে কারও ওপর জরিমানা আরোপ হবে না।

দুই. যদি নিশ্চিতভাবে এ কথা জানা যায় যে, মাঝির কারণে নৌযানের মাঝে সংঘর্ষ লেগেছে এবং আরোহীর কারণে ঘোড়ার দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের উভয়ের ওপর জরিমানা আরোপ করা হবে।

তিন. আর যদি বিষয়টি (কোনো কারণে) সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে নৌযানের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে, প্রবল বাতাসের কারণে সংঘর্ষ লেগেছে। আর ঘোড়ার ক্ষেত্রে বলা হবে, আরোহীর কারণে তার দুর্ঘটনা ঘটেছে।'[২০]

সুতরাং ফকিহগণ এ কথার ওপর একমত যে, মাঝি তার নৌযান নিয়ন্ত্রণে কোনো ধরণের অবহেলা না করা সত্ত্বেও যদি তার নৌযান অন্য নৌযানের সঙ্গে সংঘর্ষ লাগে, তাহলে মাঝির ওপর এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হবে না। কারণ, পালতোলা নৌযানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মাঝির হাতে থাকে না। বরং সেটি চলাচলে বাতাসের একটি বড়ো ভূমিকা থাকে। কাজেই

[২০] মাওয়াহিবুল জালিল, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৪৩।

কখনো যদি প্রবল বাতাস থাকে, তাহলে তখন সংঘটিত ক্ষতির সম্পর্ক মাঝির দিকে করা যাবে না। যার ফলে মাঝিও সরাসরি ক্ষতিসাধনকারী বলে প্রমাণিত হবে না।

উপর্যুক্ত ফিকহি বক্তব্যসমূহ 'সরাসরি কোনো কাজে সম্পৃক্ততার' অর্থ উদঘাটনে ফকিহগণের সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টির প্রমাণ বহন করে। 'সরাসরি কোনো কাজে সম্পৃক্ততার' উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষেত্রে এ পয়েন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ি, ইত্যাদির অসংখ্য দুর্ঘটনার মাসআলার ক্ষেত্রে অচিরেই এ নীতির উপকারিতা প্রস্ফুটিত হবে ইনশাআল্লাহ—

তৃতীয় মূলনীতি

মুসাব্বিব (অর্থাৎ, যে কোনো কাজের হেতু হয়) সীমালঙ্ঘন করলে ক্ষতির দায়ভার সে গ্রহণ করবে

এ নীতিটিকে বাগদাদি রহ. তাঁর কিতাব 'মাজমাউজ জমানাত' এ নিচের বাক্যে উল্লেখ করেছেন—

المسبب لا يضمن إلا أن يتعد.

'মুসাববিবের ওপর সীমালঙ্ঘন ছাড়া ক্ষতির দায়ভার আরোপ করা হবে না। 'তাবয়িনুল হাকাইক' থেকে দ্বিতীয় নীতির আলোচনা করতে গিয়ে জায়লায়ি রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। 'মুসাব্বিব'-এর সংজ্ঞায় হামাবি রহ. বলেন—

حد المسبب، هو الذي حصل التلف بفعله، وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار.

'মুসাব্বিব'-এর সংজ্ঞা হলো, যার কাজের কারণে ক্ষতি সাধন হয়েছে। তবে তার কাজ ও ক্ষতির মাঝে কোনো স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী কর্তার কাজ অনুপ্রবেশ করেছে।'

এ কথার উপমা হলো, কোনো এক ব্যক্তি কূপ খনন করলো। আর অন্য এক ব্যক্তি সে কূপে পড়ে গেলো। এখানে কূপ খননকারী ওই ব্যক্তি কূপে পড়ার কারণ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং সে যদি কূপ খননে কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন করে থাকে, তাহলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি সীমালঙ্ঘন না করে থাকে, তাহলে তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না।

'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' কিতাবে এ নীতিটি উল্লেখে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছে। সেখানে ৯৩ নম্বর ধারায় নীতিটিকে নিচের শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

المسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

'অর্থাৎ, ইচ্ছে ছাড়া কোনো কাজের কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপ করা হবে না।' অথচ কথাটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের বর্ণিত নীতির বিপরীত। কেননা কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর ক্ষতির জরিমানা আরোপ করার জন্য তার ইচ্ছে থাকা শর্ত নয়। বিধায় কেউ যদি অন্যের জমিতে (তার অনুমতি ছাড়া) কূপ খনন করে এরপর কেউ ওই কূপে পড়ে যায়। তাহলে কূপ খননকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। যদিও সে এ উদ্দেশ্যে কূপ খনন করেনি যে, কেউ সেখানে পড়বে। সুতরাং উল্লিখিত নীতির সঠিক বাক্য সেটি হবে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তথা 'المسبب لا يضمن إلا بالتعدي' 'কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করলে তার ওপর জরিমানা আরাপ করা হবে।' যদিও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতি করার ইচ্ছে না থাকে।

'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' কিতাবের বর্ণনাভঙ্গির উল্লিখিত বিচ্যুতির প্রতি সম্মানিত শায়খ মোস্তফা জারকা রহ. নিজ কিতাবে ইঙ্গিত করে বলেছেন। নীতিটির সঠিক বাক্য হলো, 'المسبب لا يضمن إلا بالتعدي' 'কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করলে তার ওপর জরিমানা আরোপ করা হবে।' এটি সব ফিকহি কিতাবে বর্ণিত নীতির সঙ্গে মিল রাখে। দ্বিতীয় নীতির আলোচনাতে আমি বলেছি যে, সম্মানিত শায়খ 'সীমালঙ্ঘন' এর দুটি অর্থ বর্ণনা করেছেন এবং উভয়ের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন। (মুবাশারা) 'সরাসরি করার' উদ্দেশ্য উদঘাটনে তাঁর বক্তব্য এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে, তার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসে। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন। কিন্তু 'মুসাব্বিব'এর ক্ষেত্রে তিনি যা বলেছেন, তার ওপর আমার কিছু মৌলিক আপত্তি রয়েছে। সেটি হলো, বলেছেন যে, কারণ সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপ করার জন্য হুবাহু সেই 'সীমালঙ্ঘন' শর্ত যা (মুবাশির) তথা সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপের জন্য শর্ত। আর সে 'সীমালঙ্ঘনটি' হলো, অন্যের মালিকানা বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। চাই সেটি সত্তাগতভাবে বৈধ হোক বা না হোক।

অথচ বাস্তবতা হলো, যে কথা বলেছেন, তার ফলাফলস্বরূপ 'মুসাব্বিব' ও 'মুবাশির' এর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ দুটির

ক্ষেত্রে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন, 'মুবাশির' তথা সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। চাই সে সীমালঙ্ঘন করুক বা না-করুক। আর মুসাব্বিব সীমালঙ্ঘন ছাড়া ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ হবে না। সুতরাং ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত সঠিক কথা হলো, কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপ করার জন্য যে সীমালঙ্ঘন শর্ত করা হয়েছে, সেটি হলো 'সীমালঙ্ঘনের' দ্বিতীয় অর্থ। আর তা হলো, যে কাজটি ক্ষতির কারণ হয়েছে, সত্তাগতভাবে তা নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। অথচ এ অর্থে সীমালঙ্ঘন (মুবাশির) তথা সরাসরি কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপ করার জন্য শর্ত নয়।

চতুর্থ মূলনীতি

মুবাশির (অর্থাৎ, সরাসরি কাজে জড়িত ব্যক্তি) ও মুসাব্বিব (অর্থাৎ, কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি) উভয়ে একত্র হলে হুকুম জারি হবে মুবাশিরের ওপর

এ নীতিটিকে ইবনু নুজাইম রহ. 'আল-আশবাহ ওয়ান নাজাইর' (الأشباه والنظائر) কিতাবে নিচের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। এটি 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ'-এর ৯০ নম্বর ধারাতে 'আশবাহ' থেকে নকল করা হয়েছে। ইবনু নুজাইম রহ. এভাবে নীতিটির ব্যাখ্যা করেন—

فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما أتلف بإلقاء غيره

'কূপ খননকারীর সীমালঙ্ঘনের কারণে তার ওপর ওই বস্তুর জরিমানা ওয়াজিব হবে না যা অন্য কোনো ব্যক্তি কূপে ফেলার মাধ্যমে নষ্ট করেছে।'

এ উদাহরণের মধ্যে কূপ খননকারী মুসাব্বিব হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি সেখানে কোনো বস্তু ফেলেছে, সে মুবাশির হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং মুবাশির মুসাব্বিবের ওপর প্রাধান্য পাবে এবং সে বস্তুটি নষ্ট করার দায় সংঘটকের (মুবাশিরের) ওপরই বর্তাবে। ফলে তার উপরেই এ বস্তুটির জরিমানা ওয়াজিব হবে। তবে অনেক মাসআলা এ নীতির ব্যতিক্রম রয়েছে। সেসব মাসআলার নির্যাস আমরা বের করবো মাত্র দুটি পয়েন্টের ওপর নির্ভর করে।

কারণ হিসেবে সাব্যস্ত কর্তার (মুসাব্বিবের) ক্রিয়াশক্তি সরাসরি কর্তার (মুবাশিরের) ক্রিয়াশক্তি থেকে বেশি হলে হুকুমের সম্পর্ক হবে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত কর্তার মুসাব্বিবের সঙ্গে।—এ নীতিটি এমন ভাষ্যে ফিকহি কিতাবে উল্লেখ নেই। কিন্তু ফকিহগণ চতুর্থ নীতি থেকে ভিন্নধর্মী যেসব মাসআলা আলোচনা করেছেন, নীতিটি সেসব মাসআলার সারাংশ ও নির্যাস। আলি হায়দার রহ. 'মাজাল্লা'র ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন—

أَمَّا إِذَا كَانَ السَّبَبُ مَا يَفْضِي مُبَاشَرَةً إِلَى التَّلَفِ فَيَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ مِثَالُ ذَلِكَ لَوْ تَمَاسَكَ شَخْصَانِ فَأَمْسَكَ أَحَدُهُمَا بِلِبَاسِ الْآخَرِ فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ كَسَاعَةٍ مَثَلًا فَكُسِرَتْ فَيَتَرَتَّبُ الضَّمَانُ عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي أَمْسَكَ بِلِبَاسِ الرَّجُلِ رَغْمًا مِنْ كَوْنِهِ مُتَسَبِّبًا وَالرَّجُلُ الَّذِي سَقَطَتْ مِنْهُ السَّاعَةُ مُبَاشِرٌ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُنَا قَدْ أَفْضَى إِلَى التَّلَفِ مُبَاشَرَةً دُونَ أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فِعْلُ فَاعِلٍ آخَرَ.

'কারণটি যদি এমন হয় যে, তা সরাসরি ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত। তখন হুকুমের সম্পর্ক হবে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির (মুসাব্বিবের) সঙ্গে। তার উদাহরণ হলো, যদি দু-ব্যক্তি পরস্পর কাপড় টানাটানি করে, তাদের একজন অন্যের কাপড় ধরে রাখে, ফলে তার থেকে কোনো একটি বস্তু পড়ে ভেঙে যায়। যেমন : ঘড়ি, ইত্যাদি। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি অন্যের কাপড় ধরে রেখেছিলো, সে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। যার ঘড়ি পড়েছে, সে সংঘটক (মুবাশির) বলে সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর জরিমানা আসবে না। কেননা, এখানে ধ্বংস করার ভূমিকায় কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি মুসাব্বিব সরাসরি জড়িত। তাদের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী তৃতীয় কোনো কর্তার ক্রিয়া অনুপ্রবেশ করেনি।'[২১]

এ নীতি সম্পর্কে এর চেয়েও বেশি স্পষ্ট উদাহরণ হলো হানাফি ফকিহগণ কর্তৃক বর্ণিত একটি মাসআলা। সেটি হলো, কোনো ব্যক্তি কাউকে তৃতীয় একজনকে হত্যা করার ব্যাপারে এমনভাবে বাধ্য করলো, যেখান থেকে বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি হত্যা করতে বাধ্য করেছে, তার ওপর

[২১] দুরারুল হুক্কাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮১।

'কেসাস'-এর বিধান প্রযোজ্য হবে। যাকে বাধ্য করা হয়েছে, তার ওপর নয়। কাসানি রহ. বলেন—

> فأما المكره على القتل فإن كان الإكراه تاما فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ، ولكن يعزر ويجب على المكره.
>
> 'যাকে হত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে, তাকে যদি পরিপূর্ণভাবেই (যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই) বাধ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী তার ওপর কেসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না। বরং তাকে অন্য শাস্তি দেওয়া হবে। আর বাধ্যকারীর ওপর কেসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে।'[২২]

এ উদাহরণের মধ্যে বাহ্যিকভাবে যাকে বাধ্য করা হয়েছে, সেই মূলত সরাসরি হত্যার সঙ্গে জড়িত। আর বাধ্যকারী কারণ সাব্যস্ত হওয়া ছাড়া হত্যায় তার সরাসরি কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু হুকুম আরোপ হচ্ছে কারণ সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তির ওপর। সরাসরি হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির ওপর নয়। এর কারণ হলো, এখানে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ক্রিয়া সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্তার ক্রিয়া থেকে বেশি শক্তিশালী। কেননা, যাকে বাধ্য করা হয়েছে, সে আসলে বাধ্যকারীর হাতের একটি অস্ত্রের ভূমিকায় নিপতিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে আমরা আগে উল্লেখ করেছি, কেউ যদি এমন কোনো পশুকে উত্যক্ত করে যার ওপর আরোহী রয়েছে এবং এর ফলে পশুটি কাউকে আঘাত করে তাহলে উত্যক্তকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। আরোহীর ওপর নয়। এখানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে উত্যক্তকারী কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আর আরোহী 'মুবাশির' তথা সরাসরি কর্তার ভূমিকায় রয়েছে। কিন্তু উত্যক্তকারীর ক্রিয়া আরোহীর ক্রিয়া থেকে বেশি শক্তিশালী। তাই জরিমানা আরোপ করার ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সরাসরি কর্তার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে উল্লিখিত মাসআলাসমূহ চতুর্থ নীতির বাইরে মনে হচ্ছে। কিন্তু আগে দ্বিতীয় নীতির আলোচনায় আমরা 'মুবাশির' অর্থাৎ, সংঘটক-এর যে ব্যাখ্যা করেছি সেটি হলো, কারও ওপর জরিমানা আরোপ করার জন্য সীমালঙ্ঘন নয় বরং 'মুবাশির'-এর সঠিক উদ্দেশ্য তার মধ্যে সংঘটিত হওয়া শর্ত। আমরা

---

[২২] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৭৯।

যদি উল্লিখিত কথা দুটির মধ্যে একটু চিন্তা করি, তাহলে এ কথা বেরিয়ে আসবে যে, উল্লিখিত মাসআলাসমূহের মধ্যে আমরা যার ক্ষেত্রে 'মুবাশির' শব্দ বলেছি, বাস্তবিক অর্থে সে 'মুবাশির' নয় যে যুক্তিসঙ্গত কারণে তার সঙ্গে ধ্বংসের সম্পর্ক করা সহিহ হবে বরং তার ওপর জরিমানা আরোপ করা হয়নি উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নয় যে, কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে 'মুবাশির' অর্থাৎ, সরাসরি কর্তার ওপর এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং অন্য কেউ কাপড় ধরে রাখার কারণে যার ঘড়ি পড়ে ভেঙে গেছে, তার সম্পর্কে এ কথা সহিহ হবে না যে, ঘড়ি ফেলার ভূমিকায় সে 'মুবাশির' (সরাসরি জড়িত)। কেননা মুবাশির ('সরাসরি জড়িত') অর্থ পাওয়ার জন্য তার কোনো কাজ থাকা জরুরি। এ ক্ষেত্রে সে তো কোনো কাজ করেনি। অতএব, কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কাপড় ধরে রাখা ব্যক্তি ঘড়ি পড়ার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এখন কাপড় ধরার ক্ষেত্রে সে যেহেতু সীমালঙ্ঘন করেছে। তাই জরিমানা থেকে দায়মুক্ত হতে পারবে না। একই কারণে দ্বিতীয় উদাহরণে বাধ্যকৃত ব্যক্তি যদিও সরাসরি হত্যার সঙ্গে জড়িত কিন্তু বাধ্যকারীর পক্ষ থেকে চাপের কারণে সে অক্ষম ও বাধ্যকারীর হাতের একটি অস্ত্রতুল্য। কাজেই জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে তার সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না।

অনুরূপভাবে উত্যক্তকারীর ক্ষেত্রে বলা হবে, পশু অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে সেই মূলত কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কেননা সে পশুকে আরোহীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়েছে। তাই সেখানে আরোহী এমন অবস্থানে রয়েছে, যেন তার ক্রিয়া বা ইচ্ছে কোনোটাই নেই। তাই তাকে 'মুবাশির' অর্থাৎ, সরাসরি কর্তা বলা সহিহ হবে না। ফলে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তিই প্রতিদ্বন্দ্বীহীনভাবে রয়ে গেলো। তাই তার দিকেই ধ্বংসের সম্পর্ক করা হবে এবং সে-ই ক্ষতিপূরণ দেবে।

বর্ণিত বিষয়টি অনুধাবনের পর এ বিষয়ে খালেদ আতাসি রহ.-এর একটি উৎকৃষ্ট আলোচনা দেখতে পাই। যা আমাদের আগের বক্তব্যকে শক্তিশালী করে। তারই ভাষায় আমরা সে আলোচনাটি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি লেখেন—

المباشر هو الذي حصل التلف مثلا بفعله بلا واسطة، فكان هو صاحب العلة يضاف إليه التلف، والمتسبب ماحصل التلف لا بمباشرته وفعله، بل بواسطة هي العلة، لحصول المعلول، وهي فعل

فاعل مختار، وأما فعله فلا تأثير له سوي أنه مفض إليه، فإن اجتمعا فكما صرحت المادة يضاف الحكم إلى المباشر، لأنه صاحب العلة، وهي أقوي...

إعلم أنه متي كان المتوسط بين السبب والمعلول صالحا لإضافة المعلول إليه، يكون السبب حينئذ سببا حقيقيا . أي محضا . بمعني أنه لا مزية له سوي الإفضاء إلى حصوله، وعرفوه بأنه ما توسط بينه وبين الحكم علة، وذلك المتوسط هو العلة، وهذا هو المبحوث عنه في القاعدة، ومتي كان المتوسط غير صالح لذلك، فالحكم يضاف إلى السبب، ويكون حينئذ في معني العلة، ومعرفة هذا الضابط ينفعك في كثير من الوقائع.

وصور اجتماعهما ما ذكر في المادة: فإن ملقي الحيوان مباشر تلفه بالذات، وحافر البئر متسبب، لأن حفره أفضي إلى التلف، فالضمان على المباشر...

وإذا انفرد السبب . وذلك فيما لو كان الحائل المتوسط بينه و بين الحكم . أعني المعلول . غير صالح لإضافة الحكم إليه، يكون في معنى العلة المؤثرة، يضاف الحكم إليه ويكون المتسبب ضامنا . كسوق الدابة، فإنه غير موضوع للتلف، ولا هو مؤثر فيه، بل طريق للوصول إليه، والعلة للتلف التوسط بينه و بين السوق، وهو وطء الدابة إنسانا أو مالا بقوائمهما وثقلهما، ولكن لما لم يكن هذا المتوسط فعل فاعل مختار اضيف الحكم إلى السبب، وهو السوق الواقع من السائق، فكأنه دافع للدابة على ما وطئت عليه، فيضمن، لأنه سبب فيه معني العلة.

'মুবাশির' অর্থাৎ, সরাসরি কর্তা বলতে বোঝানো হয়, কোনো মধ্যস্থতা ছাড়া যার থেকে ক্রিয়াটি প্রকাশ পায় তাকে। ফলে সে 'ইল্লত'-এর অবস্থানে থাকে, যার দিকে ক্ষতিকে সম্পৃক্ত করা হয়। আর কারণ হিসেবে সাব্যস্ত বলতে বোঝানো হয়, যার সরাসরি হস্তক্ষেপ বা ক্রিয়ার কারণে ক্ষতি হয়নি বরং 'ইল্লত-এর কারণে হয়েছে। আর তা হলো, কোনো স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী কর্তার ক্রিয়া। আর কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির কাজটি ক্ষতি পর্যন্ত পৌঁছানো ছাড়া এর অন্য কোনো

ভূমিকা নেই। তাই সংঘটকও কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি একত্র হলে আগে উল্লিখিত ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী হুকুমকে সংঘটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে। কেননা, সে-ই হলো ক্ষতির মূল কারণ।

জেনে রাখা উচিত যখন কারণ ও সংঘটিত ঘটনার মাঝে এমন একটি বিষয় অনুপ্রবেশ করে, যার দিকে ঘটনাকে সম্পৃক্ত করা যায়, তখন কারণটি শুধু কারণই রয়ে যায়। অর্থাৎ, সেটির ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছানো ছাড়া তার আর কোনো ভূমিকা নেই। ফকিহগণ সেটিকে এভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন : কারণ ও হুকুমের মাঝে যে বিষয়টি অনুপ্রবেশ করে, সেটিই হলো প্রকৃত 'ইল্লত'। উল্লিখিত নীতিতে এ কথাটিই আসল আলোচ্য বিষয়। আর যদি উল্লিখিত মধ্যস্থ বিষয়টির দিকে হুকুমের সম্পর্ক করা সম্ভব না হয়। তাহলে হুকুমকে 'কারণ'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে এবং সে ক্ষেত্রে কারণটি 'ইল্লত'-এর অবস্থানে হবে। এ নীতি ও কায়দার জ্ঞান অনেক মাসআলায় ফায়দা দেবে।

উল্লিখিত ধারাতে বর্ণিত পদ্ধতিতে কারণ (সবব) ও 'ইল্লত' একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্র এই যে, পশুকে কূপে ফেলার ব্যাপারে সে 'মুবাশির' সরাসরি সম্পৃক্ত। কেননা, সে-ই সরাসরি পশুকে ক্ষতি করেছে। আর কূপ খননকারী এ ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, তার কূপ খননের কারণে পশুটি মারা গেছে। তাই এ অবস্থাতে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে।

আর কোথাও যদি শুধু কারণ পাওয়া যায়। (সেটি এমন ক্ষেত্রে, যেখানে কারণ ও ঘটনার মাঝে এমন কোনো বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটে) যার দিকে হুকুমের সম্পর্ক করা যায় না। তাহলে এমন ক্ষেত্রে কারণটিই প্রকৃত 'ইল্লত'-এর অবস্থানে হবে এবং তার দিকেই হুকুমের সম্পর্ক করা হবে। ফলে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তিই ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করবে। যেমন : পশু তাড়ানো। এটি এমন একটি কাজ, যেটিকে কোনো কিছু নষ্ট করার জন্য করা হয়নি। আবার কাজটি সরাসরি কোনো বস্তুকে নষ্ট করতে পারে না বরং নষ্ট করা পর্যন্ত পৌঁছানোর একটি উপকরণমাত্র। ধ্বংসের মূল কারণ হলো পশু তাড়ানো ও বস্তু নষ্টের মধ্যকার একটি জিনিস। আর সেটি হলো, পশু কোনো মানুষ বা সম্পদকে পাড়ানো বা তার ভারত্বের মাধ্যমে নষ্ট করা। কিন্তু এই মধ্যকার জিনিসটি স্বাধীন

ইচ্ছার অধিকারী কোনো কর্তার ক্রিয়া নয়। (বরং পশুর কাজ) তাই এখানে কারণ (সবব)-এর দিকে হুকুমের সম্পর্ক করা হবে। আর তা হলো, পশুকে তাড়ানো। কেমন যেন এই কারণটিই পশুকে সম্পদ নষ্টের দিকে নিয়ে গেছে। কাজেই কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তিই ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করবে। কেননা সে এমন কারণ, যার মধ্যে 'ইল্লত'-এর অর্থ পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট

কোনো ঘটনাতে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী কিন্তু সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী নয়।—এ নীতিটি চতুর্থ নীতি থেকে বিপরীতধর্মী। যাকে ফকিহগণ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি যদি তার কাজের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী হয়। আর সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী না হয় তাহলে হুকুমের সম্পর্ক হবে সীমালঙ্ঘনকারী কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির দিকে। হিদায়া গ্রন্থকার এ নীতিটি নিচের মাসআলায় বর্ণনা করেছেন—

কেউ কোনো পশুকে উত্যক্ত করলো, ফলে পশুটি অন্য কাউকে আঘাত করলো। এ অবস্থায় জরিমানা ওয়াজিব হবে উত্যক্তকারীর ওপর। আরোহীর ওপর নয়। এ মাসআলার পরিপূর্ণ বক্তব্য আমরা দ্বিতীয় নীতির অধীনে উল্লেখ করেছি, যেখানে এ কথা ছিলো—

ولأن الناخس متعد في تسبيبه، والراكب في فعله غير متعد، فيترجح جانبه في التغريم للتعدي.

'উত্যক্তকারী যেহেতু পশুকে ক্ষতি করানোর ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর আরোহী তার কাজে সীমালঙ্ঘন করেনি, তাই সীমালঙ্ঘণের কারণে জরিমানা ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে উত্যক্তকারীর দিকটি প্রাধান্য পাবে।'[২৩]

ইনায়া গ্রন্থকার এ কথার ওপর প্রশ্ন তুলে বলেন, এ মাসআলাতে সীমালঙ্ঘন না করা সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে (মুবাশিরকে) দায়মুক্ত করতে পারে না। তাই হিদায়া গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত কারণটি ওই মাসআলার ক্ষেত্রে

[২৩] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৬৭।

যথার্থ নয় যেখানে পশু কাউকে আঘাত করেছে। কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, মুবাশির সীমালঙ্ঘন না করলেও ক্ষতির ব্যাপারে সে দায়বদ্ধ থাকবে সে ক্ষেত্রে যেখানে বস্তু নষ্ট করার ব্যাপারে কেবল একটিই কারণ পাওয়া যাবে। আর সেটি হলো, সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্তার ক্রিয়া। কিন্তু যেখানে অন্য কেউ কারণ হিসেবে থাকবে এবং সে সীমালঙ্ঘনকারীও হবে সেখানে সেই সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির (মুবাশিরের) ওপর অগ্রাধিকার পাবে। হ্যাঁ, তবে কোনো ঘটনাতে মুবাশির ও কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি উভয়েই সীমালঙ্ঘন করলে সেখানে মুবাশিরকে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি মাসআলাও এ বিষয়টিকে সমর্থন করে। যেটিকে বাগদাদি রহ. 'মাজমাউজ জামানা' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন—

قَصَّارٌ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي الطَّرِيقِ ، وَعليها ثِيَابٌ فَصَدَمَهَا رَاكِبٌ ، وَمَزَّقَ بَعْضَ الثِّيَابِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ : إِنْ رَأَى الرَّاكِبُ الدَّابَّةَ الْوَاقِفَةَ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يُبْصِرْ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى ثَوْبٍ مَوْضُوعٍ فِي الطَّرِيقِ ، وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ فَتَخَرَّقَ لَا يَضْمَنُ.

'এক ধোপা কাপড়ের বোঝাসহ তার পশুকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলো। এমতাবস্থায় কোনো আরোহী তাকে আঘাত করলো ফলে তার ওপর থাকা কিছু কাপড় পড়ে গিয়ে ছিঁড়ে গেলো। এ মাসআলার ক্ষেত্রে শায়খ আবু বকর বালখি রহ. বলেন, আরোহী যদি ধোপার পশুকে থামানো অবস্থায় দেখার পর তাকে ধাক্কা দেয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। তবে যদি না দেখে থাকে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি রাস্তায় থাকা কাপড় না দেখে তার ওপর দিয়ে যায় এবং এতে সেটি ফেড়ে যায়। তাহলে তার ওপরও জরিমানা ওয়াজিব হবে না।'[২৪]

অর্থাৎ, ধোপা রাস্তায় তার পশুকে দাঁড় করিয়ে রাখার মাধ্যমে কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে। কেননা, সে তার পশুকে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছে। আর যে ব্যক্তি অন্য পশুর ওপর আরোহী ছিলো, সে সংঘটক হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সে যদি ধোপার পশুকে না দেখে থাকে,

[২৪] মাজমাউজ জমানাত, পৃষ্ঠা : ১৪৭। পরিচ্ছেদ নং ১, উপ পরিচ্ছেদ নং ১।

তাহলে সে সীমালঙ্ঘনকারী নয়। ফলে তার ওপর জরিমানাও ওয়াজিব হবে না। সুতরাং কাপড় ছেঁড়ার ব্যাপারে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে ধোপা। তাই কেমন যেন সে নিজের কাপড় নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছে। অন্য কেউ তার ক্ষতিপূরণ দেবে না। কিন্তু অন্য পশুর আরোহী যদি দেখতে পারে যে, ধোপার পশু দাঁড়িয়ে আছে, তারপরও সে ধোপার পশুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায়, তাহলে সে সীমালঙ্ঘনকারী বলে বিবেচিত হবে। আর যেখানে মুবাশির অর্থাৎ, সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি উভয়ে একত্রিত হবে, সেখানে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। ফলে এ ক্ষেত্রে অন্য পশুর আরোহী ধোপার কাপড়ের ক্ষতিপূরণ দেবে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি রাস্তায় কাপড় রেখে দেয়, তাহলে কাপড় ছেঁড়ার ব্যাপারে সেই কারণ হিসেবে বিবেচ্য এবং সীমালঙ্ঘনকারী। কারণ, সাধারণের চলাচলের রাস্তা কাপড় রাখার জায়গা নয়। আর রাস্তা দিয়ে পথ চলা ব্যক্তি ওই কাপড় ছেঁড়ার ক্ষেত্রে 'মুবাশির' অর্থাৎ, সরাসরি কাজের সঙ্গে জড়িত। এখন সে যদি কাপড় দেখা সত্ত্বেও তা মাড়িয়ে নষ্ট করে, তাহলে সেও সীমালঙ্ঘনকারী। তাই তার ওপরই জরিমানা ওয়াজিব হবে। আর যদি কাপড় না দেখে থাকে, তাহলে সে সীমালঙ্ঘনকারী নয়। সুতরাং তার ওপর জরিমানাও আসবে না।

বাগদাদি রহ. তার কিতাবে আরও একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন—

مَرَّ بِحِمَارٍ عليه حَطَبٌ وَهُوَ يَقُولُ : إليك إليك إِلَّا أَنَّ الْمُخَاطَبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ حَتَّى أَصَابَ ثَوْبَهُ وَتَخَرَّقَ يَضْمَنُ وَإِنْ سَمِعَ إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ التَّنَحِّي بِطُولِ الْمُدَّةِ فَكَذَلِكَ ، وَأَمَّا إِذَا أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَتَنَحَّ لَا يَضْمَنُ

'এক ব্যক্তি গাধার ওপর কাঠ নিয়ে এ কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, 'সরো! সরো!' কিন্তু পথচারী তার এ কথা শুনতে পায়নি। এমনকি তার কাঠে লেগে পথচারীর কাপড় ছিঁড়ে যায়। তাহলে গাধার মালিক পথচারীর কাপড়ের ক্ষতিপূরণ দেবে। আর পথচারী যদি আওয়াজ শুনতে পাওয়া সত্ত্বেও সময়ের অভাবে সরে যাওয়ার সুযোগ না পায়, তাহলেও অনুরূপ বিধান হবে। তবে যদি সরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও না সরে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।'[২৫]

[২৫] মাজমাউজ জমানাত, পৃষ্ঠা : ১৫৪।

এ মাসআলায় গাধার চালক মুবাশির অর্থাৎ, সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফকিহদের বক্তব্য অনুযায়ী সম্মুখ অথবা পেছন থেকে চালনাকারী পশুর চালককে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। গাধার চালক যখন 'সরো সরো' বলে আওয়াজ দিয়েছে, তখন সে সীমালঙ্ঘনকারী হওয়া থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু পথচারী তার আওয়াজ না শোনায় সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। অনুরূপভাবে পথচারী আওয়াজ শুনে সরে যাওয়ার সুযোগ না পেলেও একই হুকুম হবে। তবে যদি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে না সরে আর তার পোশাক ছিঁড়ে যায়, তাহলে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া পথচারী সীমালঙ্ঘন করেছে বলে ধরা হবে। সুতরাং তার ওপরই ক্ষতির দায়ভার বর্তাবে।

মোটকথা, হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য ও উল্লিখিত মাসআলাসমূহের ওপর দৃষ্টি দিলে নিচের বিষয়গুলো সামনে আসে—

এক. ক্ষতির একমাত্র মাধ্যম যদি সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিই হয়, তাহলে ক্ষতির দায়ভার তার ওপরই বর্তাবে। চাই সে সীমালঙ্ঘন করুক বা না করুক। সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়ার অর্থ হলো—সে সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করেনি।

দুই. কোনো ঘটনাতে যখন সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি একত্রিত হবে আর সীমালঙ্ঘনের উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে তাদের কেউই সীমালঙ্ঘনকারী না হবে সে ক্ষেত্রেও সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপরই জরিমানা ওয়াজিব হবে।

তিন. কোনো ঘটনাতে যখন সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি উভয়েই একত্রিত হবে এবং সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী হবে আর কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী না হবে তখনো সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে।

চার. যেখানে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি উভয়েই একত্রিত হবে এবং তারা উভয়েই সীমালঙ্ঘনকারী হবে সেখানেও সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে।

পাঁচ. যেখানে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি উভয়েই একত্রিত হবে এবং কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী

হবে আর সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী না হবে সেখানে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে।

মোটকথা, এ হলো ট্রাফিক দুর্ঘটনার কারণে জরিমানা আরোপ হওয়া না হওয়ার নীতিসমূহের নির্যাস যা ফকিহগণের কিতাবসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে সামনে এসেছে। মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

গাড়ি দুর্ঘটনা

নীতিসমূহের উল্লেখ ও ব্যাখার পর এখন আমরা গাড়ির দুর্ঘটনার বিধানসমূহের দিকে আসবো এবং সেগুলোকে আলোচিত ফিকহি মূলনীতি ও তার ব্যাখ্যার আলোকে পর্যালোচনা করবো।

গাড়ি দুর্ঘটনায় ড্রাইভারের দায়বদ্ধতা

আইন রয়েছে যে, গাড়ি চলাকালীন যেসব দুর্ঘটনা ঘটবে, চালক তার সম্পূর্ণ দায়ভার বহন করবে। কারণ, গাড়িটি চালকের হাতে একটি উপকরণ মাত্র এবং সেটি নিয়ন্ত্রণের সব ক্ষমতা চালকের রয়েছে। তাই গাড়ির মাধ্যমে যেসব দুর্ঘটনা ঘটবে, তার দায়ভার চালকের ওপরই বর্তাবে।

আমি এ কথা মনে করি যে, গাড়ি ও পশুর মধ্যে অনেক বড়ো একটি ব্যবধান রয়েছে। সেটি হলো, পশু নিজে নিজে চলতে পারে। কিন্তু চালকের পরিচালনা ছাড়া গাড়ি নিজ ক্ষমতায় চলতে সক্ষম নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাছে ফকিহগণ পশুর সামনের পা ও মুখ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি এবং পেছনের পা ও লেজ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির মাঝে যে পার্থক্য করেছেন, তা গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পশুর ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছিলেন যে, তার মুখ ও সামনের পা দিয়ে যে ক্ষতি সাধিত হবে, তার দায়ভার আরোহীর ওপর বর্তাবে। তবে পেছনের পা ও লেজের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতির দায়ভার আরোহীর ওপর বর্তাবে না। কেননা, পশুর ওপর আরোহী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে পশুর পেছনের পা বা লেজের ক্ষতি থেকে অন্যকে বাঁচাবে।

গাড়ির ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সেটি যেহেতু নিজে নিজে চলাচল করতে সক্ষম নয়। সম্পূর্ণ গাড়িটি চালকের হাতে একটি উপকরণ মাত্র এবং সে

তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কারণ, গাড়ির প্রতিটি অংশ একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং একটিকে রেখে অন্যটি চলাচল করতে অপারগ। কাজেই গাড়ির মাধ্যমে যে ক্ষতি সাধিত হবে, তার সম্পূর্ণ দায়ভার চালকের ওপরই বর্তাবে। চাই সেটি গাড়ির ডান-বাম থেকে হোক বা সম্মুখ অথবা পেছনের অংশ দ্বারা হোক। কেননা গাড়ির প্রতিটি অংশের ওপর চালকের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তার কোনো একটি অংশও চালকের নিয়ন্ত্রনের বাইরে নিজে নিজে চলাচল করে না।

ফলে এটি একটি নীতি হয়ে গেলো যে, গাড়ির ডান-বাম, সম্মুখ অথবা পেছনের যে অংশ দ্বারা যে দুর্ঘটনাই ঘটবে তার সম্পূর্ণ দায়ভার চালকের ওপর বর্তাবে। কারণ, গাড়িটি চালকের হাতে একটি উপকরণ বৈ কিছু নয়। তাই এর মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতির জরিমানার সম্পর্ক করা হবে শুধুই চালকের সঙ্গে।

এখন গাড়ির চালক যদি সীমালঙ্ঘন করে ট্রাফিক আইনের বাইরে গাড়ি চালায়। যেমন : অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়েছে যেখানে এমন গতিতে গাড়ি চালানোর অনুমতি নেই কিংবা সে নির্দিষ্ট লেনের ওপর চালানোর বিধান অনুসরণ করেনি। অথবা অন্য কোনো ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করেছে—এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে চালকের ওপর জরিমানা আরোপ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, এখানে চালকের সীমালঙ্ঘনের কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর সর্বাবস্থায় যে-কোনো দুর্ঘটনায় সীমালঙ্ঘনকারীই ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করবে।

কিন্তু চালক যদি গাড়ি চালানোর মধ্যে কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন না করে বরং ট্রাফিক আইনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে গাড়ি চালিয়ে থাকে, তারপরেও কোনোভাবে দুর্ঘটনা ঘটে যায়; তাহলে এ অবস্থাতেও কি চালকের ওপর ক্ষতির দায়ভার বর্তাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের যুগের আলেমদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনো আলেম বলেন যে, এ অবস্থাতে ক্ষতির দায়ভার চালকের ওপর বর্তাবে। কেননা, ঘটনাতে সে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করলেও তার ওপর দায়ভার বর্তায়। আবার কেউ বলেন, এ অবস্থাতে চালকের ওপর ক্ষতির দায়ভার বর্তাবে না। কেননা, সবধরনের ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালানোর পরেও যখন দুর্ঘটনা ঘটবে, তখন তা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বলে গণ্য করা হবে। যা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর তখনই ক্ষতির দায়ভার বর্তায়, যখন তার পক্ষে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। আর যেখানে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়, সেখানে তার ওপর ক্ষতির দায়ভার বর্তাবে না।

আলোচিত নীতিমালা ও ফিকহি মাসআলার আলোকে আমার কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, (মহান আল্লাহ ভালো জানেন) চালক সেসব ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ হবে, যেসব ক্ষতিতে সে সরাসরি সম্পৃক্ত। যদিও তার থেকে কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন না পাওয়া যায়। কেননা, ফকিহগণ এ কথার ওপর একমত হয়েছেন যে, সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু দ্বিতীয় নীতির অধীনে আমরা সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্তের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা নিশ্চিতভাবে পাওয়া আবশ্যক। সুতরাং চালকের ওপর ক্ষতির দায়ভার আরোপিত করার জন্য জরুরি হলো, কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ছাড়া যুক্তির নিরিখেই তার সঙ্গে ঘটনাকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা সহিহ হওয়া। নীতিগত এ বিষয়টি সামনে রাখলে নিচের অবস্থাসমূহে চালকের ওপর ক্ষতির দায়ভার বর্তাবে না।

এক. কোনো চালক সব ধরণের ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালালো। কিন্তু হঠাৎ করে কোনো ব্যক্তি অন্যকে ধাক্কা দিয়ে এমন অবস্থায় গাড়ির সামনে ফেলে দিলো যে, চালকের পক্ষে তখন গাড়ি থামানো সম্ভব নয়। ফলে গাড়ি সে ব্যক্তিকে আঘাত করলো। এ অবস্থায় চালক ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ হবে না। বরং যে ব্যক্তি ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে, তার ওপর ক্ষতির দায়ভার বর্তাবে। এ ঘটনাটি ওই মাসআলার মতো, যেখানে কেউ একটি দাঁড়িয়ে-থাকা পশুকে উত্যক্ত করলো ফলে পশু কাউকে আঘাত করলো। এমন অবস্থাতে উত্যক্তকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। আরোহীর ওপর নয়। কারণ, এ ঘটনাতে সরাসরি কাজ করার বিষয়টিকে চালকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সহিহ হবে না। কেননা, ঘটনাতে ধাক্কাদাতার কাজটি চালকের কাজ থেকে বেশি ভূমিকা রেখেছে। অথবা হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্যের মতো যে, ধাক্কাদাতা সীমালঙ্ঘনকারী। আর চালক সীমালঙ্ঘনকারী নয়।

দুই. চালক সিগন্যাল পেয়ে গাড়ি থামিয়ে রেখেছে এবং সিগন্যাল ছাড়ার অপেক্ষা করছে—এ সময়ের মধ্যে পেছন থেকে কোনো গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়িয়ে দিলো। ফলে সে তার সামনে থাকা কাউকে আঘাত করলো। এ অবস্থায় সামনের গাড়ির চালকের ওপর ক্ষতির দায়ভার বর্তাবে না। বরং পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়িয়ে দেওয়া গাড়ির চালকের ওপর ক্ষতির দায়ভার বর্তাবে। কারণ, সামনের গাড়ি-চালকের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সম্পর্ক করা সহিহ নয়। তার কারণ হলো, পেছনের গাড়ির কারণে

সে একটি উপকরণের মতো সামনে বেড়ে গেছে। সৌদিআরবের 'আল-লাজনাতুদ দায়িমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা' তার রেজুলেশনে এ কথার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছে। 'মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ'-এর সংখ্যা ২৬, বর্ষ ১৪০৯-১৪১০তে তা প্রকাশিত হয়েছে।

বর্ণিত অবস্থাটি ফকিহগণ কর্তৃক বর্ণিত এই মাসআলার সঙ্গে পূর্ণ মিল রাখে যে, কেউ কোনো পশুকে উত্যক্ত করলে সে যদি কাউকে আঘাত করে, তাহলে উত্যক্তকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। আরোহীর ওপর নয়। বাগদাদি রহ. কর্তৃক 'মাজমাউজ জমানাত' কিতাবে বর্ণিত মাসআলাটি এ কথাটিকে শক্তিশালী করে। তিনি বলেন—

فَإِنْ عَثَرَ بِمَا أَحْدَثَهُ فِي الطَّرِيقِ رَجُلٌ فَوَقَعَ عَلَى آخَرَ فَمَاتَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي أَحْدَثَهُ فِي الطَّرِيقِ وَصَارَ كَأَنَّهُ دَفَعَ الَّذِي عَثَرَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَدْفُوعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَالْمَدْفُوعُ كَالْآلَةِ.

'কেউ রাস্তায় মলত্যাগ করার কারণে অপর কেউ পিছলিয়ে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ওপর পড়ে গেলে তৃতীয় ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে যে ব্যক্তি মলত্যাগ করেছে, তার ওপর জরিমানা আসবে। যেন মলত্যাগকারী তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। কেননা, দ্বিতীয় ব্যক্তি এ অবস্থায় ধাক্কা দেওয়া ব্যক্তির ন্যায়। তাই সে একটি উপকরণ তুল্য।'[২৬]

এ উদাহরণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো, যে ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির ওপর পড়েছে, সে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু জরিমানা আরোপ হচ্ছে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর। কারণ, সে সীমালঙ্ঘনকারী। দ্বিতীয়ত, তার ক্রিয়াশক্তি সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াশক্তি থেকে বেশি। কেননা, পতিত ব্যক্তির পড়ে যাওয়া তার কোনো ইচ্ছাধীন কাজ নয়। সুতরাং সরাসরি করার সম্পর্ক তার দিকে করা সহিহ হবে না। আর এ ঘটনাটিই আমাদের বর্ণিত মাসআলার ক্ষেত্রে ঘটেছে।

তিন. গাড়ি চালানোর আগে যদি সেটি সম্পূর্ণ ঠিক থাকে এবং নিয়মানুযায়ী চালক সেটিকে পরীক্ষাও করে। তারপরও চলার মাঝে হঠাৎ করে তার কোনো একটি পার্স এমনভাবে নষ্ট হয় যে, গাড়িটি একেবারেই চালকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে

[২৬] মাজমাউজ জমানাত, পৃষ্ঠা : ১৭৬। পরিচ্ছেদ নং ১. উপ পরিচ্ছেদ নং ২।

গিয়ে কাউকে আঘাত করে। এমন ক্ষেত্রে সৌদিআরবের 'আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসি ওয়াল ইফতা' এ ফতোয়া দিয়েছে যে, চালকের ওপর জরিমানা আবশ্যক হবে না। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় যদি গাড়িটি কোনো মানুষ বা সম্পদের ওপর উলটে পড়ে এবং সে মানুষটি মারা যায় বা সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলেও চালকের ওপর জরিমানা আবশ্যক হবে না।

বর্ণিত ফতোয়াটি ওই মাসআলার ওপর ভিত্তি করে বের করা যায়, যা দ্বিতীয় নীতির অধীনে উল্লেখ করেছি। ফকিহগণ বলেন—

'কোনো পশু যদি অবাধ্য হয়ে আরোহীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাহলে আরোহীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে গাড়িটি চালকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার পর তার কোনো অংশ দ্বারা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে চালকের দিকে তার সম্পর্ক করা সহিহ হবে না। সেইসঙ্গে এ কথাও বলার সুযোগ নেই যে, এ দুর্ঘটনায় চালক হলো সরাসরি সম্পৃক্ত। সর্বোচ্চ এ কথা বলার সুযোগ আছে যে, ঘটনাতে চালক হলো কারণ। কেননা সে-ই গাড়ি চালাচ্ছিলো। চালক যেহেতু ঘটনার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, তাই তার ওপর জরিমানা আরোপ করার জন্য তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন পাওয়া শর্ত। এখন সে যদি নিয়মানুযায়ী ভালোভাবে গাড়ি নিরীক্ষণ করে এবং ট্রাফিক আইন মেনে স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালায়, তাহলে সীমালঙ্ঘন না করায় তার ওপর জরিমানা আরোপ করা হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি চালক শর্তসমূহের কোনো একটি শর্ত ভঙ্গ করে যেমন : চালানোর আগে গাড়িটি যথাযথভাবে নিরীক্ষা করেনি। কিংবা কোনো পার্সে স্পষ্ট সমস্যা দেখা সত্ত্বেও গাড়ি চালায়। অথবা নির্ধারিত গতির বাইরে বেশি গতিতে গাড়ি চালায়। আর এমন অবস্থায় গাড়ি যদি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে চালকের ওপর জরিমানা আবশ্যক হবে। কেননা, সে সীমালঙ্ঘন করে গাড়িটি নিয়ন্ত্রনের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে।

কাসানি রহ. কর্তৃক 'বাদায়েউস সানায়ে' কিতাবে বর্ণিত মাসআলাটি উপর্যুক্ত ফতোয়াটিকে সমর্থন করে। তিনি বলেন—

وكذلك إذا كان يمشي في الطريق حاملا سيفا أو حجرا أو لبنة أو خشبة فسقط من يده فقتله لوجود معنى الخطأ فيه وحصوله على سبيل المباشرة لوصول الآلة لبشرة المقتول (ولو) كان لابسا سيفا فسقط

على غيره فقتله أو سقط عنه ثوبه أو رداؤه أو طيلسانه أو عمامته ، وهو لابسه على إنسان فتعقل به فتلف فلا ضمان عليه أصلا ؛ لأن في اللبس ضرورة ؛ إذ الناس يحتاجون إلى لبس هذه ، والتحرز عن السقوط ليس في وسعهم ، فكانت البلية فيه عامة فتعذر التضمين ، ولا ضرورة في الحمل ، والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن أيضا ، وإن كان الذي لبسه مما لا يلبس عادة فهو ضامن.

'কেউ যদি রাস্তায় তলোয়ার, পাথর, ইট কিংবা কাঠ বহন করে চলে এবং তার কোনো একটি পড়ে যাওয়ার ফলে কেউ মারা যায়। তাহলে ওই বস্তু বহন করে চলা ব্যক্তি তার ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা, এখানে ভুলক্রমে ঘটে যাওয়ার বিষয়টি পাওয়া গেছে এবং বস্তুটি নিহত ব্যক্তির শরীর পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে সরাসরি করার অর্থটি পাওয়া গেছে। আর যদি সে তলোয়ারকে শরীরে পরিধান করে, এরপর কোনো কারণবশত তা অন্যের ওপর পড়ে যায় ফলে তার মৃত্যু ঘটে। অথবা তার কাপড়, চাদর, তোয়ালে বা পরিহিত পাগড়ি অন্যের ওপর পড়ে এবং সে তাতে জড়িয়ে মারা যায়, তাহলে এ ব্যক্তির ওপর জরিমানা আবশ্যক হবে না। কেননা, মানুষের জন্য এ ধরনের জিনিস পরিধান করা জরুরি এবং মানুষ সেগুলো পরিধান করতে বাধ্য। আর এসব দুর্ঘটনা এমন যে তা এড়িয়ে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এটি ব্যাপক ঘটা একটি ঘটনা, যে কারণে এমন ক্ষেত্রে পরিহিত ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপ করা অসম্ভব। তবে সেগুলো বহনের ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন নেই এবং তা পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। (তারপরও সে সতর্ক হয়ে না চলার কারণে তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হয়েছে) অবশ্য কেউ যদি এমন কোনো পোশাক পরিধান করে, যা সাধারণত পরিধান করা হয় না। (আর সে পোশাক উড়ে অন্যের ওপর পড়ার কারণে সে তাতে জড়িয়ে মারা যায়) তাহলে কাপড় পরিহিত ব্যক্তি তার জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে।

দ্বিতীয় নীতির অধীনে আমরা যে মাসআলা উল্লেখ করেছি, সেটিও এ মাসআলাকে সমর্থন করে। আর তা হলো, কোনো পশু যদি নিজে নিজে মরে পড়ে যায় অথবা অসুস্থ হয়ে কিংবা প্রবল বাতাসের কারণে অন্যের

ওপর পড়ে যায় এবং সে কারণে কারও কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আরোহীর ওপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না।

চার. কোনো ব্যক্তি যদি মহাসড়কে নির্ধারিত নিয়ম মেনে লেন অনুযায়ী এবং ট্রাফিক আইন অনুযায়ী দেখেশুনে গাড়ি চালায় আর হঠাৎ করে কোনো ব্যক্তি তার সামনে ঝাঁপ দেয়, এ অবস্থায় চালক ব্রেক ইত্যাদির সাহায্যে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করার পরেও সে ব্যক্তির ওপর যদি গাড়ি উঠে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সৌদিআরবের 'আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসি ওয়াল ইফতা' বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছে কিন্তু কোনো একটিকেও নিশ্চিত করে বলেনি। 'লাজনাহ' নিচের সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরেছে—

أمكن أن يقال بتضمين السائق من مات بالصدم أو كسر مثلا بناء على ما تقدم من تضمين الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت الدابة بيديها وقد يناقش بأن كبح الدابة وضبطها أيسر من ضبط السيارة ويمكن أن يقال بضمان كل منهما ما تلف عند الآخر من نفس ومال ، بناء على ما تقدم عن الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في تضمين المتصادمين ويمكن أن يقال بضمان السائق ما تلف من نصف الدية أو نصف الكسور لتفريطه بعدم احتياطه بالنظر لما أمامه من بعيد وبضمان المصدوم نصف ذلك لاعتدائه بالمرور فجأة أمام السيارة دون الاحتياط لنفسه ، بناء على ما ذكره الشافعي وزفر وعثمان البتي ومن وافقهم في تضمين المتصادمين ويحتمل أن يقال أنه هدر لانفراده بالتعدي.

'লাজনাহ' চারটি সম্ভবনার কথা বলেছে—

ক. দুর্ঘটনার কারণে মারা যাওয়া বা অঙ্গহানী হওয়া ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে চালককে দায়বদ্ধ করা হবে যেমন : পশু সামনের পা দ্বারা কাউকে আঘাত করলে আরোহী, পশুর চালক অথবা উত্যক্তকারীর ওপর জরিমানা আরোপ করা হয়। অবশ্য এ কথার ওপর প্রশ্ন ওঠে যে, গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা থেকে পশু নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।

খ. এ কথা বলার সুযোগ রয়েছে যে, বর্ণিত ঘটনাতে প্রত্যেককে অন্যের জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ করা হবে যা হানাফি, মালিকি ও হাম্বালি মাজহাবের আলেমদের অভিমত তাদের বক্তব্য আগে উল্লেখ

১ করা হয়েছে যে, পারস্পরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে অপরের ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ করা হবে।

গ. এ কথা বলা যেতে পারে যে, চালকের ওপর অর্ধেক দিয়ত আরোপ করা হবে। কেননা, সে তার সামনের জিনিসকে দূর থেকে দেখার ক্ষেত্রে অবহেলা করেছে। আর যে ব্যক্তি গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করেছে, তার ওপরও অর্ধেক দিয়ত আরোপ করা হবে। কেননা, সে হঠাৎ করে গাড়ির সামনে আসা এবং নিজের ব্যাপারে সচেতন না হওয়ার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছে। এ কথাটি ওই মাসআলা অনুযায়ী হয়েছে, যেটিকে পরস্পর সংঘর্ষ লাগার ঘটনায় ইমাম শাফিয়ি, জুফার, শায়খ উসমান বাত্তি রহ. এবং তাদের অনুসারীগণ উল্লেখ করেছেন।

ঘ. হঠাৎ সামনে আসা ব্যক্তির রক্ত জরিমানাহীন থাকবে। কেননা সে একাই সীমালঙ্ঘন করেছে।

উল্লিখিত মাসআলায় আমার কাছে যে কথা স্পষ্ট হয় তা হলো (মহান আল্লাহই ভালো জানেন) হঠাৎ সামনে আসা ব্যক্তি যদি এমন মুহূর্তে সামনে আসে যে, যেখানে ব্রেকের মাধ্যমে স্বাভাবিক গতিতে চলমান গাড়ি থামানো সম্ভব নয় আর তার সামনে আসার বিষয়টি এমন আকস্মিক যে, সতর্ক দৃষ্টিতে চলমান চালকের পক্ষেও আগে থেকে বিষয়টি অনুধাবনের সুযোগ নেই, তাহলে এমন অবস্থায় এ ক্ষতির দায়ভার চালকের ওপর আসবে না। আর এ কথাও বলা যাবে না যে, চালক তাকে সরাসরি হত্যা বা ক্ষতি করেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে চালক ক্ষতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ হবে না। হঠাৎ সামনে আসা ব্যক্তিই তার নিজের জীবন নষ্ট করার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর তা নিচের বিষয়গুলোর কারণে—

১. এমন অবস্থায় আমরা যদি চালকের ওপর জরিমানা আরোপ করি, তাহলে এ কথা বলা আবশ্যক হবে যে, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা বা নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছে করেছে এবং সে উদ্দেশ্যে কোনো গাড়ি বা রেলের সামনে ঝাঁপ দিয়েছে তাহলেও তার ক্ষতির দায়ভার চালকের ওপর চাপানো হবে। এমন ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করার কথাটি একেবারেই বাস্তবতা-বিবর্জিত।

২. আগে দ্বিতীয় নীতির আলোচনায় আমরা এ কথা প্রমাণ করেছি যে, সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপ করার জন্য সন্দেহাতীতভাবে তার থেকে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে। সুতরাং যেখানে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ক্রিয়াশক্তি সরাসরি কর্তার ক্রিয়া থেকে শক্তিশালী হবে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির কারণে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ইচ্ছে ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে, সেখানে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ওপর ক্ষতির দায়ভার আসবে না। তাই তার ওপর জরিমানাও ওয়াজিব হবে না।

৩. সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি অন্যের কারণে কাজটি করতে বাধ্য হলে (যেমনটি বাধ্য করার মাসআলায় হয়ে থাকে) সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে হত্যার প্রকৃত কর্তা বলা যাবে না। বরং তার দিকে হত্যাকে সম্পৃক্ত করা হবে, যে হত্যা করতে বাধ্য করেছে। যেমন : কেউ কাউকে নিজেকে হত্যা করতে বাধ্য করলো এবং ইকরাহ মুলজি (এমন বাধ্য যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই) অবস্থায় সে হত্যা করলো। তাহলে এমন অবস্থায় বাধ্যকৃত হত্যাকারীর ওপর জরিমানা আবশ্যক হবে না। কেননা, হত্যাকে বাধ্যকৃত ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করা হবে না। তেমনি আমাদের আলোচিত মাসআলায় সরাসরি হত্যার সম্পর্ক চালকের দিকে না করার বিষয়টি আরও যুক্তিসংগত। কেননা, আগের মাসআলায় বাধ্যকৃত ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে বাঁচানোর যে সুযোগ ছিলো, বাধ্য করার পরও সেটি নষ্ট হয়নি। সুতরাং সেখানে সুযোগ ছিলো যে, বাধ্যকৃত ব্যক্তি নিজের জীবনের বিনিময়ে অন্যের জীবন বাঁচাবে। আর এ কারণেই বাধ্য হয়ে কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে শাসনমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের আলোচিত মাসআলাটি তার বিপরীত। কারণ, হঠাৎ সামনে আসা ব্যক্তিকে বাঁচানোর ব্যাপারে চালকের কোনো শক্তি বা ইচ্ছার অধিকার কোনোটিই নেই।

৪. হিদায়া গ্রন্থকার থেকে আমরা আগে এ কথা বলেছি যে, কোনো ঘটনাতে যদি কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে আর সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করে, তাহলে সরাসরি কাজের সঙ্গে

সম্পৃক্ত ব্যক্তির চেয়ে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা আরোপ করা বেশি উপযুক্ত। আর এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের আলোচ্য ঘটনাতে হঠাৎ ঝাঁপ দেওয়া ব্যক্তিই সীমালঙ্ঘনকারী চালক সীমালঙ্ঘনকারী নয়। সুতরাং হঠাৎ ঝাঁপ দেওয়া ব্যক্তি নিজের কাজের দায়ভার নিজেই বহন করবে।

৫. এ ঘটনাতে কমপক্ষে চালক সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এবং তার ওপর জরিমানা আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এ সন্দেহের সব থেকে বড়ো প্রমাণ হলো 'আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসি ওয়াল ইফতা'-এর সিদ্ধান্ত। যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান চালকের ওপর জরিমানা আরোপের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে। আর সন্দেহ অবস্থায় কোনো জরিমানা আবশ্যক হয় না। বাগদাদি রহ. 'মাজমাউজ জামানা' কিতাবে লেখেন—

رَجُلٌ حَفَرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَسَقَطَ فِيهَا إِنْسَانٌ وَمَاتَ فَقَالَ الْحَافِرُ أَنَّهُ أَلْقَى نَفْسَهُ فِيهَا وَكَذَّبَتْهُ الْوَرَثَةُ فِي ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَافِرِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخِرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَصِيرَ يَرَى مَوْضِعَ قَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُوقِعُ نَفْسَهُ ، وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِالشَّكِّ.

'এক ব্যক্তি রাস্তায় কূপ খনন করেছে আর অন্য একজন সেখানে পড়ে মারা গেছে। এখন কূপ খননকারী বললো, সে নিজ ইচ্ছায় কূপে পড়েছে। আর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস সেটিকে মিথ্যে বলে দাবি করলো। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর শেষ অভিমত এবং ইমাম মুহাম্মাদ-রহ. মতামত অনুযায়ী এমন অবস্থায় কূপ খননকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্পষ্ট বিষয় হলো, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেশুনে পা ফেলে। অন্য দিকে এ কথাও স্পষ্ট যে, মানুষ নিজেকে নিজে শেষ করে দেয় না। কাজেই সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় কূপ খননকারীর ওপর জরিমানা আরোপ করা যাবে না।'[২৭]

[২৭] মাজমাউজ জমানাত, পৃষ্ঠা : ১৮০। পরিচ্ছেদ নং ১২, উপ পরিচ্ছেদ নং ২।

চালকের ওপর জরিমানা আরোপ করার দলিল

অনেক সময় চালকের ওপর জরিমানা আরোপ করার লক্ষ্যে নিচের দলিলগুলো পেশ করা হয়ে থাকে—

ক. সব ফকিহ এ কথার ওপর একমত যে, পথ চলার মাঝে পশু যদি কাউকে আঘাত করে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ আরোহীর ওপর বর্তাবে। এ মাসআলা থেকে তারা এ অবস্থাকে ব্যতিক্রম রাখেননি যে, যদি কেউ হঠাৎ করে গাড়ির সামনে ঝাঁপ দেয়। (তখন আরোহীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না) এ মাসআলাকে ব্যতিক্রম না ধরা এ কথার দলিল যে, তারা এ অবস্থাতেও আরোহীর ওপর জরিমানা আরোপের পক্ষে।

তাদের এ দলিলটি সঠিক নয়। কেননা, ফকিহগণ এ মাসআলাকে জরিমানা ওয়াজিব হওয়া না-হওয়া, কোনো দিকেই উল্লেখ করেননি। আর ফকিহগণের কেবল নীরব থাকা এ ক্ষেত্রে জরিমানা ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করে না। এ জন্য যে, নীরব ব্যক্তির প্রতি কোনো কথার সম্পর্ক করা হয় না। বিশেষ করে এমন ক্ষেত্রে, যেখানে অন্যান্য মাসআলার অধীনে এমন সব নীতি উল্লেখ করেছেন, যা সে অবস্থায় জরিমানা ওয়াজিব না হওয়াকে প্রমাণ করে। সম্ভবত এ কারণে তারা ওই মাসআলাকে উল্লেখ করেননি যে, তাদের যুগে এমন ঘটনা বিরল ছিলো। কারণ, গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা থেকে পশু নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। কেননা, পশু নিজে নিজে চলাচল করতে পারে। অনেক সময় চলার মাঝে রাস্তায় কাউকে দেখে সে নিজেই সরে যায়। কিন্তু গাড়ি নিজে নিজে চলাচল করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, তখনকার সময়ে শহরের রাস্তাগুলো পায়ে হেঁটে চলার জন্য প্রস্তুত করা হতো। তাই সেখানে পশু দ্রুত গতিতে চলতে পারতো না। আর গাড়ি তার বিপরীত অবস্থানে। সেগুলো এমন রাস্তায় চলাচল করে, যাকে দ্রুতগতিতে চলাচলের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ. অনেক সময় দলিল হিসেবে এ কথা বলা হয় যে, যদি ঘুমন্ত ব্যক্তি অন্যের ওপর গড়িয়ে পড়ে এবং এতে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব হয়। অথচ ঘুমন্ত ব্যক্তি সাধারণভাবে শরিয়তের মুকাল্লাফ নয় কিন্তু ফকিহগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার ওপরই জরিমানা আরোপ করেছেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, চালকের

ওপর জরিমানা আরোপ হবে। যদিও ক্ষতিটি তার ইচ্ছার বাইরে হোক না কেন। সুতরাং উত্তম হলো, চালকের ওপর জরিমানা ওয়াজিব করা। যদিও তার ইচ্ছার বাইরে ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

উল্লিখিত দলিলের উত্তর এই যে, কোনো ক্ষতির ক্ষেত্রে যদি কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তি একাই ভূমিকা রাখে তাহলে তার ওপরই জরিমানা ওয়াজিব হবে। ক্ষতিটি তার অনিচ্ছায় সংঘটিত হলেও। অবশ্য এ মাসআলা থেকে ওই পদ্ধতি ভিন্ন, যেখানে কোনোভাবেই ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব নয় যেমনটি ইতোপূর্বে আমরা 'বাদায়েউস সানায়ে' কিতাব থেকে উল্লেখ করেছি যে, যদি কোনো ব্যক্তি খাপের মধ্যে তলোয়ার নিয়ে চলে (এবং সেটি অন্য কারও ওপর পড়ে) তাহলে সে ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সে মাসআলায় যদি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ক্ষতির ব্যাপারে সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সেও শরিক থাকে আর এ ক্ষেত্রে তার ক্রিয়াশক্তি সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াশক্তি থেকে বেশি শক্তিশালী হয়, তাহলে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে ক্ষতির সম্পর্ক করা হবে। যেমনটি ইতোপূর্বে আমরা একাধিক মাসআলায় উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে পশুকে উত্যক্ত করা ও রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরের কারণে পড়ে যাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে। কারণ এ ক্ষেত্রে সে ক্ষতির দায়ভার নেবে না। বরং যে ব্যক্তি রাস্তায় পাথর রেখেছে, তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে।

ঘুমন্ত ব্যক্তির মাসআলার বিষয়টি হলো। (ঘুমন্ত ব্যক্তি অন্যের ওপর গড়িয়ে পড়ার কারণে কোনো ক্ষতি হলে তার দায়ভার তাকে গ্রহণ করতে হবে) সেখানে ঘুমন্ত ব্যক্তির সঙ্গে আর কোনো ব্যক্তি নেই যার দিকে ক্ষতির বিষয়টি সম্পৃক্ত করা যায়। কিন্তু উল্লিখিত গাড়ির মাসআলাটি তার বিপরীত। এখানে ক্ষতির সম্পর্ক চালকের সঙ্গে করার ক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়া ব্যক্তিও রয়েছে এবং তার সীমালঙ্ঘনের কারণে চালকের সঙ্গে ক্ষতির সম্পর্ক করা থেকে তার সঙ্গে করা অধিক শ্রেয়। কারণ, চালক সব আইন অনুসরণ করেছে। এ দুর্ঘটনায় তার ইচ্ছার কোনো দখল ছিলো না।

এ কারণে মাসআলাটি এমন হবে যে, জায়েদ যদি দেখে, উমর ঘুমোচ্ছে এবং অচিরেই সে গড়িয়ে পড়বে—এ অবস্থায় জায়েদ একটি ছোটো বাচ্চাকে

ওমরের নিচে রেখে দিলো আর সে বাচ্চার ওপর পড়ে গেলো যার ফলে বাচ্চাটি মারা গেলো—এ অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বরং তার ওপরই জরিমানা ওয়াজিব হবে, যে বাচ্চাকে রেখেছে। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুমন্ত ব্যক্তি সরাসরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিধানটি এমন হওয়ার কারণ হলো, বাচ্চার মৃত্যুর ভূমিকায় ঘুমন্ত ব্যক্তির সঙ্গে বাচ্চাকে রাখা ব্যক্তিও রয়েছে এবং তার ক্রিয়াশক্তিই অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী। কেননা বাচ্চাকে নিচে রাখা ব্যক্তিই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এমন করেছে এবং সীমালংঘন করেছে। আর ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করেনি এবং সীমালঙ্ঘনকারীও নয়। একই অবস্থা আমাদের আলোচ্য মাসআলায় চালকের ক্ষেত্রে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর তাওফিকে এ পর্যন্ত ট্রাফিক দুর্ঘটনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহ আলোচনা করেছি। একইসঙ্গে সেসব নীতি ও কায়দাসমূহও পেশ করেছি, যার ওপর এ ধরনের মাসআলার ভিত। এখন এ বিষয়ের অন্যান্য মাসআলাও এই ভিত্তিমূলের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সময়ের স্বল্পতা ও অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার কারণে এ বিষয়ের সব শাখাগত মাসআলা জমা করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আমার আশা যে, এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যা উল্লেখ করেছি (ইনশাআল্লাহ) এটি অধ্যায়ের অন্যান্য মাসআলার হুকুম বের করতে কাজে আসবে এবং সহযোগিতা করবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। তাঁর জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।

ঋণ ও ঋণপত্র বিক্রয় এবং তার শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

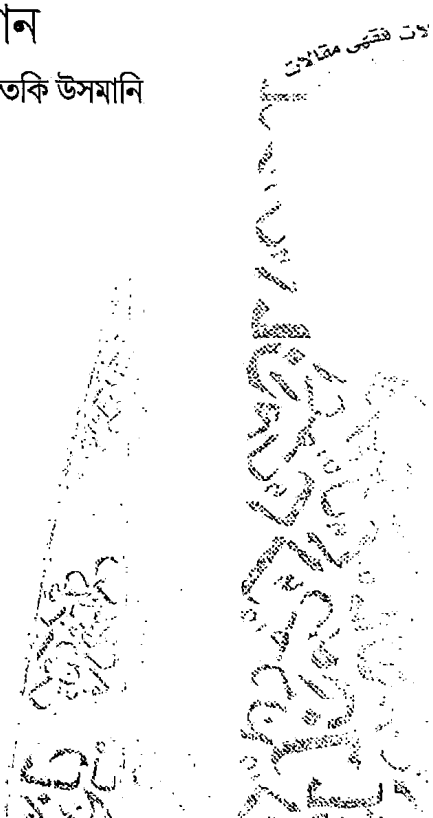

'ঋণ ও ঋণপত্র বিক্রয় এবং তার শরয়ি বিধান' এ প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) بيع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشرعية শিরোনামে আরবি ভাষায় রচনা করেন। ১৪১৯ হিজরি সনের রজব মাসে 'ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি' কর্তৃক বাহরাইনে অনুষ্ঠিত একাদশ সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এটি 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

—আবদুল্লাহ মায়মান

ঋণ ও ঋণপত্র বিক্রয় এবং তার শরয়ি বিধান

হামদ ও সালাতের পর—

বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্ট, ট্রেজারি বিলের নিলাম ও দরপত্র ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট, ডেট সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য আর্থিক প্রমাণপত্রকে স্টক এক্সচেঞ্জে ক্রয়-বিক্রয় করার সময় ঋণের লেনদেন করা বর্তমান পুঁজিবাদি অর্থনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের সব লেনদেনের মূল হলো ঋণকে ফেইসভ্যালু থেকে কমবেশিতে বিক্রয় করা। মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের কিছু আলেমের বক্তব্যে ঋণের ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আমাদের যুগের কিছু লোক সেটির একটি ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আর তার ওপর নির্ভর করে ঋণকে ফেইসভ্যালু থেকে কমবেশিতে বিক্রয় করাকে জায়েজ বলেছে।

সুতরাং ঋণ বিক্রয় এবং তার সব প্রকারের শরয়ি হুকুম বয়ান করার এবং সেইসঙ্গে এ বিষয়ে ফকিহদের মাজহাবকে স্পষ্ট করার প্রয়োজন অনুভূত হলো। সে লক্ষ্যে এই বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধটি পেশ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে হক ও সঠিক কথা বলার তাওফিক দান করেন। পদস্খলন ও ভুল থেকে রক্ষা করেন। তিনি সবকিছু শোনেন, অতি নিকটবর্তী দোয়া কবুলকারী।

ঋণ বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি

ঋণ বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেগুলোকে কেন্দ্র করে ফকিহগণ আলোচনা করেছেন।

এক. ঋণকে এমন ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করা, যা ক্রেতার দায়িত্বে অপরিহার্য।

দুই. ঋণকে এমন ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করা, যা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে অপরিহার্য।

এই দুই প্রকারকে 'বায়উল কালি বিল কালি' (بيع الكالئ بالكالئ) ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় নামে ব্যক্ত করা হয়।

তিন. যার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে, কোনো পন্যের বিনিময়ে তার কাছে ঋণ বিক্রয় করা।

চার. যার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে, নগদ অর্থের বিনিময়ে তার কাছে ঋণ বিক্রয় করা।

এই দুই প্রকারকে 'বায়উদ দাইন মিম্মান আলাইহিদ দাইন' (যার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে, তার কাছে ঋণ বিক্রয় করা) (بيع الدين ممن عليه الدين) নামে ব্যক্ত করা হয়।

পাঁচ. যার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে, সে ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পণ্যের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা।

ছয়. যার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে, সে ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির কাছে নগদ অর্থের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা।

এই দুই প্রকারকে 'বায়উদ দাইন মিম্মান লাইসা আলাইহিদ দাইন' (যার দায়িত্বে ঋণ নেই, এমন ব্যক্তির কাছে ঋণ বিক্রয়) (بيع الدين ممن ليس عليه الدين) নামে ব্যক্ত করা হয়।

নিচে বর্ণিত প্রকারসমূহের প্রত্যেকটির ওপর ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করবো। (ইনশাআল্লাহ)

এক. বায়উল কালি বিল-কালি (بيع الكالئ بالكالئ) ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়

ঋণকে ঋণের বিনিময়ে বিক্রয়, যাকে 'বায়উল কালি বিল কালি' নামে ব্যক্ত করা হয়। তার দুটি প্রকার রয়েছে—

১. বিক্রয় চুক্তিটি স্বয়ং ঋণীর সঙ্গে হবে।

২. বিক্রয় চুক্তিটি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে হবে।

প্রথমটির উদাহরণ : কোনো ব্যক্তি অন্যকে বললো, দুই হাজার রুপির বিনিময়ে আমি তোমার থেকে এভাবে এক টন গম ক্রয় করছি যে, উভয় বিনিময়কে (মূল্য ও পণ্য) একমাস পর পরস্পরের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এভাবে চুক্তি করার কারণে বিক্রেতার দায়িত্বে এক টন গম ঋণ হয়ে গেলো। আর ক্রেতার দায়িত্বে দুই হাজার রুপি ঋণ হয়ে গেলো। ফলে কার্যত একটি ঋণের বিনিময়ে অন্য ঋণ বিক্রয় করা হচ্ছে।

এর আরও একটি উদাহরণ : জায়েদ বায়ে সালামের (নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকি পণ্য বিক্রয়) পদ্ধতিতে এক টন গম বিক্রয় করলো। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় আসার পর জায়েদ ক্রেতাকে এক টন গম দিতে পারলো না। ফলে সে ক্রেতাকে বললো, আমার দায়িত্বে যে গম রয়েছে সেগুলোকে তিন হাজার রুপির বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। আমি এই তিন হাজার রুপি একমাস পর তোমাকে দেবো। এভাবে বিক্রেতার দায়িত্বে যে গম ছিলো, সেটিকে সে নিজেই তার দায়িত্বে থাকা অর্থের বিনিময়ে কিনে নিলো। শরয়ি দৃষ্টিতে এমন বিক্রয় নিষিদ্ধের বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ একমত। যার দলিল হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদিস—

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'

বর্ণিত হাদিসের ওপর এই অভিযোগ করা হয় যে, এটি 'জয়িফ' (দুর্বল)। কারণ তার সব সূত্রে দুর্বলতা পাওয়া যায়। হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনু উমর ও রাফে ইবনু খাদিজ রা. থেকে বর্ণিত। আর এ উভয় সূত্রের মূল হলো মুসা ইবনু উবাইদা আর-

রবাজি। যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের কাছে জয়িফ। এমনকি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. বলেছেন, তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা হালাল নয়। যখন ইমাম আহমাদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, শোবা তো তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন? তখন তিনি বললেন, অন্যরা তার সম্পর্কে যা জানে শোবা যদি সেটি জানতো, তাহলে সে মুসা থেকে বর্ণনা করা ছেড়ে দিতো।[২৮]

মনে রাখা প্রয়োজন যে, হাকেম ও দারাকুতনি রহ. বর্ণিত হাদিসটি মুসা ইবনু উবাইদা থেকে বর্ণনার পরিবর্তে মুসা ইবনু উকবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে হাকেম রহ. সেটিকে ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী বলেছেন। আর ইমাম জাহাবি রহ.ও তার ওপর কোনো সমালোচনা করেননি।[২৯] তারপরেও ইমাম বাইহাকি রহ. এ কথাকে ভুল আখ্যা দিয়ে বলেছেন, সহিহ কথা হলো, হাদিসটি মুসা ইবনু উবাইদা থেকে বর্ণিত। মুসা ইবনু উকবা থেকে নয়।[৩০]

ইমাম ইবনু হাজার রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী দারাকুতনি রহ. 'ইলাল' নামক কিতাবে এ কথা বলেছেন যে, উল্লিখিত বর্ণনায় মুসা ইবনু উবাইদা একক ব্যক্তি। সুতরাং এখান থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, তিনি নিজ সুনানে মুসা ইবনু উকবা থেকে যে বর্ণনা করেছেন, সেখানে তার ভুল হয়েছে।

বর্ণিত হাদিসটি জয়িফ হওয়ার পরও মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-এর একটি হাদিসের মাধ্যমে সেটির সমর্থন পাওয়া যায়।

---

[২৮] হাদিসটি অবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত। মুস্তাদরাকে হাকেম, (বৈরুত থেকে প্রকাশিত-১৪১১ হিজরি) খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৫। হাদিস : ২৩৪২/২১৩। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৬। হাদিস : ২৩৪৩/২১৪। সুনানে দারাকুতনি, অধ্যায় : বুয়ু, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭২০৭১। হাদিস : ২৬৯। সুনানে কুবরা, ইমাম বাইহাকি রহ. পরিচ্ছেদ : ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা.., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৯। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৯০। হাদিস : ৪৩৪। মুসান্নাফে ইবনু আবু শাইবা, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯৮। হাদিস : ২১৬৯। শরহু মাআনিল আসার, ইমাম তহাবি রহ. (মিশর থেকে প্রকাশিত) খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২১। মুসনাদে বাজ্জাজ, (আল্লামা হাইসামি রহ. কর্তৃক কাশফুল আসতারের ভাষ্য অনুযায়ী) খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১। হাদিস : ১৩৮। কামেল, ইবনু আদি রহ. খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৩৩৫। সেখানে রাফে ইবনু খাদিজ রা. থেকে বর্ণিত আছে। যেমনটি মুজামুল কাবির-এ উল্লেখ করা হয়েছে। খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১৭। হাদিস : ৪৩৭৫।

[২৯] মুস্তাদরাকে হাকেম, (তালখিস সহ, দাইরাতুল মাআরিফ থেকে প্রকাশিত) খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৭।

[৩০] সুনানে বাইহাকি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৯।

أخبرنا الأسلمي قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئء وهو بيع الدين بالدين وعن بيع المجر وهو بيع ما في البطون الإبل وعن الشغار.

'আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়উল কালি করতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো, ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা। উটের পেটের বাচ্চা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে মহর দেওয়া ছাড়া নিজের বোন বা মেয়ের বিনিময়ে অন্যের বোন বা মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।'[৩১]

এ বর্ণনায় মুসা ইবনু উবাইদা নেই। বরং এটি 'আসলামি' থেকে বর্ণিত। যার পূর্ণ নাম, ইবরাহিম ইবনু আবু ইয়াহইয়া আসলামি।[৩২] তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য সবার জানা। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তার থেকে বর্ণনা করা পরিহার করেছেন। তারপরেও ইমাম শাফিয়ি রহ. তার থেকে অনেক বেশি বর্ণনা করেছেন। সেইসঙ্গে তার সম্পর্কে বলেন, তাকে মিথ্যুক বলা থেকে আকাশ বা অন্য কোনো উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া আমার কাছে অতি সহজ। হাদিসের ক্ষেত্রে সে নির্ভরযোগ্য। এ ছাড়া ইবনু উকদা, ইবনু ইস্পাহানি ও ইবনু আদি রহ. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবার এর বিপরীতে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তার বিদআতি হওয়ার কারণে তার থেকে হাদিস বর্ণনা পরিহার করেছেন। তার যেহেতু ভালো-মন্দ উভয় দিক রয়েছে, তাই ইমাম জাহাবি রহ.-এর নীতি অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে মন্দের দিকটি প্রাধান্য পাওয়া উচিত।[৩৩] তবে ইমাম শাফিয়ি রহ. কর্তৃক তাকে সত্যায়ন করার কারণে তার বর্ণিত হাদিসটি মুতাবায়াতের যোগ্য হয়ে যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

এরপরও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এই হাদিসের বিষয়বস্তুর ওপর আমল করে ঋণের বিনিময়ে ঋণের বিক্রয়কে হারাম বলেছেন। এ ছাড়া মুহাদ্দিসগণ থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, আলেমদের পক্ষ থেকে হাদিসের বিষয়বস্তু গ্রহণ করার মাধ্যমে হাদিসের সূত্র কেন্দ্রিক দুর্বলতার ত্রুটি পুষিয়ে যায়। ইমাম সুয়ুতি রহ. সহিহ হাদিসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন—

---

[৩১] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ১৪৪৪০।

[৩২] নসবুর রায়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪০।

[৩৩] মিজানুল ইতেদাল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৯।

وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول وقال في التمهيد روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم الدينار أربعة وعشرون قيراطا قال وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد

'অনুরূপ যে বক্তব্য আলেমগণ গ্রহণ করার কারণে মজবুত হয়েছে। অনেক আলেম বলেছেন, আলেমগণ সেটিকে গ্রহণ করে নিলে সেটি সহিহ হাদিস হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। যদিও তার কোনো সহিহ সূত্র না থাকে। ইবনু আবদিল বার রহ. 'আল-ইস্তিজকার' কিতাবে বলেন, ইমাম তিরমিজি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারি রহ. 'হাদিসুল বাহর' ('সমুদ্রের পানি পবিত্র'—এ হাদিসটি)-কে সহিহ বলেছেন। অথচ মুহাদ্দিসগণ এমন সূত্রের হাদিসকে সহিহ বলেন না। কিন্তু হাদিসটি আমার কাছে সহিহ। কেননা, আলেমগণ সেটিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। 'তামহিদ' কিতাবে বলা হয়েছে—জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'الدينار أربعة وعشرون قيراطا' (চব্বিশ কিরাত সমান এক দিনার) হাদিসটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করে বলেন, 'আলেমগণ বর্ণনাটির বিষয়বস্তু গ্রহণ করায় এবং উম্মতের ইজমার কারণে তার সূত্রের দুর্বলতা কেটে গেছে।'[৩৪]

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন—

وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثَ أَيْضًا عَمَلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَفْقِهِ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَقِيبَ رِوَايَتِهِ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَالْعَمَلُ عليه عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ الْخ وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ : قَالَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ : عَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : شُهْرَةُ الْحَدِيثِ بِالْمَدِينَةِ تُغْنِي عَنْ صِحَّةِ سَنَدِهِ انْتَهَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

'হাদিস সহিহ হওয়ার একটি মাধ্যম এই যে, তার ওপর আলেমদের

[৩৪] তাদরিবুর রাবি, ইমাম সুয়ুতি রহ.। পৃষ্ঠা : ২৫। (মদিনা থেকে প্রকাশিত)

আমল করা। ইমাম তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাদিসটি গরিব। আহলে ইলম তার ওপর আমল করেছেন। সুনানে দারাকুতনিতে আছে, কাসেম ও সালেম রহ. বলেন, মুসলিম উম্মাহ তার ওপর আমল করেছে। (যদিও সূত্রের দৃষ্টিকোণে হাদিসটি গরিব) ইমাম মালিক রহ. বলেন, মদিনা মুনাওয়ারায় কোনো হাদিস প্রসিদ্ধি লাভ করা তাকে সহিহ সূত্রের মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়।'[৩৫]

ইমাম সাখাবি রহ. বলেন—

وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح،ولهذا قال الشافعي -رحمه الله عليه- في حديث «لا وصية لوارثٍ» أنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول، وعملوابه حتى جعلوه ناسخا لأية الوصية.

'কোনো জয়িফ হাদিসকে উম্মত যখন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নেয়, বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তখন তার ওপর আমল করা জরুরি। এ কারণে ইমাম শাফিয়ি রহ.— «لا وصية لوارثٍ» (ওয়ারিসের জন্য কোনো অসিয়ত নেই) হাদিসের ক্ষেত্রে বলেন, মুহাদ্দিসগণ তার সূত্রকে সহিহ বলেন না। কিন্তু উম্মত সেটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তার ওপর আমল করেছে। এমনকি হাদিসটিকে অসিয়তের আয়াতকে রহিতকারী বলেছে।'[৩৬]

ইমাম সুয়ুতি রহ. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত নিচের হাদিসের আলোচনায় বলেন—

من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتي بابا من أبواب الكبائر

'যে ব্যক্তি কোনো ধরনের ওজর ছাড়া দু-ওয়াক্ত নামাজকে একত্রিত করলো (কোনো নামাজ কাজা করলো), সে একটি কবিরা গুনাহ করলো।'

الحديث أخرجه الترمذي، وقال : حسن، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فأشار بذلك أن الحديث اعتضد

[৩৫] ফাতহুল কাদির, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : দাসীর তালাক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৪৯।

[৩৬] ফাতহুল মুগিস, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৮।

بقول أهل العلم، وقال غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به، وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله.

'হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করে বলেছেন, এটি হাসান। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা হাদিসটিকে জয়িফ বলেছেন। তবে হাদিসটির ওপর আহলে ইলমের আমল রয়েছে। এ কথার মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, আহলে ইলমের বক্তব্যের কারণে হাদিসটি মজবুত হয়েছে। একাধিক মুহাদ্দিস স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলেছেন যে, হাদিস সহিহ হওয়ার একটি দলিল হলো আহলে ইলম তার ওপর আমল করা। যদিও হাদিসের সূত্রটি এমন হয়, যা নির্ভরযোগ্য নয়।'[৩৭]

মোটকথা, বায়উল কালি বিল কালি হারাম হওয়ার বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম একমত। অধিকাংশ ফকিহ যাকে ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় বলে ব্যক্ত করেছেন। এমনকি কোনো কোনো ফকিহ এটি হারাম হওয়ার বিষয়ে আলেমদের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে কোনো সহিহ হাদিস নেই। তারপরও এ কথার ওপর ইজমা রয়েছে যে, ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই।[৩৮] তবে বাস্তবতা এই যে, ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়ের বিশেষ কিছু পদ্ধতি নাজায়েজ হওয়ার ওপর ইজমা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বায়ে সালামে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য মূল্য বাকি রাখার চুক্তি করা। অথবা এমন বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রীত পণ্য নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে পরিবর্তন করা।

মালিকি মাজহাবের আলেমগণ ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়ের বিশেষ কিছু পদ্ধতিকে জায়েজ বলেছেন। ইবনু তাইমিয়া রহ. এবং তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ও এ ধরনের বিক্রয়ের বিশেষ কিছু পদ্ধতিকে জায়েজ বলেছেন।[৩৯] আমাদের এ গবেষণা যেহেতু সেসব পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তাই এ বিষয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা করেই আমরা ইতি টানছি।

---

[৩৭] তাআক্কুবাত আলাল মাওজুআত, পৃষ্ঠা : ৫৪। (লাহোর থেকে প্রকাশিত)

[৩৮] ফয়জুল কাদির, আল্লামা মুনাবি রহ., খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩।

[৩৯] দেখুন, দুসুকি আলাশ শরহিল কাবির, (দারুল ফিকর থেকে প্রকাশিত) খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯৫-১৯৭। আলামুল মুআক্কিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৮। আল-গুরুর ও আসরুহু ফিল উকুদ, ড. শায়খ সিদ্দিক মুহাম্মাদ আমিন জরির। পৃষ্ঠা : ১৩২।

দুই. ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় করা

উল্লিখিত বিক্রয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, ঋণীর কাছেই নগদ মূল্যে ঋণ বিক্রয় করা। ফকিহগণ যেটিকে 'ঋণীর কাছে ঋণের বিক্রয়' নামে ব্যক্ত করে থাকেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের কাছে এ ধরণের বিক্রয় জায়েজ। কাসানি রহ. বলেন—

ويجوز بيعه (يعني الدين) ممن عليه ؛ لأن المانع هو العجز عن التسليم ، ولا حاجة إلى التسليم ههنا ، ونظيره بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ، ولا يصح من غيره إذا كان الغاصب منكرا ، ولا بينة للمالك.

'ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় জায়েজ আছে। কেননা, এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হলো সেটি হস্তান্তর করতে না পারা। আর ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সেটি হস্তান্তরের প্রয়োজন থাকে না। এটির দৃষ্টান্ত হলো, ছিনতাইকারীর কাছে ছিনতাইকৃত মাল বিক্রয় করা জায়েজ হওয়া। ছিনতাইকারী অস্বীকার করলে এবং মালিকের কাছে কোনো প্রমাণ না থাকলে অন্যের কাছে সেটি বিক্রয় করা জায়েজ নেই।[৪০]

এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় করার ক্ষেত্রে সেসব শর্ত থাকা জরুরি, যেগুলো সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জরুরি। উদাহরণস্বরূপ বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য এটি একটি শর্ত যে, পণ্য বিক্রেতার কর্তৃত্বে থাকতে হবে। ঋণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত শর্তটি থাকা আবশ্যক। এ কারণে বাইয়ে সালামের মধ্যে ক্রেতা পণ্য কবজা করার আগে সেটিকে বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কাসানি রহ. বলেন—

ولا يجوز بيع المسلم فيه ؛ لأن المسلم فيه مبيع ، ولا يجوز بيع المبيع قبل القبض.

' مسلم فيه ' মুসলামফিহ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কেননা, সেটি পণ্য (যা এখনো কবজা করা হয়নি)। আর কবজা করার আগে পণ্য বিক্রয় করা জায়েজ নেই।'[৪১]

ইমাম সিরাজি রহ. বলেন—

---

[৪০] বাদায়েউস সনায়ে, আল্লামা কাসানি রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

[৪১] বাদায়েউস সনায়ে, আল্লামা কাসানি রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৯।

وان كان الدين غير مستقر، نظرت، فان كان مسلما فيه لم يجز بيعه، لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق، فلم يجد تلك الحلل، فقال آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الجل،فكرهه ابن عباس رضي الله عنهما.

'ঋণ যদি অস্থিতিশীল হয়। তাহলে লক্ষ করতে হবে। সেটি যদি 'মুসলামফিহ' (বায়ে সালামের পণ্য) হয়। তাহলে সেটি বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কারণ ইবনু আব্বাস রা.-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে বায়ে সালামের পদ্ধতিতে কাপড়ের গাট্টি বিক্রয় করেছিলো। পরবর্তীকালে বাজারে এমন কাপড়ের গাট্টি পাওয়া যাচ্ছিলো না। তখন বায়ে সালামের ক্রেতা বিক্রেতাকে বললো, একটি পাতলা কাপড়ের গাট্টির বিনিময়ে দুটি মোটা কাপড়ের গাট্টি নেবো। ইবনু আব্বাস এমন বায়ে সালামের চুক্তিকে মাকরুহ বললেন।'[৪২]

একইভাবে ঋণ ও তার বিনিময় উভয়টি যদি সুদি জিনিস হয়, তাহলে সেখানে সেসব শর্ত পাওয়া জরুরি, যা সুদি জিনিস পরস্পর বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে ফকিহগণ বাকি ঋণে কিছু কমানোর শর্তে সেটিকে নগদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন 'দা' ও তাআজ্জাল'-এর আলোচনায় বিস্তারিত এসেছে।[৪৩]

একইভাবে ঋণী যদি বেশি মূল্যে বাকি ঋণকে ঋণদাতা থেকে ক্রয় করে, তাহলে সেটি নিরেট সুদি লেনদেন হবে। কারণ, এটি সে চুক্তির মতো হবে যেখানে ঋণদাতা ঋণীকে বলে, ঋণ পরিশোধ করবে নাকি বাড়িয়ে দেবে? (অর্থাৎ, তাৎক্ষণিক ঋণ পরিশোধ করো অথবা তার পরিমাণকে এক হাজার থেকে দু-হাজারে করে দাও) এমন চুক্তি হারাম হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনে এসেছে।

তবে ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ঋণী ঋণদাতাকে বলবে, 'আমার কাছে তোমার যে ঋণ রয়েছে তার পরিবর্তে তুমি এ কাপড় কিনে নাও। অথবা ঋণদাতা ঋণীকে বলবে, তোমার ওপর আমার যে ঋণ রয়েছে, সেটিকে এ কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রয় করছি।' সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের কাছে এমন বিক্রয় চুক্তি জায়েজ আছে।

---

[৪২] আল-মাজমু শরহু মুহাজ্জাব, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৯৭।

[৪৩] ফিকহি মাকালাতের প্রথম খণ্ডে কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

তিন. ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা

ঋণ বিক্রয়ের তৃতীয় পদ্ধতি এই যে, ঋণদাতা তার ঋণকে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করবে। এ পদ্ধতি জায়েজ হওয়ার বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফি, হাম্বালি ও জাহেরি মাজহাবের ফকিহগণ এ মত পোষণ করেছেন যে, ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু শাইবানি রহ. বলেন—

لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه، لأنه غرر، فلا يدري أيخرج أم لا يخرج.

'কোনো ব্যক্তির যদি অন্যের কাছে ঋণ থাকে, তাহলে সে ঋণ আদায় করা ছাড়া সেটি বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কারণ, এমন ঋণ বিক্রয় করা ধোঁকা। কেননা, সে নিজেই জানেনা যে, ঋণ আদায় করতে পারবে কি না।'[৪৪]

কাসানি রহ. বলেন—

ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين ؛ لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة ، وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه ، وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع ، ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضا ؛ لأنه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع.

'ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করলে সে বিক্রয় সহিহ হবে না। কেননা, ঋণ দ্বারা হয়তো দায়িত্বে থাকা হুকমি মাল উদ্দেশ্য হবে। যেটি ঋণীর দায়িত্বে রয়েছে। অথবা ঋণ দ্বারা সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া এবং সেটি হস্তান্তর করা উদ্দেশ্য হবে। এ দুটি বিষয়ই বিক্রেতার ক্ষমতার বাইরে। আর যদি ঋণীর ওপর মাল হস্তান্তরের শর্ত করা হয়, তাহলে সেটি সহিহ নয়। কেননা, সেটি বিক্রেতা ছাড়া অন্যের ওপর মাল হস্তান্তরের শর্ত আরোপ করা। তাই তা ফাসেদ শর্ত হবে এবং বিক্রয়চুক্তি ফাসেদ হবে।'[৪৫]

---

[৪৪] মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ রহ., পরিচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তি অন্যের কাছে কোনো দান বা ঋণ পেলে সেটি বিক্রি করা। পৃষ্ঠা : ৩৫৪।

[৪৫] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

কাজি আবু ইয়ালা হাম্বালি রহ. বলেন—

واختلف في بيع الدين ممن هو عليه، فنقل أبو طالب المنع: ونقل منه جواز ذلك، ولا تختلف الرواية أنه لا يجوزبيعه من غير من هو في ذمته، وجه الأولي، أنه بيع دين قبل قبضه، فلم يصح، كما لو باعه من غير من هو عليه، ووجه الثانية، أنه إذا باعه ممن هو عليه فقد حصل القبض فيه، فيجب أن يصح ويفارق هذا إذا باعه من غيره أنه لا يصح، لأنه قد لا يتمكن من استفائه ممن هو عليه، فيتعذر تسليم المبيع، فلهذا لم يصح.

'ঋণীর কাছেই ঋণ বিক্রয়ের বিষয়ে ফকিহদের মতানৈক্য রয়েছে। আবু তালিব রহ. নাজায়েজের কথা নকল করেছেন। তার থেকে এমন বিক্রয় জায়েজের কথাও বর্ণিত আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য নেই যে, ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। জায়েজ না হওয়ার প্রথম কারণ, সেটি ঋণ উসুলের আগে বিক্রয় করা। তাই তা সহিহ নয়। যেমন : যার দায়িত্বে ঋণ নেই এমন ব্যক্তির কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। দ্বিতীয় কারণ, ঋণীর কাছে যদি ঋণ বিক্রয় করা হয় সেখানে কবজা পাওয়া যায়। ফলে সেটি সহিহ হওয়া আব্যশক হয়। এই মাসআলা থেকে ভিন্ন রাখা হবে ওই মাসআলাকে যেখানে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা হয়। সেটি জায়েজ নেই। কেননা, অনেক সময় ঋণী থেকে ঋণ উসুল সম্ভব হয় না। তাই পণ্য হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে এমন বিক্রয় সহিহ নয়।'[৪৬]

মারদাবি রহ. বলেন, ইবনু হাজম রহ. বলেছেন—

لا يحل بيع دين يكون لانسان على غيره، لا بنقد، ولا بدين، لا بعين، ولا بعرض، كان ببينة أو مُقَرًّا به، أو لم يكن، كل ذلك باطل، برهان ذلك أنه بيع مجهول وما لا يدري عينه، وهذا هو أكل مال بالباطل، وهو قول الشافعي، وروينا عن طريق وكيع، نا زكريا بن أبي زائدة قال: سئل الشعبي عمن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب؟ قال: لا يصلح، قال وكيع: وحدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: هو غرر.

---

[৪৬] কিতাবুর রেওয়াতাইন ওয়াল ওজহাইন, আবু ইয়ালা রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৭।

'কেউ অন্যের কাছে ঋণ পেলে সেটিকে কোনোভাবেই বিক্রয় করা জায়েজ নেই। নগদ, ঋণ, পণ্য বা অন্য কোনো জিনিসের বিনিময়েও করা যাবে না। চাই সে ঋণটি স্পষ্ট প্রমাণ বা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আরোপিত হোক বা না হোক। সর্ব অবস্থায় এমন ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। ...এর প্রমাণ হলো, এটি অজ্ঞাত পণ্যের বিক্রয়। এটি হলো বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণ করা। এটি ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর একটি অভিমত। ইমাম ওকি রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, ইমাম শাফিয়ি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কেউ যদি কাপড়ের বিনিময়ে এমন একটি প্রমাণপত্র ক্রয় করে যাতে তিন দিনার রয়েছে, তার হুকুম কী? উত্তরে তিনি বলেন, এমন চুক্তি সহিহ নয়। ইমাম ওকি রহ. বলেন, সুফিয়ান রহ. আবদুল্লাহ ইবনু আবু সফরের সূত্রে ইমাম শাবি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, এটি ধোঁকাবাজি।'[৪৭]

এরপর যেসব ফকিহ ঋণকে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন, তারা সেটিকে বিক্রয়ের পদ্ধতিতে চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি ঋণ স্থানান্তরের পদ্ধতিতে 'হাওয়ালা' করা হয়। তাহলে সব ফকিহের কাছে এমনটি করা জায়েজ আছে। হানাফি মাজহাবে বিক্রয় ও 'হাওয়ালার' মাঝে পার্থক্য একেবারেই স্পষ্ট। কারণ হানাফি ফকিহগণ এ কথা বলেছেন যে, যদি 'মুহাল আলাইহি' (যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে) দেউলিয়া হয়ে যায় কিংবা সে হাওয়ালাকে অস্বীকার করার কারণে সেটি বাতিল হয়ে যায় এবং হাওয়ালা করা হয়েছে এ ব্যাপারে তেমন কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে 'মুহতাল' (আসল ঋণদাতা) এর জন্য 'মুহিল' (আসল ঋণীর) কাছে ঋণ আদায়ের দাবি করা জায়েজ আছে।[৪৮]

কিন্তু ঋণী যদি তার ঋণ বিক্রয় করে দেয়, তাহলে যেন তার ঋণের সব অধিকার ও ঝুঁকির দায়ভার নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতাকে তার স্থানে দাঁড় করিয়ে দিলো। সুতরাং পরবর্তীকালে যদি আসল ঋণী সম্পদহীন হয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। অথবা সে ঋণ অস্বীকার করে বসে। তাহলে ঋণের ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছে ঋণ চাইতে পারবে না। কেননা, সে তো সব ধরনের দায়মুক্ত) কাজেই এভাবে ঋণ বিক্রয়ের কারণে ধোঁকার সম্মুখীন হতে হলো, যে কারণে ফকিহগণ ঋণ বিক্রয়

[৪৭] আল-মুহাল্লা, আল্লামা ইবনু হাজম রহ.। পৃষ্ঠা : ৬০৯০।

[৪৮] হেদায়া, ফাতহুল কদিরের সঙ্গে প্রকাশিত। খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৫২।

করা থেকে নিষেধ করেছেন। অথচ হাওয়ালার পদ্ধতি অবলম্বনে ধোঁকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, হাওয়ালার মধ্যে যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে সে দেউলিয়া বা সম্পদহীন হয়ে পড়লে কিংবা ঋণ অস্বীকার করলেও আসল ঋণীর কাছে ঋণের দাবি করার সুযোগ থাকে। তবে হাম্বালিদের কাছে মুহতাল অর্থাৎ, ঋণদাতা কোনো অবস্থাতেই মূল ঋণী ব্যক্তির কাছে তার ঋণ চাইতে পারবে না।

যদিও মুহতাল আলাইহি (যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে) দেওলিয়া হয়ে যায় বা ঋণ অস্বীকার করে বসে। তবে যদি ঋণদাতা মুহতাল আলাইহির সামর্থবান ও স্বচ্ছল হওয়ার শর্ত করে থাকে এবং সে ভিত্তিতেই হাওয়ালা কবুল করে থাকে এরপর দেখা গেলো যে, সে সামর্থবান নয়, সে ক্ষেত্রে তাদের কাছেও ঋণদাতা মূল ঋণী ব্যক্তির কাছে তার ঋণ চাইতে পারবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাম্বালিদের কাছে ঋণ বিক্রয় ও হাওয়ালার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ঋণ বিক্রয় করা তাদের কাছে জায়েজ নেই। তবে হাওয়ালা জায়েজ আছে। আর এ পার্থক্যটি দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ে থাকে।

এক. ঋণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি করা মাত্রই ঋণটির সব অধিকার ক্রেতার কাছে চলে যায়। আর এ ক্ষেত্রে ঋণ উসুল হওয়া যেহেতু অনিশ্চিত, তাই চুক্তিতেই ধোঁকা আবশ্যকভাবে থাকে। ফলে এমন চুক্তি জায়েজ হবে না। তবে কেউ যদি এমন জিনিস বিক্রয় করে, যার মূল্য সে এখন পর্যন্ত কবজা করেনি আর ক্রেতা চাইছে যে, বিক্রেতাকে ক্রেতার ঋণীর কাছে হাওয়ালা করে দেবে, তাহলে ক্রেতা সে সময় পর্যন্ত হাওয়ালা করতে পারবে না, যতক্ষন বিক্রেতা হাওয়ালা গ্রহণে সম্মত না হবে। শুধু হাওয়ালা চুক্তি করার ফলেই বিক্রেতার কাছে ঋণ স্থানান্তর হবে না। বিধায় এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য হাওয়ালা চুক্তি করতে রাজি না হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। অতএব হাওয়ালা চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো ধোঁকা নেই। এ কারণেই চুক্তিটি জায়েজ হবে এবং বিক্রেতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে স্বতন্ত্র চুক্তিতে হাওয়ালা করা হবে।

দুই. ঋণদাতা যদি হাওয়ালা গ্রহণকারী ধনী হওয়ার শর্তে হাওয়ালা চুক্তিতে রাজি হয় পরবর্তীকালে সে দরিদ্র হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায়। তাহলে এমন ক্ষেত্রে ঋণদাতার জন্য সুযোগ আছে যে, তার ঋণকে আসল ঋণীর কাছ থেকে আদায় করবে। অথচ ঋণ বিক্রয় করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন সুযোগ নেই।

ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের বিষয়ে মালিকি মাজহাব

মালিকিদের কাছেও মূলত ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। অবশ্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পাওয়া গেলে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ হয়ে যায়। ইমাম জুরকানি রহ. তৃতীয় শ্রেণির (Third Party) কাছে ঋণ বিক্রয়ের বিধানসমূহের সারাংশ বর্ণনা করে বলেছেন—

ومنع بيع دين على الغائب، ولو قربت غيبته، أو ثبت ببينة وعلم ملؤه، بخلاف الحوالة عليه فانها جائزة، ومنع بيع دين على حاضر ولو ببينة الا أن يقر، والدين مما يباع قبل قبضه، وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وليس بين مشتريه ومن عليه عداوة، ولا قصد اعناته، فلا بد من هذه الخمسة شروط لجواز بيعه زيادة على قوله «يقر».

'ঋণীর অনুপস্থিতিতে ঋণ বিক্রয় নিষিদ্ধ। চাই তার অনুপস্থিতির সময় অতিস্বল্প হোক বা দলিলের মাধ্যমে ঋণ প্রমাণিত এবং সে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত জানা থাকুক। অবশ্য ঋণীর অনুপস্থিতিতে ঋণ হাওয়ালা করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেটি জায়েজ আছে। তেমনি ঋণীর উপস্থিতিতেও ঋণ বিক্রয় নিষিদ্ধ যদিও দলিলের মাধ্যমে সেটি প্রমাণিত থাকুক না কেন। তবে ঋণী যদি নিজেই ঋণের স্বীকারোক্তি দেয় এবং ঋণটি এমন প্রকৃতির হয়, যা কবজা করার আগেই বিক্রয় করা যায় (অর্থাৎ, খাবার জাতীয় না হয়) এবং ঋণকে তার ভিন্ন জাতীয় জিনিসের (Heterogeneous) বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। স্বর্ণের ঋণ রুপার ঋণের বিনিময়ে বা রুপার ঋণ স্বর্ণের ঋণের বিনিময়ে না হয় এবং ঋণের ক্রেতা ও আসল ঋণীর মধ্যে কোনো ধরনের শত্রুতা না থাকে তাহলে ঋণীকে কোনো ধরনের সংকীর্ণতার জালে আটকানোর উদ্দেশ্যে ঋণ বিক্রয় করা হবে না। ঋণীর স্বীকারোক্তির শর্তের সঙ্গে বর্ণিত পাঁচটি শর্ত পাওয়া গেলে ঋণ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।'[৪৯]

সারকথা হলো, মালিকিদের কাছে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার জন্য নিচের শর্তগুলো পাওয়া জরুরি—

---

[৪৯] শরহু জুরকানি আলা মুখতাসারিল খলিল, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৩।

১. ঋণী উপস্থিত থাকতে হবে। সফর বা অন্য কোথাও থাকতে পারবে না।

২. ঋণী এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে।

৩. এমন জিনিসের ঋণ হতে হবে, যা কবজা করা ছাড়া বিক্রয় করা জায়েজ। উদাহরণস্বরূপ যদি গমের ঋণ হয়, তাহলে বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কারণ কবজা করা ছাড়া গমের বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৪. এমন কোনো জিনিসের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করতে হবে, যা তার সমজাতীয় হবে না। সুতরাং দিরহামের ঋণ হলে সেটিকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ নেই। দুসুকি রহ. এখানে আরও একটি বিষয় সংযোজন করেন যে, ঋণ ও বিনিময় সমজাতীয় হলে তার বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য উভয় দিকের পরিমাণ সমান হওয়া শর্ত।

৫. স্বর্ণের ঋণের বিনিময়ে রুপা বিক্রয় করা। অথবা রুপার ঋণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কারণ স্বর্ণ রুপার পারস্পারিক বিনিময় করা 'বায়ে সরফ'। আর সেখানে উভয় বিনিময় কবজা করার শর্তটি পাওয়া যায়নি।

৬. ঋণী ও ঋণ ক্রেতার মাঝে কোনো ধরনের শত্রুতা থাকতে পারবে না। এ শর্তটি এ কারণে সংযুক্ত করা হয়েছে যে, ঋণ বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো ঋণীর শত্রুকে তার ওপর চাপিয়ে তাকে বিপদের সম্মুখীন যেন না করা হয়। উল্লিখিত শর্তসমূহের সঙ্গে দুসুকি রহ. আরও দুটি শর্ত সংযুক্ত করেছেন।

এক. মূল্য নগদ হতে হবে। বাকি হবে না। এটি একেবারেই মৌলিক শর্ত। যেন লেনদেনের উভয় দিকটি ঋণ না হয়ে যায়। এমন লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে।

দুই. ঋণী এমন ব্যক্তি হতে হবে, যার ওপর আইন প্রয়োগ করা যায়। যেন সে ঋণ আদায়ে টালবাহানা করলে আদালতের মাধ্যমে সেটি উসুল করা যায়।

শাফিয়ি মাজহাব

ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের বিষয়ে শাফিয়ি মাজহাবে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। নববি রহ. বলেন—

> اعلم أن الاستبدال، بيع لمن عليه دين. فأما بيعه لغيره، كمن له على إنسان مائة، فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة، فلا يصح على الاظهر، لعدم القدرة على التسليم. وعلى الثاني: يصح، بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس. فإن تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد. قلت: الاظهر: الصحة.

> 'যার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে, তার ঋণের বিনিময়ে তার সঙ্গে কোনো কিছু পরিবর্তন করা বিক্রয়ের হুকুমভুক্ত। তবে ঋণকে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করা, যেমন : কোনো ব্যক্তি অন্যের কাছে একশো টাকা পাবে, এ একশো টাকার বিনিময়ে সে তৃতীয় কারও থেকে একজন দাস ক্রয় করলো, শাফিয়ি মাজহাবের সুস্পষ্ট মত অনুযায়ী এটি সহিহ নয়। কারণ, ক্রেতাকে বিক্রেতা একশো টাকা দিতে সক্ষম নয়। অবশ্য অন্য বর্ণনা অনুযায়ী এই শর্তের সঙ্গে এমন লেনদেন জায়েজ আছে যে, চুক্তির মজলিসে ঋণীর থেকে ঋণের ক্রেতা তার ঋণ আদায় করবে। আর ঋণবিক্রেতা চুক্তির মজলিসেই বিনিময় তথা দাসকে কবজা করবে। তবে কোনোটি কবজা করার আগে যদি তারা মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে এমন চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আমি বলি, স্পষ্ট অভিমত হলো, এমন চুক্তি সহিহ হবে।'[৫০]

ইমাম বাগাবি রহ. বলেন—

> أما إذا باع الدين من غير من عليه، مثل إن كان له على زيد عشرة دراهم، فاشتري من عمرو ثوبا بتلك العشرة، أو قال لعمرو: بعتك العشرة التي في ذمة زيد لي بثوبك هذا، فاشتراه عمرو، فالمذهب أنه لا يجوز، لأنه غير قادر على تسليمه، وفيه قول أخر: أنه يجوز على حسب ما يجوز ممن عليه، فعلى هذا يشترط ان يقبض مشتري الدين

---

[৫০] রওজাতুত তালিবিন, ইমাম নববি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫১৪।

ممن عليه، وبائعه يقبض العوض في المجلس، حتى لو تفرقا قبل قبض احدهما بطل.

'ঋণী ছাড়া যদি অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা হয়, যেমন : জায়েদের দায়িত্বে দশ দিরহামের ঋণ রয়েছে, সে এই দশ দিরহামের বিনিময়ে আমর থেকে একটি কাপড় ক্রয় করলো অথবা আমরকে বললো, জায়েদের কাছে আমি যে দশ দিরহাম পাবো, সেটিকে এই কাপড়ের বিনিময়ে তোমার কাছে বিক্রয় করছি এবং আমর সে ঋণ ক্রয় করে নিলো। আসল মাজহাব অনুযায়ী এমন চুক্তি অবৈধ। কারণ, সে ওই ঋণ হস্তান্তরের ক্ষমতা রাখে না। ...এমন চুক্তির ক্ষেত্রে অন্য মতটি হলো, ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ভিত্তিতে এ চুক্তিটিও জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, ঋণের ক্রেতা ঋণী থেকে ওই ঋণ মজলিসেই উসুল করতে হবে। আর ঋণ বিক্রেতাও চুক্তির মজলিসেই তার বিনিময়টি কবজা করবে। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতা যদি পণ্য ও তার বিনিময় কবজা করার আগেই মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।'[৫১]

শরহু মুহাজ্জাব-এ একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে—

فأما بيعه لغيره كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة ففى صحته قولان مشهوران (أصحهما) لا يصح لعدم القدرة على التسليم (والثانى) يصح بشرط أن يقبض مشترى الدين الدين ممن هو عليه وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس فان تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد.

'ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের ব্যাপারটি হলো; কোনো ব্যক্তি অন্যের কাছে একশো দিরহাম পাবে, সে এই একশো দিরহাম দিয়ে অন্য কারও থেকে একটি দাস ক্রয় করলো, তার এ ক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে দু-ধরনের অভিমত রয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হলো, এমন বিক্রয়চুক্তি সহিহ নয়। কারণ, ঋণ বিক্রেতা ঋণ হস্তান্তর

[৫১] তাহজিব, বাগবি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪১৭।

করতে সক্ষম নয়। আর দ্বিতীয় অভিমত হলো, এই শর্তের সঙ্গে জায়েজ আছে যে, চুক্তির মজলিসেই ক্রেতা ঋণী থেকে ঋণ কবজা করবে আর ঋণ বিক্রেতা তার বিনিময়কে কবজা করবে। চুক্তির মজলিসে ঋণ ও তার বিনিময়ের কোনো একটিও কবজা না করে তারা যদি মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে চুক্তিটি বাতিল হবে।'[৫২]

বর্ণিত উদ্ধৃতিসমূহের সারাংশ এই যে, শাফিয়ি মাজহাবে ঋনী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। তবে এমন ক্ষেত্রে জায়েজ হবে, যেখানে চুক্তির মজলিসেই ঋণী থেকে ক্রেতা ঋণ আদায় করে সেটি কবজা করবে। বাস্তবতা হলো, এই শর্তটি ঋণ বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। কারণ, চুক্তির মজলিসে যখন ঋণ কবজা করা হলো, তখন সেটি আর ঋণ থাকলো না। সম্ভবত এ কারণে নববি রহ. 'মিনহাজুত তালেবিন' কিতাবে শুধু নাজায়েজের অভিমত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبدا زيد بمائة له على عمرو.

'সুস্পষ্ট অভিমত অনুযায়ী ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা বাতিল। যেমন : আমরের কাছে পাওনা ঋণের বিনিময়ে জায়েদ একটি দাস ক্রয় করলো।'[৫৩]

তবে শাফিয়ি মাজহাবের অনেক আলেম এ শর্তটি উল্লেখ করেননি। এমনকি শিরাজি রহ.-এর মতো ব্যক্তিও 'মুহাজ্জাব' কিতাবের মতনে এ শর্তটি উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন—

وهل يجوز من غيره ؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز، لأن ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة . والثاني: لا يجوز لأنه لا يقدر على تسليمه إليه، لأنه ربما منعه أو جحده، وذلك غرر لا حاجة به إليه فلم يجز، والأول أظهر، لأن الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا جحود.

---

[৫২] আল-মাজমু শরহু মুহাজ্জাব, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩০০।

[৫৩] মিনহাজুত তালিবিন, ইমাম নববি রহ., খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭১।

'ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে কি ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ আছে? এ ব্যাপারে দু-ধরনের অভিমত রয়েছে। একটি অভিমত অনুযায়ী জায়েজ আছে। কারণ, ঋণীর কাছে যেহেতু ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ আছে, সেহেতু অন্যের কাছেও সেটি বিক্রয় করা জায়েজ হবে। যেমন : আমানত রাখা। দ্বিতীয় অভিমত হলো, এমন বিক্রয় জায়েজ নেই। কারণ, বিক্রেতা উল্লিখিত ঋণকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করতে সক্ষম নয়। কেননা, অনেক সময় ঋণী ঋণ পরিশোধ করতে পারে না কিংবা অস্বীকার করে বসতে পারে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে ধোঁকা পাওয়া যাচ্ছে। যেটিকে মেনে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ফলে এ ধরনের বিক্রয় জায়েজ হবে না। তবে প্রথম অভিমতটি বেশি স্পষ্ট। কারণ, সাধারণত ঋণ বিক্রেতা ঋণী থেকে আদায় না করা কিংবা অস্বীকার করা ছাড়াই ঋণ আদায় করতে সক্ষম হয়।'[৫৪]

শিরবিনি খতিব রহ. জায়েজের অভিমতের ওপর আস্থা রেখে বলেন—

وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين في المجلس وهذا هو المعتمد، وإن قال المطلب : مقتضى كلام الأكثرين بخالفه.

'রওজা কিতাবের আসল, যেমন বাগাবি রহ.-এর কিতাবে চুক্তির মজলিসে উভয় বিনিময় কবজা করার শর্তের কথাটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এটিই নির্ভরযোগ্য অভিমত। যদিও মুত্তালিব রহ. বলেছেন যে, অধিকাংশ আলেমের কথা এ কথার বিপরীতটি প্রমাণ করে।'[৫৫]

শাফিয়ি মাজহাবের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করার পর এ কথা বুঝে আসে যে, তাদের অধিকাংশ ফকিহ শর্তহীনভাবে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা নাজায়েজের পক্ষে। আর জায়েজের পক্ষে যারা অভিমত দিয়েছেন, তারাও এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, চুক্তির মজলিসেই ঋণ কবজা করতে হবে। আর যারা শর্তহীনভাবে জায়েজের অভিমত দিয়েছেন, যেমন : সিরাজি রহ. তাদের শর্তমুক্ত অভিমতকে হয়তো শর্তযুক্ত অভিমত হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। অথবা সেটিকে তৃতীয় অভিমত হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে।

---

[৫৪] আল-মুহাজ্জাব, মাজমু কিতাবের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৯৭।

[৫৫] মুগনিল মুহতাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭১। নেহায়াতুল মুহতাজ, আল্লামা রমলি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯০। সেখানেও এ কথা বলা হয়েছে।

অনেকে উল্লিখিত অভিমত দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেছেন যে, যারা চুক্তির মজলিসে উভয় বিনিময়কে কবজা করার শর্তারোপ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো সেসব চুক্তি যেখানে উভয় বিনিময় সুদি জিনিস হয়। আর যারা শর্তহীনভাবে জায়েজের অভিমত পোষণ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো, এমন চুক্তি যেখানে উভয় বিনিময় সুদি জিনিস হয় না। দুটি অভিমতের মধ্যে এ ধরনের সমন্বয় খুবই সুন্দর। কিন্তু শিরবিনি ও রমলি রহ. এই ভিন্নতার মাধ্যমে সমন্বয়কে এই কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, চুক্তিটি জায়েজ হওয়ার জন্য মজলিসে উভয় বিনিময় কবজা করার শর্তারোপ করার পর তারা এর উদাহরণ দিয়েছেন সুদহীন জিনিসের মাধ্যমে। অর্থাৎ, দাসের উদাহরণ এনেছেন।

বর্তমান সময়ের আর্থিক ঋণপত্র

ঋণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফিকহি আলোচনা করার পর এখন সেসব আর্থিক ঋণপত্রের আলোচনার দিকে অগ্রসর হবো, বর্তমান বাজারে যার প্রচলন রয়েছে। সেইসঙ্গে তার শরয়ি বিধানও বয়ান করবো। আর্থিক ঋণপত্রের মধ্যে কোম্পানির শেয়ারের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেগুলো নগদ টাকা ছাড়াও বিভিন্ন বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে।

এ সকল আর্থিক প্রমাণ-পত্রদুটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের আওতাভুক্ত নয়। কারণ, এ আর্থিকপত্রগুলো ঋণ ও ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে না। আর এগুলোর শরয়ি বিধান অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। এ প্রবন্ধে সেসব আর্থিক প্রমাণপত্রের শরয়ি বিধান আলোচনা করার ইচ্ছে করেছি, যেগুলো এর বাহকের জন্য ইস্যুকারীর দায়িত্বে থাকা ঋণ বা ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে। এমন প্রমাণ-পত্রসমূহ বিভিন্ন নামে প্রকাশিত থাকলেও প্রচলিত সব প্রমাণপত্রকে বড়ো দুটিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রকার হলো 'বন্ড'। আর দ্বিতীয়টি হলো, 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'। আমরা এখন এ দুই প্রকারকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১. বন্ড

বর্তমানের পরিভাষায় এমন আর্থিক ঋণপত্রকে 'বন্ড' বলা হয়, যেটিকে ঋণী তার ঋণদাতার জন্য ইস্যু করে। যা ঋণীর পক্ষ থেকে এ কথার স্বীকারোক্তি যে, 'বন্ড' বহনকারীর কাছ থেকে ঋণী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ নিয়েছে এবং নির্ধারিত

সময়ে সেটি পরিশোধে অঙ্গীকারবদ্ধ। সাধারণত এ ধরনের 'বন্ড' জনসাধারণের সামনে পেশ করা হয়ে থাকে, যেন ইস্যুকৃত 'বন্ডের' ওপর নির্ধারিত অর্থ দিয়ে তারা সেটিকে গ্রহণ করে। ফলে সাধারণ মানুষ 'বন্ড ইস্যুকারী' থেকে 'ঋণদাতা' হয়ে যায়।

অংশীদার ভিত্তিক ব্যাবসায়িক কোম্পানি বা উৎপাদনশীল কোম্পানি কখনো কখনো এমন 'বন্ড' ইস্যু করে, যখন কোম্পানির কোনো প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য বড়ো অংকের অর্থের প্রয়োজন পড়ে এবং সে কোম্পানি এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পায়না, যারা তার প্রস্তাবিত অর্থের চাহিদাকে পূরণ করতে পারে। এ কারণে সাধারণ মানুষের সামনে কোম্পানি এমন 'বন্ড' ইস্যু করে।

অনেক সময় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন 'বন্ড' ইস্যু করা হয়। বাজেটের ঘাটতি পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রের বড়ো অংকের অর্থের প্রয়োজন পড়লে, রাষ্ট্র সাধারণ মানুষ থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

কোম্পানি বা রাষ্ট্র—যে-ই এমন 'বন্ড' ইস্যু করে, সেই (কোম্পানি বা রাষ্ট্র) এটি নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয় যে, 'বন্ডের' বাহককে সে সুদ দেবে। উদাহরণস্বরূপ, 'বন্ডের' মূল্য যদি একশো টাকা হয়, তাহলে কোম্পানি এই কথার দায়ভার গ্রহণ করে যে, এক বছর পর 'বন্ডের' বাহককে সে একশো দশ টাকা দেবে। আর 'বন্ড' বাহকের এ অধিকার থাকে যে, বাজারে সে এই 'বন্ড' বিক্রয় করতে পারবে। আর বাজারে এমন 'বন্ড' বেচাকেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা যে মূল্যের ওপর একমত হবে, সে মূল্যেই সেটি বিক্রয় করা হবে। কেউ যদি একশো টাকার বিনিময়ে একটি 'বন্ড' গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে অন্যের কাছে সেটিকে একশো পাঁচ টাকায় বিক্রয় করবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেটিকে বেশি মূল্যে এ আশায় ক্রয় করে যে, নির্ধারিত সময়ে এ 'বন্ডের' বিনিময়ে একশো দশ টাকা পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া আরও এক ধরনের 'বন্ড' রয়েছে। যা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইস্যু করা হয় এবং সাধারণত সেগুলো ক্রয় করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যাকে 'ট্রেজারি বন্ড' বলা হয়। এমন 'বন্ড' ইস্যু করার পেছনে সেই উদ্দেশ্য থাকে, যা অন্যান্য সরকারি 'বন্ড' ইস্যু করার পেছনে থাকে। পার্থক্য কেবল এই যে, এমন 'বন্ড' ক্রয়ের জন্য ব্যাংকগুলোকে আমন্ত্রন জানানো হয়। যেন নিলামের ভিত্তিতে ব্যাংক সেগুলোকে কিনে নেয়। উদাহরণস্বরূপ যে

'বন্ডের' মূল্য এক হাজার টাকা হয়, তার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর রাষ্ট্রের ওপর আবশ্যক হয় যে, 'বন্ডের' বাহককে এক হাজার টাকা দিয়ে দেবে। তাই এমন 'বন্ড' বিক্রয়ের জন্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে নিলাম হয়। অন্যান্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আবেদন আসে। নিলামে যে ব্যাংক 'বন্ডের' বেশি মূল্য ঘোষণা করে, সে ব্যাংকের কাছেই সেই 'বন্ড' বিক্রয় করা হয়।

যেমন : 'আলিফ' ব্যাংক এ প্রস্তাব করলো যে, সে একশো টাকার 'বন্ডকে' নব্বই টাকায় ক্রয় করবে। আর অন্য একটি ব্যাংক প্রস্তাব করলো যে, সে একানব্বই টাকায় ক্রয় করবে। এমন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যাংক উল্লিখিত 'বন্ড' ক্রয়ের অধিকারী বলে গণ্য হবে। এই 'বন্ড' বিক্রয়ের অর্থ হলো, তার ক্রেতা রাষ্ট্রকে বন্ডের মূল্য পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছে। ঋণ দেওয়ার কারণে নির্ধারিত সময় আসার পর ব্যাংক সে বন্ডের গায়ের মূল্য (ফেইসভ্যালু) অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কাছ থেকে একশো টাকা উসুল করবে।

মৌলিকভাবে এগুলোর সবই সুদি 'বন্ড'। কারণ, ঋণের গ্রহীতা (রাষ্ট্র) ঋণের সঙ্গে আরও বেশি অর্থ দিতে বাধ্য থাকে। কাজেই এমন 'বন্ডের' লেনদেন হারাম হওয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। কেননা, সেটি হারাম সুদি লেনদেন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তবে আমরা যদি এ কথা ধরে নিই যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সুদ দেওয়ার শর্ত ছাড়া শরয়ি ঋণের ভিত্তিতে এমন 'বন্ড' ইস্যু করা হয়েছে, তাহলে কি তা বিক্রয় করা জায়েজ হবে? এমন ক্ষেত্রে এখানেও সে মতানৈক্য সামনে আসবে, যা ইতোপূর্বে ঋণ বিক্রয় জায়েজের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেটি এই যে, হানাফি, হাম্বালি ও জাহেরিদের মতামত অনুযায়ী শর্তহীনভাবে এমন ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নেই। একইভাবে শাফিয়িদের মাজহাব অনুযায়ীও এমন ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নেই। আর সেটি এ কারণে যে, অধিকাংশ শাফিয়ি ফকিহ, ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে হানাফি ও হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণের সঙ্গে একমত। অথবা এ কারণে যে, এমন ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শাফিয়ি মাজহাবের ফকিহগণ এ শর্ত দিয়েছেন যে, চুক্তির মজলিসেই ঋণকে কবজা করতে হবে। যেমনটি আগে উল্লেখ করেছি। আর এটি এমন এক শর্ত যে, 'বন্ড' ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সেটি পাওয়া অসম্ভব। কাজেই তাদের কাছে এমন 'বন্ড' বিক্রয় জায়েজ নেই।

হ্যাঁ, তবে এমন বিক্রয় সেসব আলেমের কাছে জায়েজ আছে, যারা চুক্তির মজলিসে ঋণ কবজা করার শর্ত আরোপ করেননি। সুতরাং কোনো বস্তুর বিনিময়ে

যদি এমন 'বন্ড' বিক্রয় করা হয়, যেমন : কাপড়, শস্য বা নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা হলে সেসব আলেমের অভিমত অনুযায়ী এমন বিক্রয় জায়েজ হবে। তবে যদি নগদ অর্থের বিনিময়ে এমন 'বন্ড' বিক্রয় করা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে শাফিয়ি মাজহাবের আলেমদের থেকে আমি কোনো স্পষ্ট মতামত জানতে পারিনি। কিন্তু তাদের মতানুযায়ী বায়উস সরফের (অর্থের বিনিময়ে অর্থ বিক্রয় করা) ওপর কেয়াস করলে এমন বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে। কেননা, অর্থের বিনিময়ে অর্থ বিক্রয় করলে সেটি বায়উস সরফ হবে। আর বায়ে সরফে চুক্তির মজলিসেই উভয় দিক (পণ্য ও তার মূল্য) কবজা করা শর্ত। এখন আমরা যদি নগদ মূল্যে সেগুলো বিক্রয় করা বৈধ বলি তাহলে কেমন যেন আমরা অর্থের বিনিময়ে অর্থ বাকিতে বিক্রয় করাকে বৈধ করলাম। অথচ তা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মজলিসেই কবজা করা। 'ট্রেজারি বন্ডের' ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিসেই কবজা করা অসম্ভব। বিধায় এমন লেনদেন জায়েজ হবে না।

আর মালিকি মাজহাবে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার জন্য তাদের কাছে সেসব শর্ত রয়েছে, যা তাদের মাজহাবের তাহকিকে আমরা উল্লেখ করেছি। সে শর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি শর্ত এই যে, ঋণকে তার সমজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করা হলে, ঋণ ও তার বিনিময়ের মাঝে সমান সমান হওয়া শর্ত। সুতরাং 'বন্ডের' মূল্য যদি একশো রুপি হয়, তাহলে সেটিকে একশো থেকে বেশি বা কমে বিক্রয় করা জায়েজ নেই। প্রকাশ থাকে যে, এটি এমন এক শর্ত, যার ওপর আমল করলে পুঁজিবাজারে লেনদেনের উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। মোটকথা এই যে, পুঁজিবাজারে 'বন্ডের' যে ক্রয়-বিক্রয় হয়, শরয়ি দৃষ্টিতে তা হারাম। অচিরেই এ প্রবন্ধের শেষে তার শরয়ি বিকল্পের ওপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

২. বিল অব এক্সচেঞ্জ

বর্তমানে পুঁজিবাজারে প্রচলিত আর্থিক ঋণপত্রের আরেকটি প্রকারকে 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রমাণপত্র, যা ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লিখিতভাবে দেওয়া হয়। যার মধ্যে ক্রেতার পক্ষ থেকে এ কথার স্বীকারোক্তি থাকে যে, তার ওপর পণ্যের মূল্য ঋণস্বরূপ রয়েছে এবং সামনের নির্ধারিত তারিখে সে এর মূল্য পরিশোধে বাধ্য

থাকবে। 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' বাহক (বিক্রেতা) অনেক সময় নির্ধারিত তারিখ আসার আগেই 'বিলে' উল্লিখিত অর্থ পেতে চায়। ফলে সে সেই বিলকে নগদে পরিণত করার জন্য নির্ধারিত তারিখের অপেক্ষা করে না। বরং পণ্যের বিক্রেতা সে 'বিল'কে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে সেখানে থাকা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করে দেয়। এমন লেনদেন করাকে 'ডিসকাউন্টিং অব দা বিল' বলা হয়। পুঁজিবাজারের নিয়ম হলো, 'বিলে' থাকা মূল্য ও তা উসুলের নির্ধারিত তারিখের হিসেবে ডিসকাউন্টের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বিলকে নগদে পরিণত করার সময় যদি দীর্ঘ হয়, তাহলে ডিসকাউন্টের পরিমাণ বেশি হয়। আর যদি সেটি নগদে পরিণত করার সময় কম হয় অর্থাৎ কাছে হয়, তাহলে ডিসকাউন্টের পরিমাণও কম করা হয়।

সমকালীন অধিকাংশ আলেম ডিসকাউন্টিং অব বিলের মাসআলাকে ঋণকে তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয়ের মাসআলার মতো বলেছেন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ডিসকাউন্টকে তারা হারাম বলেছেন।

ফকিহগণ বিল অব এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এক ধরনের আর্থিক প্রমাণপত্রের আলোচনা করেছেন। যাকে 'জামেকিয়া'[৫৬] বলা হয়। এ আর্থিক প্রমাণপত্র রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বা ওয়াকফের দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির জন্য ইস্যু করা হয়, যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা ওয়াক্ফ হতে কোনো আর্থিক অধিকার পাবে। 'দুররুল মুখতার' কিতাবে হাসকাফি রহ. এ মাসআলাটিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন—

وأفتى المصنف أي صاحب تنوير الأبصار ببطلان بيع الجامكية، لما في الاشباه: بيع الدين إنما يجوز من المديون.

'মুসান্নিফ রহ. অর্থাৎ, তানবিরুল আবসারের লেখক জামেকিয়ার বিক্রয় বাতিল হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। এ কারণে যে, আশবাহ কিতাবে আছে; শুধু ঋণীর কাছেই ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ আছে।[৫৭]

ইবনু আবিদিন রহ. তার ব্যাখ্যায় বলেন—

وعبارة المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية : وهو أن يكون

---

[৫৬]

[৫৭] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১৮। মাতলাবুন ফিল জামেকিয়া।

لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل : بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا ، أنقص من حقه في الجامكية فيقول له : بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال : مولانا في فوائده : وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه.

'মুসান্নিফ রহ. বক্তব্য এ ফতোয়ায় এমন, জামেকিয়া বিক্রয়ের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের পক্ষ থেকে কারও নামে কোনো আর্থিক প্রমাণপত্র জারি করা হলো। আর্থিক প্রমাণপত্রকে নগদে রূপান্তরিত করার সময়ের আগে তার নগদ টাকার প্রয়োজন পড়লো। এমন সময় একজন তাকে বললো, আর্থিক প্রমাণপত্র যার মূল্য এত, এটিকে এত মূল্যে আমার কাছে বিক্রয় করে দিন। তার প্রস্তাবিত মূল্যটি আর্থিক প্রমাণপত্রে থাকা মূল্য থেকে কম। তার প্রস্তাবের উত্তরে জামেকিয়ার বাহক তাকে বললো, এ আর্থিক প্রমাণপত্রটি আপনার কাছে বিক্রয় করে দিলাম। উল্লিখিত লেনদেনটি সহিহ হয়েছে কি না? কেননা, এখানে ঋণকে টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়েছে। তিনি এই উত্তর দিলেন যে, ঋণকে যদি ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করা হয়। যেমনটি উল্লিখিত অবস্থায় হয়েছে, তাহলে সে লেনদেন সহিহ হবে না। মাওলানা রহ. ফাওয়ায়েদ কিতাবে বলেন, ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। যদিও না কি সেটি ঋণীর কাছে বিক্রয় করা হয় কিংবা তাকে দান করা হয়।[৫৮]

ইমাম বুহুতি রহ. 'কাশশাফুল কিনা' কিতাবে বলেন—

(ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه) لان العطاء مغيب. فيكون من بيع الغرر. (وهو) أي العطاء (قسطه في الديوان. ولا) يصح (بيع رقعة به) أي العطاء. لان المقصود بيع العطاء. لا هي

'কবজা করার আগে ভাতা বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কেননা, কবজা করা পর্যন্ত ভাতা অনুপস্থিত। আর অনুপস্থিত বস্তুর বিক্রয় 'প্রতারণার বিক্রয়ের ন্যায়'। কেননা, ভাতা পত্রটি রেজিস্টারে রয়েছে। আর তার

[৫৮] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১৮। মাতলাবুন ফিল জামেকিয়া।

টোকেনও বিক্রয় করা জায়েজ নেই। উদ্দেশ্য হলো ভাতা বিক্রয় করা, টোকেন আসল উদ্দেশ্য নয়।'[৫৯]

হানাফি ও হাম্বালিদের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে উল্লিখিত তাহকিক করা হয়েছে। কারণ, ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়কে তারা শর্তহীনভাবে নাজায়েজ বলেন। এটির ওপর ভিত্তি করে হানাফি ও হাম্বালিদের কাছে 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' বিক্রয়ের হুকুম স্পষ্ট হলো। আর সেটি এই যে, তাদের কাছে এমন লেনদেন একেবারেই নাজায়েজ। যদিও তার মূল্যটি বিল অব এক্সচেঞ্জে লিখিত মূল্যের সমান হয়। কেননা, এটি হলো ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এমন লেনদেন জায়েজ নেই। যেভাবে জামেকিয়া বিক্রয় করা জায়েজ নেই।

মালিকি মাজহাবে যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়কে তারা সেসব শর্তের সঙ্গে জায়েজ বলেছেন, যেগুলো আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তাদের বক্তব্যের ওপর কেয়াস করে যা বোঝা যায় তা হলো, তাদের কাছে জামেকিয়া বিক্রয় করা জায়েজ আছে। হাত্তাব রহ. এ কথাকে স্পষ্ট করে বলেন—

بخلاف الجامكية؛ فإن الملك محصل فيها لمن حصل له شرط الواقف، فلا جرم صح أخذ العوض بها وعنها.

'জামেকিয়ার বিষয়টি ব্যতিক্রম। সেটি বিক্রয়ের মাধ্যমে সে ব্যক্তি মালিক হতে পারবে, যার ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারীর শর্ত পাওয়া যাবে। সুতরাং এ কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে, তার বিনিময়ে কোনো জিনিস গ্রহণ করা বা কোনো জিনিসের বিনিময়ে সেটি দেওয়া উভয়টি জায়েজ আছে।'[৬০]

কিন্তু এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, মালিকিদের কাছে জামেকিয়ার বিক্রয় বৈধ হওয়া এ শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত যে, সেটিকে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করতে হবে। সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে হলে সেখানে সমান সমান হওয়া আবশ্যক। যেমনটি ইমাম দুসুকি রহ.-এর বক্তব্যে স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে।

---

[৫৯] কাশশাফুল কনা, বুহুতি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫৬।

[৬০] মাওয়াহিবুল জালিল, হাত্তাব রহ., খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৪।

এ বিষয়ে শাফিয়ি মাজহাবের মুতাআখখিরিন আলেমগণ বলেছেন, জামেকিয়ার মালিকের জন্য অন্যের কাছে সেটি হস্তান্তর করা এবং এর বিনিময়ে অন্যের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েজ। শাবরামাল্লুসি রহ. ওজিফা থেকে সরে যাওয়া জায়েজের কথা উল্লেখ করার পর বলেন—

ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأى المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره.

'সেগুলোর মধ্য থেকে জামেকিয়া রয়েছে যা ওয়াকফের খরচাদির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যার এই সম্পত্তির মধ্যে কোনো অধিকার রয়েছে আর তার এই অধিকার ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তি নেই যা তার প্রয়োজন পুরা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার জন্য বিনিময় নিয়ে উল্লিখিত ওজিফা থেকে সরে যাওয়া জায়েজ আছে। এখন যার জন্য সে নিজের অধিকার রহিত করেছে তাকে বহাল রাখার বিষয়টি অর্পিত হবে তার ওপর যার এ ধরনের কাজে নিয়োগ দেওয়ার বা বহাল রাখার অধিকার আছে। যেমন : পাশা। সুতরাং সে ব্যক্তি বা অন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে যার কল্যাণ মনে করবে তাকে নিয়োগ দেবে।

কিন্তু উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে শিবরামলিসি রহ.-এর 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া বা নির্ধারিত বকেয়া বেতন অন্যের কাছে হস্তান্তরের অনুমতি দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উদ্দেশ্য এই যে, কেউ যদি প্রতি মাসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নির্দিষ্ট কোনো ভাতা পায়। তার জন্য জায়েজ আছে যে, সে তার ভাতা থেকে সবসময়ের জন্য সরে যাবে। সেইসঙ্গে যার জন্য সরে গেছে তার থেকে বিনিময় গ্রহণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি—যার জন্য প্রথম ব্যক্তি সরে গেলো—এই প্রথম ব্যক্তি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাতার অধিকারী হবে না। বরং সেখান থেকে প্রথম ব্যক্তির সরে যাওয়ার উপকারিতা এই যে, ভাতার জন্য প্রথম ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতা শেষ হবে। এরপর এই বিষয়ে যার কাছে ভাতা দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে তার স্বাধীনতা থাকবে। সে যদি ভালো মনে করে, তাহলে যার জন্য প্রথম ব্যক্তি সরে গেলো, তার স্থানে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ

দেবে। ফলে সে ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবে। আর দায়িত্বশীল যদি মনে করে, তাহলে তার স্থানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে ভাতার জন্য নির্ধারণ করতে পারে। শাফিয়ি মাজহাবের আলেমদের মতে ভাতার অধিকার হস্তান্তরের বিধান এমন। এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত বের হলো যে, শিবরামলিসি রহ. যা আলোচনা করেছেন, সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, সেখানে কোনো ঋণপত্র বিক্রয় করা হচ্ছে না। অথবা কোনো অধিকারকে এমন কারও কাছে বিক্রয় করা হচ্ছে না যে, সে আগের ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভাতা চাওয়ার অধিকারী হবে।

ঋণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শাফিয়ি মাজহাবের আলেমদের বক্তব্যের দাবি হলো, চুক্তির মজলিসে উভয় বিনিময় করা ছাড়া 'বিল অব এক্সচেঞ্জ ও জামেকিয়া' বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। আমরা যদি শাফিয়ি মাজহাবের ওইসব সংখ্যালঘু আলেমদের বক্তব্যও গ্রহণ করি, যারা এই শর্তারোপ করেননি। তারপরও তাদের মত অনুযায়ী 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' মূল্য তার গায়ের মূল্যের সমান হওয়া শর্ত। তার গায়ের মূল্য থেকে কমে সেটিকে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। তবে কোনো পণ্যের বিনিময়ে হলে সেটি জায়েজ আছে।

'বিল অব এক্সচেঞ্জ' বিক্রয়ের হুকুমের সারকথা

উপরে আমরা যে বিস্তারিত আলোচনা করলাম তার সারাংশ হলো, হানাফি ও হাম্বালিদের কাছে 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' বিক্রয় করা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই। এমনকি সমমূল্যে বিক্রয় করলেও সেটি জায়েজ হবে না। একইভাবে শাফিয়ি মাজহাবের যেসব আলেম চুক্তির মজলিসে পণ্য ও মূল্য উভয়টি কবজা করাকে শর্ত বলেছেন, তাদের কাছেও এ বিক্রয় জায়েজ নেই। অবশ্য যারা চুক্তির মজলিসেই উভয় বিনিময় কবজা করাকে শর্ত বলেননি, তাদের কাছে এই শর্তের সঙ্গে 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' বিক্রয় করা জায়েজ আছে যে, মূল্যটি 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' মূল্যের সমান হতে হবে। মালিকি মাজহাবের আলেমদেরও একই ধরনের অভিমত রয়েছে।

এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, কোনো স্বীকৃত মাজহাবে 'ডিসকাউন্টিং অব বিল' জায়েজ নেই। কেননা, সেখানে নগদ অর্থকে বাকিতে কম অর্থে বিক্রয় করা হয়। আর এটিকেই সুদ বলা হয়। ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি তাদের সপ্তম সেমিনারে

এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সেখানে এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করা হয়—

إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم

'শরয়ি দৃষ্টিতে বাজারে প্রচলিত আর্থিক প্রমাণপত্রে ডিসকাউন্ট করা জায়েজ নেই। কেননা, সেটি রিবান নাসিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যা স্পষ্ট হারাম।'[৬১]

মালয়েশিয়ার কিছু আলেমের অবস্থান

মালয়েশিয়ার কিছু ভাই ঋণ বিক্রয় জায়েজের ফতোয়া দিয়েছেন। তার ওপর ভিত্তি করে 'বিল অব এক্সচেঞ্জে'-এর ডিসকাউন্টকেও জায়েজ বলেছেন। মালয়েশিয়ার অর্থ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে আমার আলোচনার আয়োজন করে। কুয়ালালামপুরে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। যে কারণে সে ফতোয়ার পক্ষে দেওয়া তাদের দলিলগুলো আমার সামনে স্পষ্ট হয়। যা দেখে জানা যায় যে, ফতোয়াটিতে তারা নিচের দলিলসমূহের ওপর আস্থা রেখেছেন।

ক. তারা ঋণ এবং ওই ঋণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, যা কোনো কিছু ক্রয় করার কারণে অন্যের দায়িত্বে আবশ্যক হয়। সুতরাং তাদের দাবি হলো, ঋণের ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নেই। কিন্তু বাকিতে পণ্য ক্রয়ের কারণে যে ঋণ আবশ্যক হয়, সে ঋণের সম্পর্ক পণ্যের সঙ্গে। সুতরাং পণ্যের বিক্রয়ের কারণে যে ঋণ সৃষ্টি হয়েছে এমন ঋণের প্রমাণপত্র স্বাভাবিক অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং সেটি সে অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিক্রীত পণ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং এমন ঋণপত্র বিক্রয়ের অর্থ হলো, সে ঋণকে বিক্রয় করা, যা পণ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়। বিষয়টি এমন যেন সে পণ্যই বিক্রয় করছে। উল্লিখিত হজরতদের প্রতি যথার্থ সম্মান রেখেই বলছি, তাদের পেশকৃত দলিলগুলো খুবই দুর্বল। (নিচে এর কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।)

১. বিক্রয় চুক্তির একটি আবশ্যকীয় ফলাফল এই যে, বিক্রীত পণ্যের মালিকানা বিক্রেতা থেকে ক্রেতার কাছে চলে যাবে। উভয় পক্ষ থেকে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যটি ক্রেতার মালিকাধীন হয়ে

[৬১] মাজাল্লাতু মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি, সিদ্ধান্ত নং ৭/২/৬৬, ফেকরা : ৩। সংখ্যা : ৭।

যায়। আর বিক্রেতা শুধু সে মূল্যের দাবি করতে পারে, যা ক্রেতার দায়িত্বে আবশ্যক হয়েছে। এ মূল্যটিই হলো সেই ঋণ, যা 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ঋণ। ক্রেতার দায়িত্বে পণ্যের মূল্য আবশ্যক হওয়ার পর ঋণ হিসেবে নেওয়া অর্থ আর কোনো পণ্য ক্রয়ের কারণে দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়া ঋণের মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য থাকে না। সেইসঙ্গে উল্লিখিত অর্থ এমনভাবে পণ্যের স্থলাভিষিক্তও হয় না যে, তাকে পণ্যের স্থানে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব। বরং সেটি বিক্রীত পণ্যের বিনিময়। যার বিক্রয়টি এমন নিশ্চিতভাবে সম্পাদিত হয়েছে যে, এখন সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। সুতরাং এটিও সম্ভব নয় যে, সেই অর্থের ওপর পণ্যের বিধান প্রয়োগ করা হবে। যদি তাই হতো তাহলে মানুষ পণ্যের বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জন করে, সেসব অর্থকে পণ্যের স্থলাভিষিক্ত ধরে নিয়ে সেখানে কমবেশিতে লেনদেন করা জায়েজ হওয়া উচিত হতো। অথচ এমন কমবেশির লেনদেন শরিয়তে স্পষ্ট নিষিদ্ধ।

২. এমন দাবি করা যে, 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ডিসকাউন্ট মূলত এমন পণ্যের বিক্রয়, যা তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এ বক্তব্য একটি পণ্যকে ভিন্ন দু-আঙ্গিকে দুবার বিক্রয় হওয়াকে আবশ্যক করে। কেননা, সে পণ্যের একটি বিক্রয় তো 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' ইস্যুকারীর পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে সেই পণ্যের মালিকানা তার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' বাহক সেটিকেই অন্যের কাছে কীভাবে বিক্রয় করবে? অথচ 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' বাহক নিজেই তার মালিক নয়। আবার দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিও সেই লেনদেনের কোনো এক পর্যায়েও পণ্যটি অর্জন করতে সক্ষম হবে না। (কেননা, তা তো আগের ক্রেতার মালিকাধীন রয়েছে)

৩. তাদের পেশকৃত উল্লিখিত দলিল হাদিসের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। সেটি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর হাদিস—

كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ

بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ.

'আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, 'বাকি' নামক জায়গায় আমি উট বিক্রয় করতাম। আমি দিনারের বিনিময়ে উট বিক্রয় করতাম এবং তার স্থানে দিরহাম উসুল করতাম। আবার কখনো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিনার উসুল করতাম। অর্থাৎ, দিনারের পরিবর্তে দিরহাম। আর দিরহামের পরিবর্তে দিনার উসুল করতাম। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তিনি তখন হাফসা রা.-এর ঘরে ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি একটি বিষয় জানতে চাই। সেটি এই যে, বাকি-নামক জায়গায় আমি উট বিক্রয় করি, কখনো দিনারের বিনিময়ে উট বিক্রয় করি এবং তার পরিবর্তে দিরহাম উসুল করি আবার কখনো দিরহামের বিনিময়ে উট বিক্রয় করে তার পরিবর্তে দিনার উসুল করি, এটির স্থানে ওটি নিই এবং ওটির স্থানে এটি দিই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি সে দিনের বাজার-মূল্যে সেটি গ্রহণ করো এবং তোমরা উভয়ে মজলিস ত্যাগের আগে তোমাদের মধ্যে কোনো কিছু বাকি না থাকে, তাহলে এমনটি করায় কোনো ক্ষতি নেই।[৬২]

হাদিসটি এ কথা প্রমাণ করে যে, যদি কোনো কারেন্সির বিক্রয় করা হয় এবং উভয় লেনদেনকারী এক কারেন্সিকে অন্য কারেন্সির বিনিময়ে লেনদেন করতে চায়, তাহলে দুটি শর্তের ভিত্তিতে তাদের এমন লেনদেন জায়েজ হবে। একটি হলো, যেদিন লেনদেন করা হবে, সেদিনের বাজারমূল্য অনুযায়ী লেনদেন হতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো,

[৬২] সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : বুয়ু, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫, হাদিস : ৩৩৫৪। সুনানে তিরিমিজি, অধ্যায় : বুয়ু, পরিচ্ছেদ : বাইউস সরফ, হাদিস : ১২৪২। সুনানে নাসায়ি, অধ্যায় : বুয়ু, পরিচ্ছেদ : স্বর্ণের বিনিময়ে রুপা এবং রুপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা। সুনানে ইবনু মাজাহ, অধ্যায় : বুয়ু, পরিচ্ছেদ : ইকতিজাউজ জাহাবি মিনাল ওরিক, হাদিস : ২২৬২। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

চুক্তির মজলিসেই উভয় কারেন্সির হস্তান্তর সম্পন্ন হতে হবে। ক্রেতার দায়িত্বে কোনো কিছু বাকি থাকতে পারবে না।

এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, উল্লিখিত লেনদেনে বিক্রীত পণ্য হলো উট। আর সেটি ক্রয়ের কারণে ক্রেতার দায়িত্বে দিরহাম ওয়াজিব হয়েছে। বিষয়টি এমন যেন সেই দিরহামগুলো ক্রেতার দায়িত্বে ঋণ হয়ে গেছে। এখন ক্রেতা চাইছে যে, সে সেই দিরহামের ঋণকে দিনারে পরিবর্তন করবে। এমনটি করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শর্ত তো এই দিয়েছেন যে, সেটি ওই দিনের বাজার-মূল্যে হতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত এই আরোপ করেছেন যে, ক্রেতার দায়িত্বে কোনো কিছু বাকি থাকতে পারবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শর্ত দুটি এ কারণে আরোপ করেছেন যে, তিনি এমন লেনদেনকে 'বায়ে সরফ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং 'বায়ে সরফ' জায়েজের জন্য যা শর্ত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই আরোপ করেছেন। যদিও এখানে বিক্রয় উটের হয়েছিলো। যদি তা পণ্যদ্রব্যের স্থলাভিষিক্ত হতো, যেমনটি মালয়েশিয়ার কয়েকজন আলেম বলেন, তাহলে এ লেনদেন সে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের সঙ্গে হতো। তখন সেটি জায়েজের জন্য সে শর্ত আরোপ করা হতো না, যা 'বায়ে সরফ' জায়েজ হওয়ার জন্য আরোপ করা হয়।

এখানে আরও একটি বিষয় দেখা উচিত যে, উল্লিখিত লেনদেনটি শুধু ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে হয়েছে। তাদের মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কোনো হস্তক্ষেপ ছিলো না। তাই এখানে তো এটি একটি সহজ পদ্ধতি ছিলো যে, তাদের মধ্যকার আগের লেনদেনটি (যা দিরহামের বিনিময়ে হয়েছিলো) বাতিল বলে দেবেন। আর ভিন্ন আঙ্গিকে দিনারের মাধ্যমে দ্বিতীয় একটি নতুন চুক্তি করে নেবেন। আর এ জন্য উসুল করার দিনের বাজার-মূল্যের শর্তটিও আরোপ করার প্রয়োজন পড়তো না। একইভাবে চুক্তির মজলিসে উভয়টি কবজা করার শর্তেরও কোনো দরকার ছিলো না। কিন্তু (সেটি না করে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে 'বায়ে সরফ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেন সুদের সন্দেহও দূর হয়ে যায়। একইভাবে এই লেনদেনে এমন ব্যক্তির সঙ্গেই ঋণের বিক্রয় হচ্ছে, যার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে। তারপরও বিনিময়ের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় দিক সমান

হওয়ার শর্ত করেছেন। সুতরাং যে ক্ষেত্রে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণের বিক্রয় হবে, সেখানে তো আরও জোরালোভাবে সেই শর্তটি আরোপ করা উচিত। কেননা, তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ অনুপ্রবেশের কারণে উল্লিখিত লেনদেন দ্বারা 'পরিবর্তন' এবং আগের চুক্তিকে বাতিল করণ কিংবা নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার—সব ধরনের সম্ভাবনাকেই দূর করে দেয়।

খ. সেসব আলেমের অনেকে মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন যে, মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের অনেকে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করাকে জায়েজ বলেছেন। তারা মূলত 'ঋণ বিক্রয়' এই বাক্যের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন যে, যখন ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ আছে (আর বিক্রয় বলতে এ কথা বোঝায় যে, উভয় পক্ষ যে মূল্যের ওপর একমত হবে, সে মূল্যে বিক্রয় জায়েজ আছে।) তখন ঋণকে ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ যদি কম মূল্যে রাজি হয়, তাহলে তার বিক্রয়ও জায়েজ হবে।

তাদের এই দলিলটি আগের দলিল থেকে আরও বেশি দুর্বল। তা এ কারণে যে, কোনো জিনিসের বিক্রয় জায়েজ বলা হলে তার সঙ্গে সেসব আবশ্যকীয় শর্তাবলীও সংযুক্ত হয়, যেগুলোকে সেটি বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন বলি যে, স্বর্ণ বিক্রয় করা জায়েজ আছে। তখন তার অর্থ এই নয় যে, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, স্বর্ণ বিক্রয়ের জন্য শরিয়ত যেসব শর্ত আরোপ করেছে, সেগুলো পালন করার শর্তে স্বর্ণ বিক্রয় করা জায়েজ আছে। সুতরাং স্বর্ণ বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার জন্য এটি একটি শর্ত যে, যদি স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়, তাহলে সেখানে কমবেশি করা জায়েজ নেই।

মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের ফকিহগণ যখন ঋণ বিক্রয় করা জায়েজের কথা বলেছেন, তখন তার উদ্দেশ্য এই যে, সেটি জায়েজের জন্য যত শর্ত রয়েছে সব শর্তের সঙ্গে তার বিক্রয় জায়েজ আছে। আর সেসব শর্তের মধ্যে একটি শর্ত এই যে, সেখানে কমবেশি করা জায়েজ নেই। মালিকি মাজহাবের আলেমগণ তো এটি স্পষ্টভাষায় বলেছেন। যা আগে তাদের মাজহাবের বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শাফিয়ি মাজহাবের বিষয়টি

হলো, এ ক্ষেত্রে তারা ঋণকে ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করার বিষয়টি সামনে এনেছেন। তারা এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, 'ঋণী থেকে প্রাপ্য দিরহামের বিনিময়ে দাস ক্রয় করা।' আর এ কারণে তারা সেখানে সমান হওয়ার শর্তটি আরোপ করেননি। কিন্তু ঋণ যদি সুদি বস্তু হয় এবং তার বিক্রয়ও হয় সমজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে, তাহলে সমান হওয়ার শর্তটি থাকা স্পষ্ট কথা। আর তারা ইসতিবদালের মাসআলায় উল্লেখ করেছেন যে, সুদি জিনিসের মধ্যেই যদি বিনিময় করা হয়, তাহলে চুক্তির মজলিসেই উভয় বিনিময় কবজা করা উল্লিখিত লেনদেন জায়েজ হওয়ার শর্ত।[৬৩] এখান থেকে স্পষ্ট হলো যে, সুদি জিনিসের বিনিময়ের ক্ষেত্রে শাফিয়ি মাজহাবের আলেমগণও সেসব শর্তকে আবশ্যক করেছেন, যেগুলো সুদি জিনিস বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার জন্য জরুরি।

গ. কখনো কখনো তাদের অনেকে ضع وتعجل 'দা ও তাআজ্জালের'—ডিসকাউন্ট করে নগদে আদায় করো—বিষয়টি জায়েজ হওয়ার মাধ্যমে দলিল দিয়ে থাকেন। যেটিকে 'বনু নজিরের' ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলেমগণ জায়েজ বলেছেন। যখন বনু নজির গোত্রকে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো, তখন মদিনাবাসীর ওপর তাদের কিছু ঋণ ছিলো। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— 'ضعوا وتعجلوا' 'ঋণকে কমাও এবং দ্রুত আদায় করো।' এ কথার ওপর ভিত্তি করে তারা মদিনাবাসী থেকে ঋণ দ্রুত উসুল করে নেয়।[৬৪]

প্রকৃত বিষয় হলো, অধিকাংশ ফকিহ ضع وتعجل 'দা ও তাআজ্জাল'-কে নাজায়েজ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা., জায়েদ ইবনু সাবেত রা., মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রহ., হাসান বসরি রহ., ইবনু মুসাইয়িব রহ., হাকাম ইবনু উতবাহ রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ.-সহ এটিই চার ইমামের মতামত।[৬৫]

---

[৬৩] আল-মাজমু শরহু মুহাজ্জাব, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৯৯।

[৬৪] সুনানে কুবরা, ইমাম বাইহাকি রহ. অধ্যায় : বুয়ু, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৮। এ মাসআলার ওপর বিস্তারিত আলোচনা এবং ফকিহদের মাজহাব ও তাদের দলিলসমূহ ফিকহি মাকালাতের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৬৫] মুয়াত্তা ইমাম মালেক রহ. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬০৬। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৭১-৭২। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩২। আল-মুগনি, হজরত

তারা বনু নজিরের ঘটনা কেন্দ্রিক এ বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন। অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., ইবরাহিম নাখায়ি রহ., জুফার ইবনু হুজায়েল রহ. ও আবু সাওর রহ. থেকে এমন বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। ইবনু তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কইয়িম রহ. এ অভিমতকে গ্রহণ করেছেন।[৬৬] কিন্তু যারা এমন বিক্রয় করাকে জায়েজ বলেছেন, তারা এমন ক্ষেত্রে জায়েজ বলেছেন, যেখানে বিক্রয়-চুক্তিটি হবে ঋণদাতা ও ঋণীর মধ্যে। সেখানে যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে কোনো ফকিহই সেটা জায়েজ বলেননি। সুতরাং 'বিল অব এক্সচেঞ্জকে' ضع وتعجل 'দা ও তাআজ্জালের' মাসআলার ওপর কেয়াস করা যাবে না। কেননা, ঋণদাতা ঋণের মালিক হওয়ায়, তার অধিকার রয়েছে যে, ইচ্ছে হলে তার ঋণ সে কমাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নগদে সে ঋণ কিনে নিলো সে যেন ঋণীর দায়িত্বে থাকা অর্থকে কিনে নিলো। সুতরাং সেটি অর্থের বিনিময়ে অর্থের বিক্রয় হলো। আর অর্থের বিনিময়ে অর্থের বিক্রয় হলে সেখানে কমবেশি করা নাজায়েজ।

এ মাসআলার ব্যাপারে ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি তার সপ্তম অধিবেশনে নিচের সিদ্ধান্তগুলোর ওপর একমত হয়ে তা অনুমোদন করে। যা নিচে উল্লেখ করা হলো—

الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المديون (ضع و تعجيل) جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمديون ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم الأوراق التجارية.

'বাকি ঋণকে দ্রুত উসুল করার লক্ষ্যে কিছু কমিয়ে দেওয়া শরয়ি দৃষ্টিতে জায়েজ। চাই সেটি ঋণদাতা বা ঋণীর আবেদনের ভিত্তিতে হোক না কেন। এটি হারাম সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তার জন্য শর্ত হলো, কোনো পূর্ব চুক্তির ভিত্তিতে এমন কমানো যাবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এ লেনদেনটি ঋণদাতা ও ঋণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ

ইবনু কুদামা রহ., খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭৪-১৭৫।

[৬৬] কানজুল উম্মাল, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৫। ইলাউস সুনান, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৭১।

সেটি জায়েজ থাকবে। কিন্তু সে লেনদেনে যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে এটি নাজায়েজ হয়ে যাবে। কেননা, তখন এ লেনদেনটি ব্যাবসায়িক প্রমাণপত্রের লেনদেনের মতো হয়ে যাবে।'[৬৭]

হাওয়ালার ভিত্তিতে 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ডিসকাউন্টের বিধান

এতক্ষণ আমরা 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ডিসকাউন্টের হুকুম বর্ণনা করলাম। তা ছিলো ঋণ বিক্রয়ের হুকুমের ভিত্তিতে। তবে আমার মতামত অনুযায়ী 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ডিসকাউন্ট বাস্তবে কোনো বিক্রয় নয়। বরং তা হলো ঋণ দেওয়া এবং তা হাওয়ালা করার বিষয়। যে ব্যক্তি 'বিল অব এক্সচেঞ্জে' ডিসকাউন্ট করে প্রকৃত অর্থে সে 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' বাহককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয়। এরপর 'বিলের বাহক' অর্থাৎ, ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতাকে 'বিল' ইস্যুকারীর কাছে হাওয়ালা করে দেয়। এ লেনদেনটি হাওয়ালা হওয়ার কারণ হলো, অধিকাংশ দেশের আইনে এ কথা উল্লেখ আছে—যদি ঋণ আদায় না হয়, তাহলে ডিসকাউন্টদাতা তার দায়ভার বহন করবে না। বরং 'বিল ইস্যুকারী' থেকে যদি সেটি উসুল করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে 'বিল' বাহকের কাছেও দাবি করতে পারবে। আর (হানাফি মাজহাব অনুযায়ী) এটিই হলো হাওয়ালার বাস্তবতা।

মোটকথা, এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ডিসকাউন্টকারী বিলের বাহককে যে অর্থ দিচ্ছে তার বাস্তবতা হলো, সে এ শর্তে তাকে ঋণ দিয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা তার প্রদেয় ঋণ থেকে বেশির জন্য তার ঋণীর কাছে ঋণদাতাকে হাওয়ালা করে দিচ্ছে। যা স্পষ্ট সুদ। কেননা, হাওয়ালা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উভয় পক্ষের ঋণের পরিমাণ সমান হওয়া। অথচ এখানে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ঋণদাতা পরবর্তী সময়ে তার ঋণ থেকে বেশি ঋণ উসুল করবে। আর এই বেশি অংশটি সময়ের বিনিময়ে হয়েছে। যা রিবান নাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

[৬৭] মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সিদ্ধান্ত নং ৭/২/৬৬, সপ্তম সংখ্যা ২/২১৭।

ঋণ বিক্রয়ের বিকল্প পদ্ধতি

আগের আলোচনা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, এমন সব আর্থিক প্রমাণপত্র যেগুলো ইস্যুকারীর ওপর ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন 'বন্ড' ও 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'—এগুলোর হুকুম হলো, তার গায়ের মূল্যে সেগুলো লেনদেন করা জায়েজ আছে। (কমবেশিতে করা জায়েজ নেই) মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের কিছু আলেমের মতে শর্তসাপেক্ষে সেগুলো বিক্রয় করা জায়েজ, আগে যার আলোচনা করা হয়েছে। তবে হানাফি ও হাম্বালি মাজহাবের আলেমদের মতে বিক্রয়ের পদ্ধতিতে সেগুলোর লেনদেন জায়েজ নেই। অবশ্য সব ফকিহের অভিমত অনুযায়ীই হাওয়ালার পদ্ধতিতে সেগুলোর লেনদেন জায়েজ আছে। যার উদ্দেশ্য এই যে, 'বন্ড হোল্ডার' বা 'বিল হোল্ডার' তৃতীয় কোনো ব্যক্তি থেকে তাতে উল্লেখ থাকা নির্ধারিত অর্থ ঋণ নেবে। এরপর সে তৃতীয় ব্যক্তিকে 'বন্ড' বা 'বিল' ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে হাওয়ালা করে দেবে। সুতরাং তখন উল্লিখিত লেনদেনে হাওয়ালার সব শরয়ি বিধান প্রযোজ্য হবে।

এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, বর্তমানের স্টক এক্সচেঞ্জে এসব আর্থিক প্রমাণপত্রকে তার গায়ের মূল্য বরাবর মূল্যে লেনেদেন করার মাধ্যমে এর আসল উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। সুতরাং এমন কোনো পদ্ধতি আছে কি না, যার ভিত্তিতে আর্থিক প্রমাণ-পত্রসমূহ শরিয়তসম্মতভাবে সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয় করা যাবে? অন্য ভাষায় বললে এভাবে বলা যায় যে, 'বন্ড' এবং বিল অব এক্সচেঞ্জ' লেনদেন করার জন্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য এমন কোনো বিকল্প পদ্ধতি আছে কি না? তার উত্তর হলো, হ্যাঁ, বিকল্প পদ্ধতি আছে। নিচে আমরা সংক্ষেপে সে বিকল্প পদ্ধতিগুলো তুলে ধরছি। মহান আল্লাহ সঠিকতার তাওফিকদাতা।

বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টের বিকল্প পদ্ধতি

'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ডিসকাউন্টের উদ্দেশ্য অর্জনের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে—

এক. 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' ডিসকাউন্ট করার প্রয়োজন পড়ে এমন ব্যবসায়ীর, যে তার পণ্যকে বাকিতে বিক্রয় করেছে এখন মূল্য পরিশোধের সময় আসার আগেই সেটির নগদ মূল্যে উসুল করতে চায়। যেন যাদের থেকে সে ওই পণ্য রপ্তানির জন্য কিনেছে অথবা যাদের মাধ্যমে তা প্রস্তুত করেছে, তাদের মূল্য পরিশোধ করতে পারে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী তাদের লেনদেন সম্পন্ন করে

ডকুমেন্টারি ক্রেডিট পদ্ধতিতে। সুতরাং এমন ব্যবসায়ীরা তাদের বিল নিয়ে ব্যাংকের কাছে যায়। যেন ব্যাংক ডিসকাউন্টের মাধ্যমে সেখানে উল্লেখ থাকা মূল্য থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে বাকি অর্থ তাকে নগদে দিয়ে দেয়।

এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শরয়ি দৃষ্টিতে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতিটি হলো—ব্যবসায়ীগণ রপ্তানি করার আগেই ব্যাংকের সঙ্গে শিরকাতের চুক্তি করবে। বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ীদের কাছে যে অর্ডার আসে তা যেহেতু নির্ধারিত এবং উভয় পক্ষের কাছে মূল্যও নির্দিষ্ট। সেইসঙ্গে পণ্য পাঠনোর মাঝে যে সময় থাকে তা-ও নির্দিষ্ট, কাজেই এসব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যাংকের জন্য উল্লিখিত লেনদেনে শিরকাতের চুক্তি করা কঠিন কিছু হবে না। কারণ এমন লেনদেনে লভ্যাংশের পরিমাণও প্রায় নিশ্চিত। সুতরাং ব্যবসার পার্টনার হিসেবে ব্যবসায়ীকে ব্যাংক কাঙ্ক্ষিত অর্থ দিয়ে দেবে। আর ব্যবসায় যে লাভ হবে, চুক্তি অনুযায়ী সে তার নির্ধারিত অংশ উসুল করবে। এভাবে চুক্তি করার কারণে ওই ব্যবসায়ী ও ব্যাংকের কাজ সহজ হয়ে যাবে। ব্যবসায়ীর জন্য রপ্তানি-পণ্য উৎপাদনে আরোপিত দায় দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব হবে। আর ব্যাংকও লভ্যাংশের একটি অংশ পেয়ে যাবে।

দুই. মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের কিছু আলেমের অভিমত অনুযায়ী 'বিলের' বাহকের কাছে ব্যাংক বাস্তবেই কোনো পণ্য বিক্রয় করবে অথবা (অন্যান্য ইমামদের অভিমত অনুযায়ী অর্থাৎ, হানাফি-হাম্বালিদের অভিমত অনুযায়ী) 'বিলে' যে মূল্যের উল্লেখ আছে, তার সমান মূল্যে কোনো পণ্য বিক্রয় করবে। এরপর বিল ইস্যুকারী থেকে বিলের অর্থ উসুল করার জন্য হাওয়ালার চুক্তি করবে। বিলের বিনিময়ে যেহেতু পণ্য রয়েছে, তাই ব্যাংক কর্তৃক তা বাজার-মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করাতে কোনো সমস্যা নেই। এভাবে ব্যাংকের লভ্যাংশও অর্জন হবে।

তিন. ব্যাংক ও বিলের বাহকের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন দুটি চুক্তি হবে। প্রথম চুক্তি এই হবে যে, বিলের বাহক ব্যাংককে এ মর্মে ওকিল বানাবে যে, সে বিলের অর্থ উসুল করার সময় হলে তার ইস্যুকারী থেকে তা উসুল করবে এবং ওই সেবার জন্য বিলের বাহক ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেবে।

দ্বিতীয় চুক্তিটি এমন হবে—ব্যাংক বিলে নির্ধারিত অর্থ থেকে ওকালতির বিনিময় কেটে নিয়ে বাকি অর্থ ব্যবসায়ী বা এজেন্টকে সুদহীন ঋণ দেবে।

যেমন : জায়েদ বিলের বাহক। বিলে নির্ধারিত অর্থ হলো একলাখ টাকা। এখন জায়েদ ব্যাংককে এ মর্মে তার ওকিল নির্ধারণ করলো যে, অর্থ উসুল করার সময় হলে আমার পক্ষ থেকে বিল ইস্যুকারী থেকে তা উসুল করবে। এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে জায়েদ ব্যাংককে এক হাজার টাকা দেবে। এরপর সম্পূর্ণ ভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক জায়েদকে নিরানব্বই হাজার টাকা সুদহীন ঋণ দেবে। এরপর সময় আসলে বিল ইস্যুকারী থেকে ব্যাংক যখন একলাখ টাকা পেয়ে যাবে, তখন কাটাকাটি হয়ে যাবে। সেটি এভাবে যে, ঋণ হিসেবে ব্যাংক নিরানব্বই হাজার টাকা কেটে নেবে আর বাকি এক হাজার রুপি তার উসুল করার বিনিময়ে নেবে।

অবশ্য উল্লিখিত পদ্ধতি জায়েজ হওয়ার জন্য নিচের তিনটি শর্তের উপস্থিতি জরুরি—

১. উভয় চুক্তি পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে। ঋণের চুক্তিতে ওকালতের চুক্তি শর্ত করা যাবে না এবং ওকালতের চুক্তিতেও ঋণের চুক্তি শর্ত করা যাবে না।

২. ওকালতের বিনিময়টা বিলের অর্থ নগদে পরিণত করার সময়ের সঙ্গে এভাবে সম্পৃক্ত হতে পারবে না যে, বিলের অর্থ নগদে পরিণত করার সময় যদি দীর্ঘ হয়, তাহলে ওকালতের বিনিময় বেড়ে যাবে। আর যদি বিলের অর্থ নগদে পরিণত করার সময় নিকটবর্তী হয়, তাহলে ওকালতের বিনিময় কমে যাবে। (অর্থাৎ, উভয় অবস্থাতেই সমান থাকতে হবে।)

৩. ব্যাংক যে ঋণ দিয়েছে, সে কারণে ওকালতের বিনিময়ের মধ্যে কোনো কিছু বাড়ানো যাবে না। কেননা, তখন তা 'ঋণ উপকার বয়ে আনার' নীতিতে সুদ হয়ে যাবে।

কোম্পানির পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত বন্ডের বিকল্প পদ্ধতি

সাধারণ মানুষ থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ব্যাবসায়িক কোম্পানি যেসব বন্ড ইস্যু করে তার বিকল্প হলো সুকুক।[৬৮]

[৬৮] সুকুক বলা হয় কোনো প্রজেক্ট আন্ডার লাইন অ্যাসেটের ভিত্তিতে শরয়ি কোনো

ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান এসব সুকুক মুদারাবা অথবা মুশারাকার ভিত্তিতে ইস্যু করতে পারে। এসব সুকুকের মাধ্যমে তার বাহক ব্যাবসায়িক কার্যক্রমে শরিক হয়ে যাবে এবং ব্যাবসায়িক কার্যক্রমে যে লাভ হবে, সেখান থেকে চুক্তি অনুযায়ী তাদের মাঝে লভ্যাংশ বণ্টন হবে। এই সুকুকগুলো যেহেতু কোম্পানির সম্পদের মধ্যে যৌথ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে (ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমির ফতোয়া অনুযায়ী কোম্পানির মোট সম্পদের কম পক্ষে ৫১% সম্পদ নগদ টাকায় না হয়ে বস্তু-ভিত্তিক হতে হবে) তাই সেগুলোকে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে যে-কোনো মূল্যে সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেন করা জায়েজ হবে। কেননা, কমবেশিতে সেসব আর্থিক প্রমাণপত্রের লেনদেন নিষিদ্ধ, যেগুলো শুধু নগদ অর্থ এবং উসুলযোগ্য ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু সে প্রমাণপত্রগুলো যদি কোম্পানির কোনো সম্পদের অংশভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব করে; যেমনটি শেয়ার করে থাকে, তাহলে এমন আর্থিক প্রমাণপত্রের ব্যবসা জায়েজ আছে। এসব প্রমাণপত্রের মূল্য নির্ধারিত হবে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে। যেমন অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ হয়ে থাকে।

ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি তাদের চতুর্থ অধিবেশনে এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলো এবং বিস্তারিত একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলো। যেখানে এসব সুকুকের বিষয়ে নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। সে অধিবেশনে এ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এখানে সেসব মাসআলার ওপর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত বন্ডের বিকল্প পদ্ধতি

রাষ্ট্র তার বাজেটের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে যেসব বন্ড ইস্যু করে থাকে, সেগুলোরও শরয়ি বিকল্প হিসেবে সুকুক পেশ করা সম্ভব। কিন্তু শরয়ি পদ্ধতিতে ঘাটতি পূরণের জন্য রাষ্ট্র ঋণ নিয়ে তার ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে না। বরং শরয়ি পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেন করতে হলে আর্থিক বিনিয়োগ নির্দিষ্ট খাতে হওয়া জরুরি। আর যে খাতের জন্য আর্থিক বিনিয়োগের ইচ্ছে করা হবে, তার অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োগ মডিউলে ভিন্নতা আনতে পারে। সেই ভিত্তিতে

বিনিয়োগ মডিউল অনুযায়ী বিনিয়োগ করা। সুকুক বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন—আল-মায়ায়িরুশ শারইয়্যাহ পৃষ্ঠা : ৪৬৩, মিয়ার : ১৭, বহুস, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬১, প্রবন্ধ : ২৩।

বিভিন্ন প্রকৃতির যেসব প্রকল্পে অর্থায়ন করার প্রয়োজন পড়বে সেখানে নিচের পদ্ধতি থেকে কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. মুশারাকা বা মুদারাবার সুকুক

অনেক রাষ্ট্রের কাছে এমন অনেক ব্যাবসায়িক প্রকল্প আছে, যা অনেক লাভজনক। যেমন : পানি, বিদ্যুতের সাপ্লাই প্রকল্প। টেলিফোন, ডাক প্রকল্প। যোগাযোগ সেবা যেমন : রেল, এয়ার প্রকল্প। এমন ব্যাবসায়িক প্রকল্পের জন্য রাষ্ট্রের যদি পুঁজিবিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, তাহলে মুশারাকা বা মুদারাবা সুকুক ইস্যু করার মাধ্যমে তার অর্থের যোগান সম্ভব হতে পারে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যেকে সাধারণ জনগণের সামনে এমন সুকুক পেশ করতে পারে। এরপর যাদের থেকে অর্থ উসুল হবে, তারা ব্যবসা-প্রকল্পে সে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়ে যাবে এবং যৌথ অংশীদারত্বের ভিত্তিতে তারা লভ্যাংশেও ভাগ পাবে। এ ধরনের সুকুক যেহেতু প্রতিষ্ঠানের সবকিছুর মধ্যে অংশীদারিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই সেকেন্ডারি মার্কেটে সেগুলোর লেনদেন করা জায়েজ আছে এবং চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে সেগুলোর মূল্য নির্ধারিত হবে। যৌথ মালিকানা-কোম্পানির শেয়ার-মূল্য যেভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. ইজারা সুকুক

রাষ্ট্র কর্তৃক কখনো এমন প্রকল্প নির্মাণের প্রয়োজন পড়ে, যা ভাড়া দেওয়া সম্ভব। এমন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য এমনটি করা সম্ভব যে, রাষ্ট্র ইজারা সুকুক ইস্যু করবে। যেমন : রাষ্ট্র একটি ব্রিজ নির্মাণ করতে চাইছে। এখানে এমনটি করা সম্ভব যে, যারা এ ব্রিজ ব্যবহার করবে তাদের থেকে ট্যাক্স উসুল করা হবে। অথবা এমনটিও হতে পারে যে, এ ব্রিজকে অন্য কোনো ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। সে প্রতিষ্ঠান সেই ব্রিজ ব্যবহারকারীদের থেকে ট্যাক্স উসুল করবে। সুতরাং রাষ্ট্র সুকুক ইস্যু করে জনসাধারণ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উসুল করবে। যার মাধ্যমে সুকুকের বাহক অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ব্রিজটির মালিক হবে। এরপর সেসব অংশীদার তাদের মালিকানার অংশ অনুপাতে ব্রিজের ভাড়া বা ট্যাক্সের অধিকারী হবে। শেষ পর্যায়ে এটি রাষ্ট্রের কাছে বা তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করে দেওয়া যেতে

পারে। আর যে অর্থ বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে তা সুকুকহোল্ডারদের মধ্যে তাদের অংশ অনুপাতে বণ্টন করে দেওয়া হবে। আর এ সকল সুকুক যেহেতু ব্রিজের মালিকানার একটি অবিভক্ত অংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই এগুলো যোগান চাহিদা অনুপাতে সেকেন্ডারি মার্কেটেও লেনদেন করা যাবে।

৩. রাষ্ট্রীয় আর্থিক বিনিয়োগ ফান্ড

অনেক সময় রাষ্ট্রের সামনে এমন প্রকল্প আসে, যা লাভজনক নয়। অথবা এত কম লাভ হয় যে, তা সাধারণ মানুষদেরকে সেখানে অংশ নিতে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন : স্বশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা, অথবা এমন কিছু নির্মাণ করা, যা লাভজনক নয়। এমন প্রকল্পে মুশারাকা অথবা মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

এমন সব প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিশেষভাবে 'রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন ফান্ডের' ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। আর এ ফান্ডটি সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের সামনে এমন সুকুক ইস্যু করবে, যা সেই ফান্ডে তাদের অংশ গ্রহণের প্রমাণ বহন করবে। এরপর রাষ্ট্র সেই ফান্ড থেকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহে অবস্থার বিবেচনায় 'মুরাবাহা', 'ইজারা' অথবা 'ইস্তেসনার' পদ্ধতিতে অর্থায়ন করবে। যেমন : রাষ্ট্রের যদি অস্ত্র ক্রয়ের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে উল্লিখিত ফান্ড আমদানিকারকদের থেকে অস্ত্র ক্রয় করে সেটিকে 'মুরাবাহা মুআজ্জালা' (নির্দিষ্ট হারে লাভের শর্তে বাকি বিক্রয়) পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের কাছে বিক্রয় করবে। রাষ্ট্রের যদি মেশিনারী বা অন্য কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে এই ফান্ড সেগুলো ক্রয় করে রাষ্ট্রের কাছে ভাড়া দেবে। ইচ্ছে করলে সাধারণ ভাড়ার মতো ভাড়া দিতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে এমন চুক্তিতেও ভাড়া দিতে পারবে যে, মেয়াদান্তে রাষ্ট্র তার মালিক হয়ে যাবে। তদ্রূপ রাষ্ট্রের যদি কোনো বিল্ডিং নির্মাণের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে ওই ফান্ডের সঙ্গে 'ইস্তেসনার' চুক্তি করবে। এরপর ফান্ড ঠিকাদারি পদ্ধতিতে বিল্ডিং নির্মাণ করবে। নির্মাণ শেষে বিল্ডিংকে রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করবে। আর নির্ধারিত কিস্তিতে রাষ্ট্র ওই ফান্ডকে মূল্য পরিশোধ করবে। 'ইস্তেসনার' চুক্তিতে মূল্য নির্ধারণের সময় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, সেখান থেকে

ফান্ড যেন উপযুক্ত লাভ পায়। উল্লিখিত বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ফান্ড যে লাভ অর্জন করবে, তা ফান্ডের সুকুক হোল্ডারদের মাঝে বণ্টন করবে।

ফান্ডের সব কার্যক্রমে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক যে, ফান্ডের সামগ্রিক লেনদেনে 'মুরাবাহা' লেনদেনের হার ৪৯%-এর বেশি যেন না হয়। যেন ওই ফান্ডের সুকুক এমন ফান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে যার বৃহৎ অংশ বস্তু ও পণ্যের মধ্যে সীমিত। ফলে সেগুলোকে সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেন করা জায়েজ হবে। আর তার মূল্য নির্ধারিত হবে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে।

৪. সুদমুক্ত ঋণ সার্টিফিকেট

উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্র তার অধিকাংশ প্রয়োজন রাষ্ট্রের জনগণের অর্থলগ্নির মাধ্যমেই পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু অর্থলগ্নির জন্য উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতি যেহেতু নির্দিষ্ট প্রকল্পের সঙ্গে বিশেষিত তাই এ বিষয়টি রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকবে যে, উসুলকৃত অর্থ বাস্তবিক প্রকল্পের জন্যই ব্যবহার করা হবে, এবং এর লভ্যাংশ সাধারণ জনগণই পাবে। কিন্তু যে ঋণ নির্দিষ্ট কোনো প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় না সেগুলোর ক্ষেত্রে আশঙ্কা থেকে যায় যে, আরাম, আয়েশ, অপচয় অথবা অন্য জায়গায় সেগুলো খরচ করা হবে। মোটকথা, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের পক্ষে যদি উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির কোনো একটির মাধ্যমে কাজ নেওয়ার সুযোগ না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার জনগণ থেকে সুদমুক্ত ঋণ চাইতে পারবে। সাধারণ জনগণ যদি এ কথা জানতে পারে যে, শরয়ি পদ্ধতিতে অর্থায়নের জন্য রাষ্ট্র তার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছে, সেই সঙ্গে জনকল্যানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবেই তার অর্থায়নের প্রয়োজন রয়েছে—শেষ পর্যন্ত জনগণই যার উপকার ভোগ করবে আবার আরাম-আয়েশের জন্যও এমন অর্থলগ্নি চাওয়া হচ্ছে না, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে জনগণ রাষ্ট্রকে সুদমুক্ত ঋণ দিতেও প্রস্তুত থাকবে। বিশেষ করে সে মুহূর্তে বেশি উদ্বুদ্ধ হবে, যখন শিক্ষা ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্র কল্যাণের পথ রচনা করতে চাইবে।

এ ধরনের ঋণদাতাদেরকে তাদের ঋণের জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। সেগুলোকে বাজারে কমবেশিতে লেনদেন করা জায়েজ হবে না। কেননা, আমরা

আগেই আলোচনা করেছি যে, কমবেশিতে ঋণের বিক্রয় জায়েজ নেই। অবশ্য হাওয়ালার পদ্ধতিতে এসব সার্টিফিকেটকে সমমূল্যে নগদায়ন করতে পারে।

রাষ্ট্রের জন্য এমনটি করার সুযোগ আছে যে, সার্টিফিকেটের বাহকদের থেকে কিছু ট্যাক্স মওকুফ করে দেবে। অথবা ট্যাক্স নির্ধারণের সময় তাদের জন্য পার্সেন্ট কমিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এ কথা স্পষ্ট যে, এমনটি করলে তা 'কর্জ দিয়ে লাভ ভোগ করার' পর্যায়ে পড়বে না। কেননা, সাধারণ কর্জগুলো সে সময় সুদি ঋণের আওতাভুক্ত হয়, যখন ঋণী মূল অর্থের চেয়ে বেশি দেওয়ার দায়ভার গ্রহণ করে। কিংবা ঋণদাতার ওপর থেকে এমন কোনো ঋণ মওকুফ করে দেয়, যা তার দায়িত্বে আগে থেকেই ওয়াজিব ছিলো। কিন্তু ট্যাক্স জনগণের ওপর আগে থেকেই ওয়াজিব ঋণের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর রাষ্ট্রের জন্যও এমনটি করার সুযোগ আছে যে, সে কোনো কোনো ব্যক্তির ওপর বিশেষ কারণবশত ট্যাক্স আরোপের ক্ষেত্রে পরিমাণে তারতম্য করতে পারে।

সুদমুক্ত ঋণদাতাগণ যেহেতু রাষ্ট্রকে এমন ঋণ দিয়েছে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে। এ জন্য রাষ্ট্রেরও এই অধিকার আছে যে, তাদের থেকে ট্যাক্স মওকুফ করে দেবে। অথবা ট্যাক্স আরোপের ক্ষেত্রে তাদের জন্য পরিমাণে হালকা করবে। সেটি এ কারণে যে, রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূরণে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। সুতরাং তাদের থেকে সে পরিমাণ ট্যাক্স নেওয়া হবে না যা অন্যান্য লোকদের থেকে নেওয়া হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তার জন্যই শুরু ও শেষের সকল প্রশংসা।

অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ' প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি 'فسخ نكاح المسلمات من قبل المراكز الاسلامية في بلاد غير اسلامية' শিরোনামে আরবি ভাষায় লেখেন। পরবর্তীকালে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়।

—আবদুল্লাহ মায়মান

অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ

হামদ ও সালাতের পর—

বর্তমান সময়ে এমন মুসলিমের সংখ্যা অনেক বেশি, যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করেন, যেখানে কোনো মুসলিম বিচারক নেই। অথচ সেখানকার মুসলিমরা এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন, যা বিচারকের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হয়। বিশেষ করে ওইসব নারীরা, যারা শরয়ি কারণে নিজেদের স্বামী থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে বাধ্য হন।

'রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামি'-এর ফিকহ অ্যাকাডেমির পরিচালনা পরিষদের কাছে অমুসলিম দেশের অনেক ইসলামি সংস্থার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রশ্ন আসে যে, মুসলিম নারীরা তাদের স্বামী থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে অমুসলিম আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে কি না? ইসলামি সংস্থার জন্য কি এ সুযোগ আছে যে, এ বিষয়ে তারা কাজির স্থলাভিষিক্ত হয়ে কোনো শরয়ি কারণে মুসলিম নারীদের তাদের স্বামী থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে? তাই অ্যাকাডেমির পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, এ বিষয়ে যেন একটি প্রবন্ধ লিখি যাতে তা অ্যাকাডেমির আগামী সেমিনারে উপস্থাপন করা যায়। এ নির্দেশ পালনার্থেই নিচের কয়েক লাইন লিখলাম। (মহান আল্লাহ তাওফিক দাতা)

১. শরয়ি দৃষ্টিতে অমুসলিম কাজির পক্ষ থেকে মুসলিম নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, মহান আল্লাহর ঘোষণা আছে—

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

'মহান আল্লাহ কখনোই মুসলিমদের ওপর কাফেরদের কর্তৃত্ব দেবেন না।'[৬৯]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلهِ عليكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহকে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?'[৭০]

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. এ আয়াতের তাফসিরে লেখেন—

واقتضت الآية النهي عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إليهم والثقة بهم وهو يدل على أن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم بوجه.

'বর্ণিত আয়াত অমুসলিমদের কাছে সাহায্য চাওয়া, সহযোগিতার আবেদন করা, তাদের ওপর ভরসা করা অথবা আস্থা রাখার বিষয়ে নিষেধ করে। সুতরাং এ আয়াতটি এ কথা প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের ওপর কাফেরদের কোনো ধরনের কর্তৃত্ব নেই।'[৭১]

আমাদের জানা মতে, সব ফকিহ এ কথার ওপর একমত যে, অমুসলিম বিচারক হওয়া জায়েজ নেই এবং তার ফায়সালা মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য ও প্রয়োগ হবে না। ইবনু রুশদ রহ. বলেন—

القضاء خصال مشتركة في صحة الولاية، وهي أن يكون القاضي ذكرا، حرا، مسلما، بالغا، عاقلا، واحدا، فهذه ستة خصال لا يصح أن يُولّي القضاء إلا من اجتمعت فيه، فأولى من لم تجتمع فيه لم ينعقد له الولاية.

---

[৬৯] সুরা নিসা, আয়াত : ১৪১।

[৭০] সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৪।

[৭১] আহকামুল কুরআন, ইমাম জাস্‌সাস রহ.। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯১।

'কাজির দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। আর তা হলো, পুরুষ, স্বাধীন, মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন ও একক হওয়া। উল্লিখিত ছয়টি শর্ত ছাড়া কাউকে কাজির দায়িত্ব দেওয়া সহিহ হবে না। সুতরাং যার মধ্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ থাকবে না, তার কাজির দায়িত্ব সঠিক হবে না।'[৭২]

'আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব' কিতাবে আছে—

لا يجوز أن يكون القاضي كافرا، ولا فاسقا، ولا عبدا، ولا صغيرا.

'কাফের, ফাসেক, দাস অথবা নাবালেগের কাজি হওয়া জায়েজ নেই।'[৭৩]

শিরওয়ানি রহ. বলেন—

(وشرط القاضي) أي من تصح توليته للقضاء (مسلم) لأن الكافر ليس أهلا للولاية، ونصبه على مثله مجرد رئاسة لا تقليد حكم لقضاء، ومن ثم لا يلزمون بالتحكيم عنده ولا يلزمهم حكمه، إلا ان رضوا به.

কাউকে কাজির দায়িত্ব দেওয়ার জন্য শর্ত হলো, তার মুসলিম হতে হবে। কারণ, কাফের কাজি হওয়ার যোগ্য নয়। এ পদে কাফেরকে অধিষ্ঠিত করার অর্থ হলো, কেবল তার নেতৃত্ব পাওয়া। তার হুকুম ও ফায়সালা মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য হবে না। এ কারণে বাদি-বিবাদি তার কাছে বিচার দিতে বাধ্য নয় এবং তার বিচার মানতেও বাধ্য নয়। হ্যাঁ তবে যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে সেটি মেনে নেয়, তাহলে ভিন্ন কথা...'

ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

ولا يُولّى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا الخ...

'প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, মুসলিম, স্বাধীন ও ন্যায় পরায়ণ ইত্যাদি হওয়া ছাড়া কাজি হওয়া জায়েজ নয়।'

'ফাতাওয়া হিন্দিয়া'তে আছে—

---

[৭২] মাওয়াহিবুল জালিল, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৮৭।

[৭৩] মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৬।

ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة كذا في الهداية من الإسلام ، والتكليف ، والحرية.

'সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া ছাড়া কাউকে বিচারকের দায়িত্ব অর্পণ করা সহিহ হবে না। হেদায়া গ্রন্থেও এমনটি আছে। আর সেসব শর্ত হলো, মুসলিম হওয়া ও শরিয়তের মুকাল্লাফ হওয়া। (অর্থাৎ, উল্লিখিত শর্তসমূহ)

ইবনু আবিদিন শামি রহ. বলেন—

وحاصله أن شروط الشهادة من الاسلام و العقل والبلوغ شروط لصحة توليته ولصحة حكمه بعدها.

'মোটকথা, সাক্ষীর জন্য প্রযোজ্য শর্তগুলো তথা মুসলিম হওয়া, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া,কাজির দায়িত্ব অর্পণ এবং তার বিচার সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত।'[৭৪]

উল্লিখিত দলিল ও ফিকহি বক্তব্যের আলোকে মুসলিম নারীদের জন্য অমুসলিম কাজির আদালতে নিজেদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটানোর আর্জি পেশ করা জায়েজ নেই। আর পেশ করলেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে না। হ্যাঁ, তবে যদি শরয়ি নিয়ম অনুযায়ী কোনো নারীর বিয়ে-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। (যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ) এবং আইন অনুযায়ী সে বিচ্ছেদকে মেনে নেওয়ার জন্য অমুসলিম কাজির ফায়সালা ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে তাহলে, অমুসলিম কাজির আদালতে তা পেশ করা জায়েজ আছে। তবে অমুসলিম আদালতের সিদ্ধান্ত বিয়ে-বিচ্ছেদের মূল ভিত হবে না। বরং তাদের আগের বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে আদালতের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ধরা হবে।

২. দ্বিতীয় প্রশ্ন :

অমুসলিম দেশে ইসলামি সংস্থার জন্য কি এমনটি করা জায়েজ আছে যে, শরয়ি কারণে মুসলিম নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষেত্রে তারা

[৭৪] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৫৭।

মুসলিম কাজির স্থলাভিষিক্ত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আসল হলো, সে বিষয়টির সব ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্বামীর হাতে থাকবে। সুতরাং নারীর জন্য এমনটি করা জায়েজ নেই যে, সে নিজে নিজেকে তালাক দেবে। বা সাধারণ অবস্থায় নিজের স্বামী থেকে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবে। কিন্তু কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি সামনে আসে যখন নারী তার বিষয়টি শরয়ি কাজির সামনে পেশ করতে বাধ্য হয়। আর কাজি তার ব্যাপক ক্ষমতার জোরে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেন। আর এমন বিচ্ছেদ ঘটানোর নির্দিষ্ট কিছু কারণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বামী হারিয়ে যাওয়া, পুরুষত্বহীন হওয়া, পাগল হয়ে যাওয়া, কোনোভাবে স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনে সক্ষম না হওয়া, স্ত্রীকে অসহ্য কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

তবে এ ক্ষেত্রে হানাফি, শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের অভিমত হলো, তাদের এ বিচ্ছেদ কোনো শরয়ি কাজির মাধ্যমে হতে হবে। উল্লিখিত তিন মাজহাবে আমি এমন কোনো বক্তব্য পাইনি যাতে, শরয়ি কাজি ছাড়া অন্য কাউকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কাজেই অমুসলিম দেশসমূহ, যেখানে শরয়ি কাজি নেই, সেসব দেশের মুসলিম নারীদের ওই সমস্যার সমাধান এ তিন মাজহাবে নেই। চার মাজহাবের মধ্যে শুধু একটি মাজহাব এমন আছে, যেখানে ওই সমস্যার সমাধান রয়েছে। আর সেটি মালিকি মাজহাব। কারণ, মালিকি মাজহাবের আলেমগণের অভিমত হলো, যেসব দেশে এমন মুসলিম কাজি নেই, যার কাছে মুসলিমগণ তাদের সমস্যা ও বিবাদ পেশ করতে পারেন, সেসব দেশে এমনটি হতে পারে যে, মুসলিমদের একটি দল তাদের পারস্পরিক বিবাদ ও সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রে শরয়ি কাজির স্থলাভিষিক্ত হবেন। মালিকি মাজহাবের কিতাবসমূহে এ কথাটি খুব স্পষ্টভাষায় রয়েছে যে, এই বিধান সব বিষয় ও সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। দুসুকি রহ. বলেন—

اعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ فِيهِ إِلَى الْحَاكِمِ أَوْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ عَدْلٍ.

‘জেনে রাখো, এমন ক্ষেত্রে মুসলিমদের একটি ন্যায়পরায়ণ দল

বিচারক ও কাজির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তা ছাড়া যেখানে মুসলিম কাজির শরণাপন্ন হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে বা সে ন্যায়পরায়ণ না হয়। (সে ক্ষেত্রেও একই বিধান)'[৭৫]

এখান থেকে যে বিষয়টি বোঝা গেলো তাহলো, মুসলিমদের একটি দল বিচারক বা কাজির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার হুকুমটি কেবল ওই স্থানের সঙ্গে বিশেষিত নয়, যেখানে শরয়ি কাজি নেই। বরং যেসব ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম কাজি রয়েছে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ নয়, সেখানেও এ বিধান প্রযোজ্য। উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এটিও স্পষ্ট হয় যে, মুসলিমদের একটি দল বিচারক বা কাজির স্থলাভিষিক্ত হওয়া কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা মাসআলার সঙ্গে বিশেষিত নয়। বরং এ হুকুমটি সব ধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যদি মুসলিম কাজির শরণাপন্ন হওয়া অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য হয়। এ কারণে মালিকি মাজহাবের ফকিহগণকে দেখি যে, অনেক মাসআলাতে তারা মুসলিম দলের সিদ্ধান্তকে কাজির সিদ্ধান্তের মতো গ্রহণ করেছেন। তাদের কিছু বক্তব্য নিচে পেশ করা হলো। হাত্তাব রহ. বলেন—

ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوإلى وإلى الماء، والا فلجماعة المسلمين.

'স্ত্রী নিখোঁজ-স্বামীর বিষয়টি কাজি, ওলি বা উপ ওলির (জাকাত উসুলের দায়িত্বে নিয়োজিত কাজির) কাছে পেশ করবে। অন্যথায় মুসলিমদের দলের সামনে পেশ করবে।'[৭৬]

'হাশিয়াতুল আদাবি'তে আছে—

فَإِنَّهَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ] الْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ الْقَاضِي كَانَ قَاضِي أَنْكِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَأَوْلَى قَاضِي الْجَمَاعَةِ وَالْوَإِلى ، وَهُوَ قَاضِي الشُّرْطَةِ أَيْ السِّيَاسَةِ وَوَإِلى الْمَاءِ أَيْ الَّذِي يَأْخُذُ الزَّكَاةَ ، وَسُمُّوا وُلَاةَ الْمِيَاهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى الْمِيَاهِ ، وَالثَّلَاثَةُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنَّ الْقَاضِيَ أَحْوَطُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَرْأَةُ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ ، فَتَرْفَعُ أَمْرَهَا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

---

[৭৫] হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শরহিল কাবির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১৯, পরিচ্ছেদ : ফিকহ।

[৭৬] মাওয়াহিবুল জালিল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৫৫।

‘স্ত্রী নিখোঁজস্বামীর বিষয়টি হাকিমের কাছে নিয়ে যাবে। হাকিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাজি। চাই সে বিয়ের কাজি হোক কিংবা অন্য কোনো কাজি হোক। অবশ্য উত্তম হলো, সে প্রধান কাজি বা ওলির কাছে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ, পুলিশের কাজি তথা রাষ্ট্রীয় বিষয়ের কাজি বা উপ কাজি (পানির কাজি অথবা জাকাত উসুলের দায়িত্বে নিয়োজিত কাজি)-র কাছে নিয়ে যাবে। তাকে পানির কাজি বলে নামকরণ করার কারণ হলো, মানুষ পানির প্রবাহের কাছে জমা হলে তারা বের হয়ে আসেন। উল্লিখিত তিন শ্রেণি এক পর্যায়ের। কিন্তু প্রধান কাজির কাছে যাওয়া বেশি উত্তম। নারী যদি উল্লিখিত তিন শ্রেণির কোনো একজনকে না পায়, তাহলে তার বিষয়টি মুসলিমদের বিজ্ঞ জামাতের কাছে পেশ করবে।’[৭৭] আল-ফাওয়াকিহুদ দিওয়ানিতে আছে—

لم ينص المصنف على من ترفع له زوجة المفقود، وقد ذكرنا عن خليل أنه القاضي أو الوالي أو جماعة المسلمين.

‘মুসান্নিফ এ কথাটি স্পষ্ট করেননি যে, স্বামী-নিখোঁজ-স্ত্রী তার বিষয়টি কার কাছে পেশ করবে? অবশ্য ইমাম খলিল রহ.-এর উদ্ধৃতিতে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, কাজি কিংবা উপ কাজি অথবা মুসলিমদের বিজ্ঞ জামাতের কাছে তার বিষয়টি পেশ করবে।’[৭৮] মাওয়াক রহ. বলেন—

وقَالَ الْقَابِسِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْقَرَوِيِّينَ : لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي مَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ لَرَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى صَالِحِ جِيرَانِهَا يَكْشِفُوا عَنْ خَبَرِ زَوْجِهَا ، ثُمَّ ضَرَبُوا لَهُ الْأَجَلَ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ ثُمَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ لِأَنَّ فِعْلَ الْجَمَاعَةِ فِي عَدَمِ الْإِمَامِ كَحُكْمِ الْإِمَامِ.

‘কাবেসি ও অন্যান্য আলেম বলেন, স্বামী-নিখোঁজ-স্ত্রী যদি এমন স্থানে থাকে, যেখানে মুসলিমদের বিচারক নেই। তাহলে এ মহিলা তার বিষয়টি নেক প্রতিবেশিদের কাছে পেশ করবে। তারা তার স্বামীর অনুসন্ধান করবে। তারপর চার বছর অপেক্ষার জন্য নির্ধারণ করে দেবে। সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মৃতের ইদ্দত পালন করবে। এরপর

[৭৭] হাশিয়াতুল আদবি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২১।

[৭৮] আল-ফাওয়াকিহুদ দিওয়ানি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২১।

মহিলা অন্যের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য হালাল হয়ে যাবে। কেননা, বিচারকের অনুপস্থিতিতে মুসলিমদের বিজ্ঞ জামাতের সিদ্ধান্ত বিচারকের সিদ্ধান্তের স্থলাভিষিক্ত।'[৭৯] ইলার অধ্যায়ে দারদির রহ. বলেন—

فالحصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة، فإن امتنع منها أمر بالطلاق، فان امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين.

'মোটকথা, ইলার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর স্বামীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হবে। স্বামী যদি অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। সে যদি তালাক দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে হাকিম অথবা মুসলিমদের বিজ্ঞ জামাত তালাক দিয়ে দেবে।'[৮০]
এ ছাড়াও অভিভাবক নির্ধারণের আলোচনায় তিনি বলেন—

واستحسن أن العرف كالنص كما يقع كثيرا لاهل البوادي وغيرهم أن يموت الاب ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو عم أو جد ويكفل الصغار من ذكر فلهم البيع بشروطه ويمضي ولا ينقض وينبغي أن يكون ذلك فيمن عرف بالشفقة وحسن التربية وإلا فلا بد من حاكم أو جماعة المسلمين.

'পছন্দনীয় হলো, সামাজিক প্রচলন শরয়ি দলিলের মতো। যেমন অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে এ অভ্যাস রয়েছে যে, ভাই, চাচা অথবা দাদার ওপর নির্ভর করে পিতা তার সন্তানদের জন্য কোনো অভিভাবক নির্ধারণ না করেই মারা যায়। সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিরা তার সন্তানের দায়িত্ব বহন করে। তাই প্রয়োজনে শর্ত সাপেক্ষে তারা এই সন্তানের জন্য কেনা-বেচা করতে পারবে। কোনো চুক্তি বহাল রাখতে পারবে। অবশ্য কোনো বিক্রয় চুক্রি ভঙ্গ করতে পারবে না। তবে উচিত হলো, উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে যার চরিত্র ভালো এবং যে শিশুদের প্রতি অধিক সদয়, তাকে দায়িত্ব দেওয়া। অন্যথায় প্রশাসক অথবা মুসলিমদের বিজ্ঞ জামাতকে দায়িত্ব দিতে হবে।'[৮১]

---

[৭৯] আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৫৬।
[৮০] আশ শরহুল কাবির, ২, পৃষ্ঠা : ৪৩৬।
[৮১] আশ শরহুল কাবির, ২, পৃষ্ঠা : ৪৩৬।

দুসুকি রহ. 'কাফালাত বিন নাফস' (জীবনের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ) অধ্যায়ে এই মাসআলা উল্লেখ করে বলেন, 'মাজমুন' (দায়বদ্ধ)-কে 'মাজমুন লাহু' (যার জন্য দায়বদ্ধ)-এর কাছে এমন শহরে হস্তান্তর করা সহিহ হবে, যেখানে এ ধরণের প্রশাসক আছে যার মাধ্যমে খালাস পাওয়া সম্ভব। তিনি বলেন—

(قَوْلُهُ : إِنْ كَانَ بِهِ حَاكِمٌ) الْمُرَادُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَدُ الَّذِي أَحْضَرَ فِيهِ يُمْكِنُ خَلَاصُ الْحَقِّ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ حَاكِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَإِنَّمَا فِيهَا جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ.

'সেখানে যদি প্রশাসক থাকে' কথাটির উদ্দেশ্য হলো, এমন শহর যেখানে দায়বদ্ধকে উপস্থিত করলে দায়মুক্ত হওয়া সম্ভব। সেখানে কোনো প্রশাসক থাকুক বা না-থাকুক। বরং মুসলিমদের বিজ্ঞ জামাত থাকলেই যথেষ্ট।'[৮২]

দুসুকি রহ. আরও বলেন—

مِنْ جُمْلَةِ أَمْرِ الْغَائِبِ فَسْخُ نِكَاحِهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ أَوْ لِتَضَرُّرِ الزَّوْجَةِ بِخُلُوِّ الْفِرَاشِ فَلَا يَفْسَخُ نِكَاحَهُ إِلَّا الْقَاضِي مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الْوُصُولُ إِلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ كَانَ يَأْخُذُ دَرَاهِمَ عَلَى الْفَسْخِ وَإِلَّا قَامَ مَقَامَهُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ.

'স্বামী-নিখোঁজ কেন্দ্রিক সমস্যাগুলো থেকে একটি সমস্যা হলো, খরচ না থাকা বা দৈহিক মিলন না ঘটার কারণে স্ত্রীর ক্ষতি হওয়া। কাজির কাছে প্রকৃত অর্থে বা হুকমিভাবে পৌঁছানো অসম্ভব হওয়া ছাড়া অন্য কেউ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। হুকমিভাবে অসম্ভব হওয়ার অর্থ হলো বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য কাজি অর্থ গ্রহণ করে। (অর্থাৎ, ঘুষ নেয়) অন্যথায় মুসলিমদের বিজ্ঞ জামাতকে কাজির স্থলাভিষিক্ত করা হবে।'[৮৩]

উল্লিখিত ফিকহি বক্তব্যগুলো থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হলো যে, মালিকি মাজহাবের ফকিহগণ সেসব বিষয়ের সিদ্ধান্তের অধিকার মুসলিমদের বিজ্ঞ

[৮২] হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শরহিল কাবির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৪৫।

[৮৩] হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শরহিল কাবির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০২।

জামাতের কাছে হস্তান্তর করেছেন যেসব ক্ষেত্রে কাজির শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেখানে শরয়ি ন্যায়পরায়ণ কাজি নেই। এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, অমুসলিম দেশে অবস্থানরত মুসলিমদের জন্য মালিকি মাজহাবে ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। একইসঙ্গে এ কথাটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্তমানে অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলিমের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের জন্য এমন সুযোগ নেই যে, নিজেদের সমস্যা সমাধানে তারা অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের বিচারকদের সহযোগিতা নেবে। বিশেষত, যখন আজকের অনেক আদালত শরয়ি বিধানের তোয়াক্কা করে না, এমন কি ইসলামি রাষ্ট্রের আদালতেও ইসলামি বিধানের তোয়াক্কা করা হয় না। আর এর সঙ্গে যখন অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম নারীদের ব্যাপারটি সংযুক্ত হয়, তখন তো সেটি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। সেখানে মুসলিম নারীরা অনেক সময় নিজেদের স্বামী থেকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় আবার তাদেরকে দেখার মতো সেখানে কোনো নিকটাত্মীয় বা আপনজনও থাকে না। অন্যদিকে শরয়ি দৃষ্টিতে তাদের জন্য এমন সুযোগও নেই যে, তারা নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য কাফের বিচারকদের কাছে যাবে। এখন আমরা যদি সমস্যাটির সমাধানে মালিকিদের কথা গ্রহণ না করি, তাহলে তাদেরকে অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে।

আর বর্তমান সময়ের নির্ভরযোগ্য একদল ফকিহও এ ব্যাপারে মালিকিদের মতামত গ্রহণ করেছেন। ইংরেজ শাসনামলে তারা যখন শরয়ি আদালতের ওপর হস্তক্ষেপ করেছিলো তখন হিন্দুস্তানেও এ মতের ওপর আমল করার প্রয়োজন পড়েছিলো। মুসলিমদের বিবাদ মেটাতে তারা অমুসলিম জজ নিযুক্ত করেছিলো। এমনকি মুসলিমদের মৌলিক ও একান্ত বিশেষ বিষয়েও তারা হস্তক্ষেপ করেছিলো। অথচ হিন্দুস্তানে বসবাসরত অধিকাংশ মুসলিম হানাফি মাজহাবের অনুসরণকারী ছিলেন। তারপরও হানাফি মাজহাবের আলেমগণ এ বিষয়টি মালিকি মাজহাবের ওপর ফতোয়া দিয়েছিলেন। আশরাফ আলি থানবি রহ. এ বিষয়ে 'আল-হিলাতুন নাজেজা লিল হালিলাতিল আজেজা' নামক স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি লেখার সময় মালিকি মাজহাবের অনেক আলেমের ফতোয়ার শরণাপন্ন হওয়ার পর

মালিকি মাজহাবের অভিমত অনুযায়ী এই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, এ দেশে মুসলিমদের বিজ্ঞ জামাত কাজির স্থলাভিষিক্ত হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার জন্য যেসব শরয়ি কারণ রয়েছে তার ভিত্তিতে তারা সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেন। হিন্দুস্তানের সব আলেম এ মাসআলাতে তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তাদের সম্মতি সে গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। মালিকি মাজহাবের মতামত এবং বর্তমানে যেসব ওলামা তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন তার ভিত্তিতে আমার অভিমত হলো, অমুসলিম দেশের ইসলামি সংস্থার জন্য করণীয় হলো, তারা নিজেদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধানের জন্য একটি জামাত প্রস্তুত করবে। কিন্তু তাদের জন্য সেসব নিয়ম-নীতি ও শর্তের অনুসরণ আবশ্যকীয় থাকবে, শরয়ি দৃষ্টিতে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যেগুলোর অনুসরণ জরুরি। মালিকি মাজহাবের ফকিহগণ যা বলেছেন, তার আলোকে সেসব শর্তের সারাংশ হলো এই।

১. মুসলিম জামাতের সদস্য সংখ্যা

যে জামাত কাজির স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করবে, তাদের সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে মালিকি মাজহাবের আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ এ অভিমত গ্রহণ করেছেন যে, এ দলের সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে তিনজন হতে হবে। শায়খ উলাইশ রহ. বলেন—

وتعبير المصنف كغيره بجماعة يقتضي أن الواحد لا يكفي وكذا الاثنان، وبه صرح عج.

'মুসান্নিফ ও অন্যান্যদের 'জামাত' বলার দ্বারা এটি বুঝায় যে, এ ক্ষেত্রে একজন যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে দুজনও যথেষ্ট নয়।'

আবার অনেক আলেম বলেন যে, কমপক্ষে দুজন থাকা আবশ্যক। দারদির রহ. 'শরহু কাবির' এ বলেন—

وأراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فاكثر.

এ কথার ব্যাখ্যায় দুসুকি রহ. বলেন—

ظاهره أن الواحد من العدول لا يكفي،والذي في كبير خش وشب نقلا أن الواحد من جماعة المسلمين يكفي.

তারপর দারদির রহ. থেকে নকল করে এ কথার শেষ সিদ্ধান্ত পেশ করেন। তিনি বলেন—

(قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ عَدَالَةُ فَالْجَمْعُ عَلَى أَصْلِهِ) أَيْ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْعَدَدِ تُجْبِرُ خَلَلَ الشُّهُودِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِثَلَاثَةٍ مِنْ غَيْرِ الْعُدُولِ ، وَلَا يُسَلَّمُ هَذَا بَلْ إذَا عَدِمَتْ الْعُدُولُ يَسْتَكْثِرُ مِنْ الشُّهُودِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الصِّدْقُ الْمُتَأَتِّي بِالْعُدُولِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ.

'উল্লিখিত জামাতের সদস্যের মধ্যে যদি ন্যায়পরায়ণতা না পাওয়া যায়, তাহলে সংখ্যার শর্ত তার স্বস্থানে থাকবে। (অর্থাৎ, কমপক্ষে তিনজন) কেননা সংখ্যার আধিক্য একজন সাক্ষীর মধ্যে পাওয়া ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করবে। এখানে যা বোঝা যায় তা হলো, ন্যায়পরায়ণ নয় এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তিনজন যথেষ্ট। তবে এ কথাটি মেনে নেওয়া যায় না। কেননা ন্যায়পরায়ণতার অনুপস্থিতিতে সাক্ষীর সংখ্যার পরিমাণ এত বেশি হতে হবে যে, তাদের সত্যবাদিতার ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হবে কায়দা অনুযায়ী।'[৮৪]

সুতরাং উত্তম হলো, মুসলিম জামাতের সংখ্যা তিন জনের কম না হওয়া। এর প্রথম কারণ হলো, মতানৈক্য থেকে বেঁচে থাকা। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, সে জামাতে সততার ঘাটতি হলে সংখ্যার ওপর নির্ভর করা আবশ্যক। এমনকি যারা একজন কিংবা দুজন হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন, তাদের কাছেও কমপক্ষে তিন জন হওয়ার বিষয়ে এটি একটি কারণ। যার আলোচনা ইতোপূর্বে দারদির ও দুসুকি রহ.-এর বক্তব্যে পেশ করা হয়েছে। তৃতীয় কারণ হলো, তিন জনের ওপর বেশি নির্ভর করা যায়। বিশেষ করে আমাদের যুগে। কেননা, বিচার কিংবা সিদ্ধান্তে শুধু একজনের সিদ্ধান্ত অনেক সময় অপবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া 'জামাত' শব্দের দাবি হলো কমপক্ষে তিনজন হওয়া।

[৮৪] হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শরহিল কাবির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৩।

২. মুসলিম জামাতের গুণাবলি

মুসলিম জামাতের সদস্যবৃন্দের গ্রহণযোগ্যতা এবং তাদের ইলমি যোগ্যতার ব্যাপারে মালিকি মাজহাবের আলেমগণ সততা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেননি। সবসময় সে জামাতের সদস্যগণ আলেমদের থেকে হতে হবে এমন কোনো শর্তের কথা তারা বলেননি। কিন্তু এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, সেই জামাতের সামনে যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত চাওয়া হবে, তার শরয়ি বিধান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারা যদি বৈবাহিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে সে সম্পর্কে শরয়ি এমনসব কারণের জ্ঞান থাকা জরুরি, যার ভিত্তিতে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটে বা বৈবাহিক সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়। একইসঙ্গে বিয়ে সংক্রান্ত আরও শাখাগত বিষয়ে তাদের ইলম থাকতে হবে।

এসব কারণে উচিত হলো যে, সেই জামাত আলেম দ্বারা গঠিত হওয়া। যদি আলেম না পাওয়া যায়, তাহলে কমপক্ষে জামাতের একজন সদস্য আলেম হওয়া। অন্যথায় কমপক্ষে নির্ভরযোগ্য আলেমদের থেকে তাদের সামনে আসা মাসআলাসমূহের শরয়ি বিধান জেনে নেবে। আর তাও সম্ভব না হলে তারা সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে অবশ্যই কোনো আলেম বা ফকিহ থেকে সমাধান জেনে নেবে।

৩. জামাতের সদস্যদের মতবিরোধের সময় করণীয়

জামাত তিন সদস্যবিশিষ্ট হলে সেখানে যদি মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে অধিকাংশের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে কি না? মালিকি মাজহাবের ফকিহগণকে এ মাসআলা আলোচনা করতে দেখিনি। কিন্তু তাদের বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, ওই জামাতের সিদ্ধান্ত সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে হতে হবে। হাকামাইন বিষয়ে তাদের যে বক্তব্য রয়েছে তার ওপর অনুমান করলেও এটি বুঝা যায়। 'মুদাওয়ানাতুল কুবরা' কিতাবে আছে—

[قلت] فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر (قال) إذا لا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما عليه.

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, সিদ্ধান্তদাতাদের মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়? যেমন একজন তালাক দিলো, আরেকজন তালাক দিলো না

(তাহলে কী হবে)। উত্তরে তিনি বলেন, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হবে না।'[৮৫]

বাজি রহ. বলেন—

ولو حكما جماعة فاتفقوا على حكم أنفذوه وقضوبه جاز، قاله ابن كنانة في المجموعة: ووجه ذلك أنهما إذا رضيا بحكم رجلين أو رجال فلا يلزمهما حكم بعضهم دون بعض.

'দু-ব্যক্তি যদি কোনো জামাতের কাছে তাদের বিবাদ মেটাতে আবেদন পেশ করে এবং তারা সবাই ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়ে তা বাস্তবায়ন করে তাহলে এমনটি করা জায়েজ আছে। ইবনু কেনানা রহ. 'মাজমুআ' কিতাবে এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তারা উভয়ে যখন দুজন বা তার অধিক ব্যক্তিকে সিদ্ধান্তদাতা হিসেবে নির্ধারণ করেছে, তখন তাদের অংশ-বিশেষের সিদ্ধান্ত তাদের ওপর আবশ্যক হবে না।'[৮৬]

আমরা যদি মুসলিম জামাতের সিদ্ধান্তকে হাকিমদের মাসআলার সঙ্গে তুলনা করি। অথবা হাকিমদের জামাতের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে এই ফলাফল বেরিয়ে আসবে যে, মুসলিম জামাতের সিদ্ধান্ত সে সময় প্রযোজ্য হবে, যখন তা সেই জামাতের সব সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হবে। তবে তাদের সিদ্ধান্তে যদি মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু আমরা যদি বর্তমান বিচার-প্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি দিই, তাহলে এটি দেখতে পাই যে, অধিকাংশের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য। বিচারকদের একটি জামাতের কাছে যদি কোনো বিচার পেশ করা হয়, তখন সবাই এটাই বোঝে যে, অধিকাংশের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমাধান করা হবে। আর মুসলিমদের জামাত বিচারকদের একটি জামাতের স্থলাভিষিক্ত। মোটকথা, এ বিষয়টির ওপর গভীর ও দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা করার জন্য সমকালীন ফকিহদের সামনে পেশ করছি।

---

[৮৫] মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫৭।

[৮৬] আল-মুনতাকা লিল বাজি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২২৭।

৪. বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদে মুসলিম জামাতের ক্ষমতা

আমরা উপরে যা কিছু আলোচনা করেছি, তার আলোকে এ কথাটি সামনে এসেছে যে, অমুসলিম দেশে বসবাসরত যেসব মুসলিম নারী তাদের স্বামীদের থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য সঠিক পদ্ধতি হলো, মুসলিম জামাতের সামনে তা পেশ করা। যাদেরকে সে দেশের আলেমগণ অথবা ইসলামি সংস্থার পক্ষ থেকে এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই জামাত এ বিষয়ের সব শরয়ি বিধান অনুসরণ করবে। প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণের পর তারা যখন এ বিষয়ে নিশ্চিত হবে যে, এখন বিয়ে-বিচ্ছেদ করার সব শরয়ি কারণ পাওয়া গেছে, তখন তাদের জন্য সেই নারীর বৈবাহিক সম্পর্ককে বিচ্ছেদ করা জায়েজ হবে। তারা হয় সেই নারীর বিয়ে-বিচ্ছেদ করবে, কিংবা স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে স্ত্রীকে তালাক দেবে। অথবা স্বামী হারিয়ে গেলে তার মৃত্যুর ঘোষণা দেবে। যার বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবসমূহে রয়েছে। এ জামাতের সিদ্ধান্ত শরয়ি দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণযোগ্য হবে এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্য স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

অমুসলিম দেশে যেহেতু এমন জামাতের সিদ্ধান্তকে আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। এ জন্য মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে এমন সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর এ নারী সে দেশের অমুসলিম আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সেখান থেকে তালাক বা বিয়ে বিচ্ছেদের রায় নিয়ে নেবে। ওই মহিলা আদালতের শরণাপন্ন এ কারণে হবে না যে, আদালতের শরণাপন্ন হওয়া বিয়ে-বিচ্ছেদের অংশ। বরং সমস্যা থেকে বাঁচার তাগিদে আগে যে স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটেছে তার আইনি স্বীকৃতি অর্জনের জন্য (দ্বিতীয় পর্যায়ে আদালতের) শরণাপন্ন হবে। যেন আইনি স্বীকৃতি না থাকায় অন্য কোনো সমস্যার শিকার না হতে হয়।

কোনো নারী যদি অমুসলিম আদালতের পক্ষ থেকে তালাক পেয়ে যায়, তাহলে তা শরয়ি তালাক বলে গণ্য হবে না। কিন্তু তারপরও যদি কোনো নারী তার বিচ্ছেদের হুকুম বহাল রাখার লক্ষ্যে পরবর্তীকালে ইসলামি জামাতের শরণাপন্ন হয়, তাহলে প্রথমে ইসলামি জামাত এ বিষয়ে নিশ্চিত হবে যে, বিয়ে-বিচ্ছেদের জন্য শরয়ি সব শর্ত ও কারণ পাওয়া গেছে কি না? যদি কোনো কারণের অনুপস্থিতি ঘটে, তাহলে ইসলামি জামাত তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক

বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত বহাল রাখবে না। অবশ্য যদি সব শরয়ি কারণ পাওয়া যায় যেমন : স্বামী নিখোঁজ, পুরুষত্বহীন, পাগল অথবা অসহায় হয়ে যাওয়া। অথবা ফিকহি কিতাবে বর্ণিত বিয়ে-বিচ্ছেদের অন্য কোনো কারণ পাওয়া যায় তাহলে ইসলামি মারকাজের ওপর আবশ্যক হলো, নতুনভাবে বিচারের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শরয়ি সব কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তারা বিয়ে-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত দেবে। ইসলামি জামাতের জন্য শুধু আগের সিদ্ধান্ত বহাল রাখাকে যথেষ্ট মনে করা যাবে না। মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

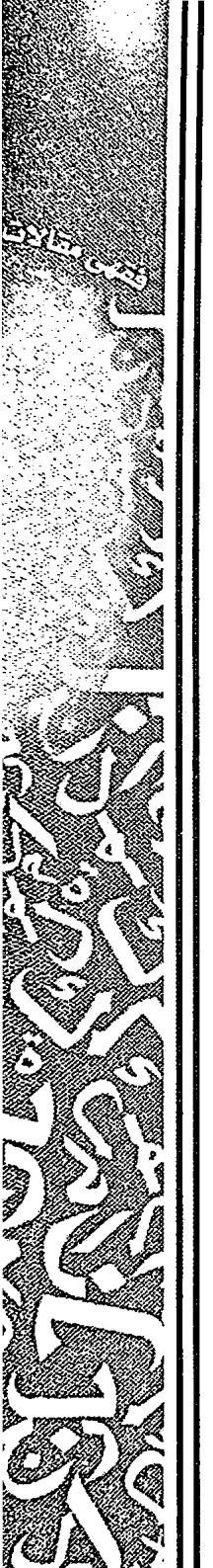

'ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের বিধান।' এ প্রবন্ধটি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ২-৪ ফেব্রুয়ারি মক্কা মুকাররামায় অনুষ্ঠিত রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সেমিনারে পেশ করার উদ্দেশ্যে 'سماحة الأحكام الشرعية في علاقة المسلمين بغيرهم' শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) আরবি ভাষায় লেখেন। প্রবন্ধটি 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। [এই প্রবন্ধটি বুহুসের বর্তমান মুদ্রিত এডিশনে নেই।]

—মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ মায়মান

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের বিধান

হামদ ও সালাতের পর—

এ প্রবন্ধটি 'মুসলিম এলাকায় অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের শরয়ি বিধান' সম্পর্কিত। বিশেষ করে ওইসব বিধান-সম্বলিত, যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ওপর, সব নবি-রাসুল এবং কেয়ামত দিবসের ওপর ইমান আনার দাওয়াত দেয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর শরিয়তের ওপর আমল করার আহ্বান করে। তবে এগুলো করার জন্য ইসলাম কখনো কারও ওপর চাপ সৃষ্টি করে না কিংবা বাধ্য করে না। বরং দাওয়াতের মাধ্যমে এবং নীতির মাধ্যমে দলিলের আলোকে এ আহ্বান করে। সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয় দূর করে এটি বাস্তবায়ন করে। ফলে যে ব্যক্তি ইমান আনার ইচ্ছে করে, তার সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন—

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عليمٌ.

'দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো চাপাচাপি নেই। ভ্রষ্ট পথ থেকে সত্যপথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যারা শয়তানকে অস্বীকার করে আল্লাহর

প্রতি ইমান আনবে সে এমন এক মজবুত রশি ধরলো, যা কখনোই বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।'[৮৭]

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করে। সেটি এ দিক থেকে যে, ইমান হলো মহান আল্লাহর রহমত এবং তার সন্তুষ্টি টেনে আনার মাধ্যম। তার প্রতিদান হলো সেই নেয়ামত, যা পরকালের অন্তহীন জীবনের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর কুফর হলো মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং পরকালে তার আজাবের কারণ। যেহেতু ইমান মহান আল্লাহর পছন্দনীয় আর কুফর অপছন্দনীয় সুতরাং এটি একটি সাধারণ কথা যে, মুমিন ও কাফের মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান হতে পারে না। একইভাবে কোনো মুমিন কাফেরকে বন্ধুও বানাতে পারে না। মহান আল্লাহর ইরশাদ রয়েছে—

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

'মুমিন মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না।'[৮৮]

অন্যত্র বর্ণিত হচ্ছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অন্যের বন্ধু। যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।'[৮৯]

কুফর ও ইমান না আনা অপছন্দনীয় কাজ এবং সেসব কাজও অপছন্দনীয় যা ইমানের বিপরীত অবস্থানে হয়ে থাকে। তবে কাফের ও অমুসলিম তাদের সত্তাগত দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় নয়। তারা তাদের সত্তাগত দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হলে তাদেরকে ইমান আনার দাওয়াত দেওয়া হতো না। মুসলিমরা তাদের আকিদা বিশ্বাসকে সংশোধনের চেষ্টা করতো না। মহান আল্লাহর আজাব থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার ফিকির করতো না। যেমন : ইহুদিরা অন্য ধর্মের অনুসারিদের অপছন্দ করে। সে কারণে তারা অন্যকে তাদের ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার

---

[৮৭] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬।

[৮৮] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৮।

[৮৯] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৫১।

চেষ্টা করে না। আর ইসলাম অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করলেও মানবিক দৃষ্টিতে অমুসলিদের সঙ্গে লেনদেন করতে বাধা দেয়নি। তবে সেসব লেনদেন ন্যায়, ইনসাফ, সহমর্মিতা, ভালো কাজে সহযোগিতা, খারাপ প্রতিহত করা, অন্যায়কে রুখে দেওয়া এবং আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে হতে হবে। বরং ইসলাম মুসলিমদেরকে এ নির্দেশ দেয় যে, মানবাধিকার, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ে বরাবর, সেসব অধিকারের যথাযথ মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে অমুসলিমদের সঙ্গে জীবনযাপন করবে। সুতরাং ইসলাম মুসলিমদেরকে এ অনুমতি দেয়নি যে, যুদ্ধহীন অবস্থায় অমুসলিমদেরকে কষ্ট দেবে এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ করবে। চাই সে কষ্ট শারীরিক হোক কিংবা মানসিক। ফকিহগণ এমন কথাও বলেছেন—

لو قال ليهودي أو مجوسي: يا كافر، يأثم إن شق عليه.

'কোনো মুসলিম যদি কোনো ইহুদি কিংবা অগ্নিপূজারীকে বলে, হে কাফের, এ কথা দ্বারা সে কষ্ট পেলে এই মুসলিম গুনাহগার হবে।'[৯০]

আহলে জিম্মার সঙ্গে আচরণবিধি

ইসলামি রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম নিরাপত্তা নিয়ে এবং চুক্তির মাধ্যমে বসবাস করে ইসলাম তাদের মানবিক অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করে। এ অধিকারের ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোনো ব্যবধান করে না। তবে তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন, যারা মহান আল্লাহর জমিনে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে বাধা সৃষ্টি করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما.

'যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি (জিম্মি) কে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্বের পথ থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়।'[৯১]

---

[৯০] ফাতাওয়া হিন্দিয়া, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৪৮।

[৯১] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : জিম্মিকে হত্যা করার গুনাহ, হাদিস : ১১৯৫।

অন্য এক হাদিসে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন—

من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.

'হত্যার শরয়ি কারণ ছাড়া যে ব্যক্তি কোনো জিম্মিকে হত্যা করবে, মহান আল্লাহ জান্নাতকে তার জন্য হারাম করে দেবেন।[৯২]'

ইবনুল আসির জাজারি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন—

'كنه' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো কিছুর সময় ও বাস্তবতা। এখানে উদ্দেশ্য হলো হত্যার সময়।'

অন্য এক হাদিসে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا.

'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কাউকে হত্যা করলো যার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দায়িত্ব রয়েছে সে যেন আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করলো। এমন ব্যক্তি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।'[৯৩]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

ألا مَنْ ظَلَمَ مُعاهِدا ، أو انتَقَصَهُ ،أو كَلَّفَهُ فوق طاقَتِه ،أو أخَذَ منه شيئا بغير طيب نفْسٍ ،فَأنا حَجِيجُهُ يومَ القيامةِ.

'শুনে রাখো, যে ব্যক্তি কোনো জিম্মির ওপর জুলুম করবে, অথবা তার অধিকার হরণ করবে অথবা তার সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেবে অথবা তার নিজ ইচ্ছার বাইরে কোনো জিনিস নেবে। কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ হয়ে দলিল নিয়ে এগিয়ে আসবো।'[৯৪]

অন্য এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

من آذى ذميا فأنا خصمه ، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة.

---

[৯২] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৭৬০।

[৯৩] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৪০৩।

[৯৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১১৩৯।

'যে ব্যক্তি কোনা জিম্মিকে কষ্ট দেবে, তার পক্ষ থেকে আমি বাদী হয়ে দাঁড়াবো। আর আমি যার বাদী হবো, কিয়ামতের দিন আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করবো।'[৯৫] এই হাদিসটির সনদ অতিশয় দুর্বল।

কাসানি রহ. একটি হাদিস বর্ণনা করেন। যার সম্পর্ক করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি—

فإن قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين.

'অর্থাৎ, কাফের যদি জিম্মি চুক্তি মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা সেসব অধিকার পাবে যা একজন মুসলিম পেয়ে থাকে এবং তাদের ওপর সেসব দায়িত্ব অর্পিত হবে যা মুসলিমদের ওপর অর্পিত হয়।'[৯৬]

এই হাদিসটি যদিও হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে পাইনি। কিন্তু এই হাদিসের মর্ম সহিহ, যেমনটি সামনে আসছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খুলাফায়ে রাশিদিন অমুসলিমদের মধ্যে জিম্মিদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। উমর ইবনু খাত্তাব রা. জিম্মিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং খুব গুরুত্বের সঙ্গে মুসলিমদেরকে বলতেন যে, তারা যেন জিম্মিদেরকে কষ্ট না দেয়। ইমাম তবারি রহ. এ কথা নকল করেন যে, উমর ইবনু খাত্তাব রা. বসরার প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন—

لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذي؟

'মুসলিমরা কি জিম্মিদেরকে কষ্ট দিচ্ছে?

উত্তরে তারা বলে—

لا نعلم إلا الوفاء.

'কেবলমাত্র তাদের অধিকার আদায় ছাড়া আর কোনো বিষয় আমাদের জানা নেই।[৯৭]

---

[৯৫] জামে সগির, ইমাম সুয়ুতি রহ., হাদিস : ৮২৬৬।

[৯৬] বাদায়েউস সনায়ে, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১০০।

[৯৭] তারিখে তবারি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২১৮।

মোটকথা, মৃত্যু পর্যন্ত উমর ইবনু খাত্তাব রা.-এর যে সব উদ্দেশ্য ছিলো, তার মধ্যে সব থেকে বড়ো উদ্দেশ্য ছিলো জিম্মিদের অধিকার রক্ষা করা। মৃত্যুর আগে পরবর্তী খলিফার জন্য যে অসিয়ত করেন, সেখানেও তিনি সেই কথার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে ভোলেননি। তিনি তার অসিয়তে বলেছেন—

أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم.

'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে অসিয়ত করছি যে, তাদের চুক্তি অনুযায়ী তাদের অধিকার আদায় করবে। তাদেরকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে। সাধ্যের বাইরে তাদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ো না।'[৯৮]

আলি ইবনু আবু তলেব রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন—

إنما قبلوا عقد الذمة ؛ لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا.

'তারা এ জন্য জিম্মি চুক্তি গ্রহণ করেছে যে, তাদের সম্পদও আমাদের সম্পদের মতো এবং তাদের জীবনও আমাদের জীবনের মতো নিরাপদ হবে।'[৯৯]

উল্লিখিত নীতির আলোকে ইসলামি ফকিহগণ স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলেছেন যে, মুসলিমদের ওপর আবশ্যক হলো, জিম্মিদের থেকে জুলুম প্রতিহত করবে এবং তাদেরকে রক্ষা করবে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান শাইবানি রহ. বলেন—

لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا من أهل دار الاسلام.

'কেননা মুসলিমগণ যখন তাদেরকে জিম্মি করে নিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে, তখন তাদের থেকে জুলুম প্রতিহতের দায়িত্ব নিয়েছে। এখন তারা ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসীর মতো হয়ে গেছে।'[১০০]

ফকিহগণ সর্বদা রাষ্ট্র পরিচালকদের এ কথার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন যে, তারা যেন জিম্মিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। তাদের দেখাশোনা করে। ইমাম আবু

[৯৮] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : মানাকেব, হাদিস : ৩০৫২।

[৯৯] বাদায়েউস সনায়ে, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১১১।

[১০০] শরহুর কাবির, ইমাম সারাখসি রহ. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪০।

ইউসুফ রহ. বাদশাহ হারুনুর রশিদকে অসিয়ত করেন এবং জিম্মিদের সম্পর্কে বলেন—

وقد ينبغي يا أمير المؤمنين!أيدك الله، أن تتقدم بالرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه و سلم والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم.

'হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন। আপনার হাতে সে জিম্মিরা রয়েছে, যারা আপনার নবি এবং আপনার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ছিলো। তাদের প্রতি লক্ষ রাখবেন, যেন তাদের প্রতি জুলুম করা না হয়, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া না হয় এবং তাদেরকে এমন কোনো কাজে বাধ্য করা না হয়, যার ক্ষমতা তাদের নেই।'[১০১]

ইমাম আওজায়ি রহ. যখন এ সংবাদ পেলেন যে, লেবানন উপত্যাকায় বসবাসরত জিম্মিরা আমিরুল মুমিনিন এর আনুগত্যের বাইরে চলে গেছে। তারা নিজেদের ব্যাপারে নতুন নীতি অবলম্বন করেছে। সে যুগে শামে আব্বাসি শাসকদের একজন শাসক সালেহ ইবনু আলি-এর রাজত্ব চলতো। সে লেবাননের জিম্মিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে ইমাম আওজায়ি রহ. একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। যেখানে শাসকের কাজের নিন্দা করা হয়। পত্রের বক্তব্য নিচের পেশ করা হলো—

وقد كان من أجلاء اهل الذمةمن أهل جبل لبنان، مما لم يكن تمالا عليه خروج من خرج منهم، ولم تطبق عليه جماعتهم، فقتل منهم طائفة، ورجع بقيتهم إلى قراهم، فكيف تؤخذ عامة بعمل الخاصة؟ فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟ وقد بلغنا أن من حكم الله عز وجل أنه لا يأخذ العامة بعمل الخاصة.... من كانت له حرمة في دمه فله في ماله،والعدل عليه مثلها، فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار.

'লেবাননের উপত্যাকায় বসবাসরত জিম্মিদেরকে দেশান্তরিত করা হয়েছে। অথচ তাদের মাঝে এমন অনেক জিম্মি রয়েছে, যারা আমিরুল মুমিনিন-এর আনুগত্য থেকে বের হয়নি। যারা তাদের জাতির সঙ্গে

[১০১] কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. পৃষ্ঠা : ২৫৭।

একমত পোষণ করেনি। অথচ তাদের একটি অংশকে হত্যা করা হয়েছে এবং অন্যদেরকে দেশান্তরিত করা হয়েছে। বিশেষ কিছু লোকের খারাপ কাজের কারণে সবাইকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া যায়? তাদেরকে তাদের বাড়ি ও সম্পদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মহান আল্লাহর বিধান হলো বিশেষ কিছু লোকের অপরাধের কারণে সবাইকে পাকড়াও করা যায় না। ...যার জীবনের নিরাপত্তা রয়েছে, তার সম্পদেরও নিরাপত্তা রয়েছে। জীবনের মতো সম্পদের ক্ষেত্রেও ইনসাফ করতে হবে। কেননা, তারা কোনো দাস নয় যে, তাদেরকে এক শহর থেকে অন্য শহরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। বরং তারা স্বাধীন মানুষ।'[১০২]

ইমাম আবু উবাইদ কাসেম ইবনু সাল্লাম রহ. এমন অনেক উদাহরণ পেশ করেছেন। যেগুলো অমুসলিম জিম্মিদের সঙ্গে মুসলিমদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার প্রমাণ বহন করে। তাদের সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলে। যদিও সেগুলো এমন সম্পদ হয়, যার ক্ষেত্রে সাধারণত মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি বা ব্যবহারের সুযোগ থাকে। সেখান থেকে আমরা কিছু উপমা দিচ্ছি।

১. আবু উমামা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমরা জিম্মিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের থেকে যব বা অন্য কোনো জিনিস নিতে পারবো কি না? উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, তাদের সঙ্গে চুক্তির কারণে তাদের কোনো জিনিস নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নেই। তবে তোমরা যে জিনিসের ব্যাপারে চুক্তি করবে সেটি নিতে পারবে।

২. ছ'ছ রহ. বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করি যে, আমরা জিম্মিদের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের থেকে কিছু নিতে পারবো কি না? তিনি রা. জিজ্ঞেস করেন, কোনো ধরনের মূল্য ছাড়াই নিতে চাও? আমি বলি, হ্যাঁ, মূল্য ছাড়া নিতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এমন জিনিসের ব্যাপারে তুমি কী বলো? আমি বললাম, আমরা এমন জিনিসকে

[১০২] কিতাবুল আমওয়াল, ইমাম আবু উবাইদ রহ. পৃষ্ঠা : ১৪৮।

হালাল মনে করি। সেগুলো ব্যবহারে আমরা কোনো সমস্যা মনে করি না। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বললেন, তোমরা তো এমন কথা বলছো, যা আহলে কিতাব বলেছিলো। কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে—

﴿لَيْسَ علينَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

'তারা বলে, অন্যায়ভাবে উম্মিদের (নিরক্ষরদের) সম্পদ ভক্ষণে আমাদের কোনো অপরাধ হবে না। তারা জেনে শুনেই আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।'[১০৩]

৩. তলহা ইবনু মুসররিফ রহ. বলেন, খালেদ ইবনু ওলিদ রা. বলেন, তিন শ্রেণির মানুষের ওপর কর্তৃত্ব চালাতে তিন পা পর্যন্ত সামনে বাড়বে না। জিম্মি এবং তার সম্পদ থেকে একটি সুঁই পরিমাণ সম্পদ নিয়ে তার সম্পদে কম করার ব্যাপারে তিন পা পরিমাণ সামনে বাড়বে না। আর ইমামুল মুসলিমিনকে ধোঁকা দিয়ে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রেও তিন পা পরিমাণ সামনে বাড়বে না।

৪. ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাসির রহ. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, সাদ রহ.-এর মাওলা আবু আবদুল্লাহ বলেন। অথবা আবু আবদুর রহমান বলেন, কে বলেছে এ ব্যাপারে আবু উবাদ রহ.-এর সন্দেহ হয়েছে। আমি সাদ রা.-এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলাম। একটি বাগানের কাছে পৌঁছালে রাতের অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে নেয়। অন্য হাদিসে এমন শব্দ এসেছে যে, কোনো এক জিম্মির বাগানের কাছে পৌঁছালে রাতের অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে নেয়। আমরা বাগানের মালিককে খুঁজলাম। কিন্তু মালিকের সন্ধান পেলাম না। তখন সাদ রা. বললেন, তুমি যদি এ কথায় সন্তুষ্ট থাকো যে, আগামিকাল কিয়ামতের দিনে তুমি মুসলিম হয়ে উঠবে, তাহলে কখনোই এই বাগানের কোনো কিছু ধরবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সারা রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছি। (কিন্তু বাগানের কোনো কিছুতে হাত দিইনি)

৫. ওলিদ ইবনু মুসলিম সাইদ ইবনু আবদুল আজিজ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু দারদা রা. জিম্মিদের কোনো এলাকায় আসলে বেশির

[১০৩] সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৭৫।

থেকে বেশি তাদের থেকে পানি পান করতেন এবং ছায়ায় ছায়াগ্রহণ করতেন আর তার বাহন (পশু) তাদের চারণভূমিতে চরে বেড়াতো। এ ছাড়া তাদের থেকে আর কিছু নিতেন না। আর যা নিয়েছেন সেগুলোর বিনিময়েও তাদেরকে কোনো জিনিস বা অর্থ দিয়ে দেওয়ার হুকুম দিতেন।

৬. ওলিদ বলেন, উসমান ইবনু আবু আতেকা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কোনো একদিন উবাদা ইবনু সামেত রা. 'দমর' নামক একটি গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটি 'গুত্বা' এলাকার অংশ ছিলো। তিনি তার দাসকে 'বারদি' নদীর কিনারার জমিন থেকে একটি মেসওয়াক আনতে বললেন। দাস ফিরে এলে তিনি বললেন। যাও, মেসওয়াকের মূল্য দিয়ে এসো। কেননা, অচিরেই সেটি শুকিয়ে যাবে এবং শুকিয়ে গেলে কাঠে পরিণত হবে। যা মূল্য দিয়ে কিনতে হয়।

৭. ওলিদ বলেন, ইমাম আওজায়ি রহ. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন। যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক এমন এক ব্যক্তিকে তিনি বলেছিলেন, কোনো ক্ষেত নষ্ট করবে না। ইমামের অনুমতি ছাড়া কোনো উঁচু স্থানেও উঠবে না। জিম্মিদের ঘাস নেওয়া থেকেও বিরত থাকবে। যেন এমন না হয় যে, পরবর্তী সময় তোমরা বলবে, আমরা তো নামাজি ছিলাম। (অর্থাৎ, তোমাদের আমল নষ্ট হওয়ার কারণে এ কথা বলবে) বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী সময় একজন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনিও তাকে এ কথাগুলোই বলেছিলেন।

৮. ওলিদ ইবনু মুসলিম খালেদ ইবনু এজিদ ইবনু মালিক রহ. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। একবার মুসলিমরা 'জাবিয়া' নামক স্থানে সফর করে। তাদের মাঝে উমর ইবনু খাত্তাব রা. ছিলেন। জিম্মিদের এক ব্যক্তি উমর ইবনু খাত্তাব রা.-এর কাছে এসে জানালো যে, সফরের লোকজন তার আঙুর বাগান খুব দ্রুত নষ্ট করছে। তিনি বেরিয়ে আসলে তার সাথীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হলো, যে ঢাল বহণ করে নিয়ে আসছে এবং তার ওপর আঙুর রয়েছে। উমর রা. তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিও! (অর্থাৎ, তুমিও আঙুর ছেড়া দলের অন্তর্ভুক্ত?) উত্তরে সে বললো, আমাদের ক্ষুধা লেগেছে। উমর রা. ফিরে এসে আঙুরের মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

একবার উমর রা. ভিক্ষারত এক বৃদ্ধ ইহুদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার হাত ধরে বাড়িতে আনলেন এবং নিজের সম্পদ থেকে তাকে কিছু সম্পদ দিলেন। এরপর তাকে বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে বললেন, তাকে এবং ট্যাক্স দাতাদের দেখো! আল্লাহর কসম! তার যৌবন কালে আমরা যদি তার ট্যাক্স নিয়ে থাকি। আর বার্ধক্যের সময় তাকে অপদস্ত করি। তাহলে আমরা ইনসাফ করিনি। এই সকল দান-সদকা তো ফকির, মিসকিনদের জন্য। মুসলিম তো ফকিরদের অন্তর্ভূক্ত, আর এই জিম্মি হলো আহলে কিতাব। যে মিসকিনদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর তিনি তার থেকে ট্যাক্স মওকুফ করে দেন।[১০৪]

ভিন্ন দেশের অমুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ ও যুদ্ধহীন অবস্থায় সম্পর্কের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

নিরাপদ পরিস্থিতিতে অমুসলিম দেশের সঙ্গে সম্পর্ক

অমুসলিম দেশের সঙ্গে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি করা যদি মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী না হয়, তাহলে কুরআনের মাধ্যমেই সেটি শরিয়ত-সম্মত এবং জায়েজ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾

'তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তাহলে আপনিও সন্ধি করুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।'[১০৫]

যুদ্ধহীন অবস্থায় এ সন্ধি ন্যায়, সমতা, সহমর্মিতা, ভালো কাজে সহযোগিতা এবং খারাপ কাজ প্রতিহত করার ভিত্তিতে হতে পারে।

---

[১০৪] কিতাবুল খারাজ ২৫৯-২৬০।

[১০৫] সুরা আনফাল, আয়াত : ৬১।

১. ন্যায় ও ইনসাফ

ন্যায় ও ইনসাফের সম্পর্কটি সর্বদা সব মুসলিম থেকে প্রত্যাশিত। মহান আল্লাহ বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা ইনসাফের ওপর অটল থাকো এবং সন্তুষ্টিচিত্তে আল্লাহর জন্য সাক্ষী দাও। যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিপক্ষে হয়।'[১০৬]

অন্য একটি আয়াতে এ আয়াতের বাণীর ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোনো জাতির সঙ্গে ক্রোধ ও শত্রুতা যেন মুসলিমদেরকে তাদের সঙ্গে ন্যায় ও ইনসাফের ব্যবহার করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

'হে ইমানদারগণ, মহান আল্লাহর জন্য তোমরা সত্যের ওপর অটল থাকো। সত্য ও ইনসাফের সঙ্গে সাক্ষীদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। কোনো জাতির সঙ্গে শত্রুতা তোমাদেরকে যেন ন্যায় বর্জনে উদ্বুদ্ধ না করে। ইনসাফ করো, ইনসাফ তাকওয়ার নিকটবর্তী করে দেয়।'[১০৭]

মহান আল্লাহ একটি বিশেষ গুণের সঙ্গে এ কথার তাকিদ দিয়েছেন যে, ন্যায় ও ইনসাফ সব মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। এমনকি সেসব অমুসলিমদের সঙ্গে ইনসাফের ব্যবহার করতে হবে, যারা মুসলিমদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। মহান আল্লাহ বলেন—

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾

'যারা তোমাদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাঁধা দিয়েছিলো, তাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে উদ্বুদ্ধ না করে।'[১০৮]

---

[১০৬] সুরা নিসা, আয়াত : ১৩৫।

[১০৭] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৮।

[১০৮] সুরা মায়িদা, আয়াত : ২।

উল্লিখিত আয়াতে মুসলিমদেরকে সেসব কাফেরদের ওপর বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে, যারা মুসলিমদেরকে মসজিদে হারামে যেতে এবং উমরা করতে বাঁধা দিয়েছিলো কিন্তু তাদের সঙ্গে যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়ে গেলো, তখন সেসব কাফেরদেরকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হলো। অথচ ইতোপূর্বে তারা মুসলিমদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করেছে। মুসলিমরা যে বাড়াবাড়ির ইচ্ছে করেছিলো সেটি থেকে কাফেরদের বাড়াবাড়ি কয়েকগুণ বেশি ছিলো।

অমুসলিমদের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, ওয়াদা রক্ষা করা এবং সন্ধির শর্তাবলির অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ্ বলেন—

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

'তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ করো। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[১০৯]

ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে কুরআন মাজিদের অনেক আয়াত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক হাদিস রয়েছে। এ বিধানটি কেবলমাত্র কিতাবের পাতায় সীমাবদ্ধ না। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র জীবনে এবং তাঁর সাহাবিগণ রা. ও পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখেছেন যে, অন্য কোনো জাতির মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

হুজাইফা ইবনু ইয়েমেন রা. তার পিতা ইয়েমেন রা.-এর সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে মদিনার পথে রওনা করেন। তখন কুরাইশদের কাফেররা তাদেরকে গ্রেফতার করে। তাদের থেকে তারা এ ওয়াদা নেওয়া ছাড়া তাদেরকে ছাড়েনি যে, মদিনাতে গিয়ে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদ করবে না। সুতরাং ওয়াদা অনুযায়ী তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা মদিনায় পৌঁছালো সেসময় বদর যুদ্ধেরও প্রস্তুতি চলছিলো। তারা চাইলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে শরিক হবেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন—

﴿انصرفا نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم﴾

[১০৯] সুরা : বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩৪।

'তোমরা দুজন ফিরে যাও। আমরা তাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবো এবং তাদের বিপক্ষে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবো।'[১১০]

একদিকে বদর যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিলো, যেখানে মুসলিমগণ তাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির বেশি মুখাপেক্ষী ছিলেন। ইমানের পর সব থেকে বড়ো সৌভাগ্য মনে করা হয় বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে যা সাহাবিগণ রা. অর্জন করেছিলেন। আর অন্য দিকে হুজাইফা রা.ও তার পিতা ইয়েমেন রা. থেকে মক্কার কাফেররা যে ওয়াদা নিয়েছিলো, সেটি ছিলো তরবারির মাথায় বাধ্য করে নেওয়া। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুজনের জন্য বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফজিলত থেকে বঞ্চিত হওয়াকে পছন্দ করলেন। তবে এটি পছন্দ করলেন না যে, তাঁর সাহাবিদের মধ্যে কারও দিকে এমন কথা সম্পৃক্ত করা হবে যে, সে কাফেরদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

সুলাইম ইবনু আমের রা. থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া ও রোমকদের মাঝে একবার যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়। সেই যুদ্ধ বিরতির সময়েই মুয়াবিয়া রা. রোমকদের এলাকায় যান। যেন সময় শেষ হওয়ার সঙ্গেই তাদের ওপর হামলা করা যায়। এমন সময় পেছন থেকে এক ব্যক্তি ঘোড়া বা খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়ে দ্রুত গতিতে আসে এবং উঁচু আওয়াজে বলতে থাকে। 'الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر' মুসলিমদের কাজ হলো ওয়াদা ঠিক রাখা, গাদ্দারি নয়। মুয়াবিয়া রা.-এর সৈন্যগণ দেখলো যে, সে আগন্তুক হলো আমর ইবনু আবাসা রা.। মুয়াবিয়া রা. তাকে নিজের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। কী হয়েছে? তিনি বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

من كان بينه وبين قومه عهد، فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء.

'যারা কোনো জাতির সঙ্গে সন্ধি করে, সন্ধির সময় শেষ হওয়ার আগে অথবা উল্লিখিত সন্ধিচুক্তি তাদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া তারা উল্লিখিত সন্ধি ভঙ্গ করবে না'[১১১]

মুয়াবিয়া রা. উল্লিখিত হাদিস শুনে ফিরে আসেন। তিনি সন্ধি চুক্তি শেষ হওয়ার আগে যুদ্ধ শুরু করেননি। বরং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শত্রুর

[১১০] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৭৪০।

[১১১] সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : জিহাদ, হাদিস : ২৪৫৯।

এলাকার দিকে যাত্রা করেছিলেন এবং সন্ধির সময় শেষ হওয়ার পর যুদ্ধ করার ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু আমর ইবনু আবাসা রা. এটিকে গাদ্দারি বললেন। ইমাম খাত্তাবি রহ. বলেন—

ويشبه أن يكون عمرو إنما كره مسيرة معاوية إلى ما يتاخم بلاد العدو، والاقامة بقرب دارهم من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة، وهو مقيم في وطنه، فقد صارت مدة مسيرة بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا يغذوهم فيها، فيأمنونه على أنفسهم، فإذا كان مسيره إليهم في أيام الهدنة حتى ينيخ بقرب دارهم، كان ايقاعه بهم قبل الوقت الذي يتوقعونه، فكان ذلك داخلا عند عمرو في معني الغدر.

'সম্ভবত আমর ইবনু আবাসা রা. মুয়াবিয়া রা.-এর শত্রুদের শহরের দিকে যাত্রা করা এবং কাফেরদের এলাকার কাছে অবস্থানকে এ কারণে অপছন্দ করেন যে, তার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি হয়েছিলো। যে সময় পর্যন্ত তিনি নিজ এলাকায় অবস্থান করবেন। তাই সন্ধির সময় শেষ হওয়ার পর নতুন করে সফর করার সময়ও যেন সন্ধির নির্দিষ্ট সময়ের আওতাভুক্ত ছিলো। তাই উল্লিখিত সময়ে কাফেররা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে নিরাপদ ছিলো। কিন্তু মুয়াবিয়া রা. যখন সন্ধি চুক্তির সময়ের মধ্যেই নিজ এলাকা থেকে সফর শুরু করেছেন এবং শত্রুদের এলাকার কাছে গিয়ে তাঁবু গেড়েছেন তাই কেমন যেন শত্রুদের নিরাপদ সময়ের মধ্যে তিনি হামলা করে বসেছেন। বিধায় আমর ইবনু আবাসা রা.-এর কাছে এটি গাদ্দারি বলে মনে হয়েছে।'[১১২]

ইমাম আবু উবাইদ রহ. বলেন—

قال يزيد:لم يرد معاوية أن يغير عليهم قبل انقضاء المدة، ولكنه أراد أن تنقضي وهو في بلادهم، فيغيرعليهم وهو غارون، فانكر ذلك عمرو بن عبسة، الا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم ويخبرهم أنه يريد غزوهم.

'ইয়াজিদ রহ. বলেন, মুয়াবিয়া রা. সন্ধির সময় শেষ হওয়ার আগে হামলা করার ইচ্ছে করেননি। বরং তার ইচ্ছে ছিলো, সময় শেষ হওয়ার

[১১২] মাআলেমুস সুনান, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬৪।

মুহূর্তে তিনি নিজ এলাকায় থাকবেন এবং উদাসীন অবস্থায় তাদের ওপর হামলা করবেন। এমতাবস্থায় আমর ইবনু আবাসা রা. তাদেরকে অবহিত করা ছাড়া তাদের এলাকায় প্রবেশ করা এবং হামলা করাকে অপছন্দ করেন।'[১১৩]

মুয়াবিয়া রা. উল্লিখিত ঘটনায় যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পৃথীবির যুদ্ধের ইতিহাসে কোনো জাতির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সন্ধির সময় শেষ হওয়ার পর হঠাৎ হামলা করে তিনি যে পরিমাণ এলাকা দখল করে নিয়েছিলেন, সেটিকে বিজয়কৃত এলাকা থেকে বাদ দিলেন। শত্রুদের এলাকায় প্রবেশ করা এবং তাদের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করার পরেও সেখান থেকে ফিরে যান। আর এসব কিছু হয়েছিলো একটি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তের আলোকে। যেটিকে আমর ইবনু আবাসা রা. পেশ করেছিলেন। সেটি হলো তাকওয়া ও সতর্কতার সীমালঙ্ঘন না করা। অন্যথায় সঠিক কথা হলো, সন্ধির সময়ে শত্রুদের এলাকার দিকে রওনা করা সন্ধিচুক্তি বহির্ভূত না। যতক্ষণ তারা মুসলিমদের এলাকায় থাকবে, শত্রুর এলাকায় প্রবেশ করবে না। তারপরও মুয়াবিয়া রা. সেখানে যুদ্ধ করা থেকে এমন সময় হাত গুটিয়ে নেন যে মুহূর্তে যুদ্ধ করলে শত্রুকে আয়ত্বে আনা এবং বিজয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিলো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ওয়াদা ও অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন, সেটিকে কেবলমাত্র শব্দে লিখিত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং তার মধ্যে এমন সব ওয়াদা ও অঙ্গীকারও ছিলো, যা লিখিতভাবে শত্রুদের সঙ্গে করা হয়নি। তবে সামাজিক দৃষ্টিতে বা সময়ের দাবিতে কাঙ্ক্ষিত ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

এমন ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা হলো আবু রাফে রা.-এর ঘটনা। যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত দাস ছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণের আগে কুরাইশরা তাকে তাদের একটি পত্র দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠায়। সে পত্রটি নিয়ে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। উল্লিখিত পত্রের ভাষা ছিলো এমন—

بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أُلْقِيَ فِي قَلْبِيَ الإِسْلاَمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ

[১১৩] কিতাবুল আমওয়াল, ইমাম আবু উবাইদ রহ. পৃষ্ঠা : ১৭৬।

اللهِ إِنِّى وَاللهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَيهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنِّى لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِى نَفْسِكَ الَّذِى فِى نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ . قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِىَّ . صلى الله عليه وسلم- فَأَسْلَمْتُ.

'কুরাইশরা আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালো। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখামাত্র আমার অন্তরে ইসলাম জায়গা করে নিলো। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এখন কোনোভাবেই ওই কাফেরদের কাছে ফিরে যাবো না। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ওয়াদা ভঙ্গ করবো না। দূতকে আমার কাছে আটকিয়ে রাখবো না। তবে তুমি ফিরে যাও। সেখানে যাওয়ার পর তোমার অন্তরে যদি এখনকার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাহলে ফিরে এসো। তিনি বলেন, আমি তখন ফিরে গেলাম এবং পুনরায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম।'[১১৪]

লক্ষ করুন! এই ঘটনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার প্রতি রাজি হলেন না যে, কাফেররা আবু রাফে রা.-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করার পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে থেকে যাক। কেননা, মানুষ তার ফিরে যাওয়ার প্রতিক্ষায় রয়েছে। ইমাম খাত্তাবি রহ. বলেন—

قوله (لا احبس البرد) فقديشبه أن يكون المعني في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابا، والجواب لا يصل إلى المرسل الا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه. والله أعلم.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা যে, (দূতকে আমার কাছে আটকে রাখবো না) এ অর্থে যে, পত্র উত্তরের দাবি করে থাকে। আর পত্র প্রেরকের কাছে দূতের মাধ্যমে তার ভাষাতেই পৌঁছায়। কেমন যেন ওই দূতকে পত্র নিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসার একটি সন্ধি হয়ে গেছে। (এখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আটকে

[১১৪] সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : জিহাদ, হাদিস : ২৭৬০।

রাখেন, তাহলে কেমন যেন তিনি উল্লিখিত চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। এ কারণে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন) আল্লাহ ভালো জানেন।[১১৫]

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সতর্কতার প্রতি লক্ষ করুন যে, যুদ্ধহীন অবস্থাতেও তিনি অমুসলিমদেরকে ধোঁকা দেওয়া ও ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

২. সহমর্মিতা

যুদ্ধহীন অবস্থায় অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের ব্যবহার কেবলমাত্র ন্যায়, ইনসাফ ও ওয়াদা পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। বরং সেটি সহমর্মিতা এবং অনুগ্রহ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। কুরআন মাজিদে বর্ণিত হচ্ছে—

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

'দীনকে কেন্দ্র করে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ায়নি এবং তোমাদেরকে দেশান্তরিত করেনি, তাদের সঙ্গে ভালো ও ইনসাফের ব্যবহার করতে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চয় মহান আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।'[১১৬]

সহিহ হাদিসে বর্ণিত এমন একটি ঘটনা রয়েছে। একবার মক্কার কাফেরদের মাঝে কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যে কারণে তারা পশুর হাড় ও চামড়া খেতে বাধ্য হয়। আবু সুফিয়ান রা. তখন পর্যন্ত মুসলিম হননি। তিনি মদিনাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ, তোমার স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ সরানোর ব্যাপারে তুমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। যার বরকতে বৃষ্টি হয় এবং দুর্ভিক্ষের মুসিবত দূর হয়।

আসমা বিনতু আবু বকর রা. বলেন—

---

[১১৫] মাআলিমুস সুনান, খাত্তাবি রহ.খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬৩।

[১১৬] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮।

قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلى أمك.

'আমার মা তার ছেলেকে নিয়ে মুশরিক অবস্থায় এমন সময় আমার কাছে আসেন, যখন কুরাইশ ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সন্ধি ছিলো। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আমার মা ইসলাম থেকে বিমুখ অবস্থায় আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান শাইবানি রহ. 'আস সিয়ারুল কাবির'-এ বলেন—

عن أبي مروان الخزاعي قال : قلت لمجاهد : رجل من أهل الشرك بيني وبينه قرابة ولي عليه مال أدعه له قال : نعم وصله وبه نأخذ فنقول : لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريباً كان أو بعيداً محارباً كان أو ذمياً لحديث سلمة بن الأكوع قال : صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت مس كف بين كتفي فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل أنت واهب لي ابنة أم قرفة قلت : نعم فوهبتها له فبعث بها إلى خاله حزن بن أبي وهب وهو مشرك وهي مشركة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة فقبل ذلك أبو سفيان وأبي صفوان وقال : ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شبابنا

'আবু মারওয়ান খুজায়ি রহ. বলেন, একবার আমি মুজাহিদ রহ.-কে বললাম, আমার সঙ্গে একজন মুশরিকের বন্ধুত্ব রয়েছে। তার কাছে আমার কিছু সম্পদ আমানত রয়েছে। আমি কি সেই সম্পদ তার জন্য ছেড়ে দেবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। এটিই আমাদের মতামত। সুতরাং কোনো মুসলিম যদি কোনো কাফেরের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখে। চাই সে নিকটাত্মীয় বা দূরের,

অথবা কাফের রাষ্ট্রের বা জিম্মি হোক। এর দলিল হলো, সালমা ইবনু আকওয়া রা.-এর হাদিস। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ি। নামাজ শেষে আমার কাঁধে একজনের হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে উম্মে কুরফার মেয়ে হাদিয়া দিতে চাচ্ছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। মেয়েটি তাকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বাচ্চাটিকে তার মামা হুজন ইবনু আবু ওহাব-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। হুজন ইবনু আবু ওহাব ও ওই শিশু উভয়ে তখন মুশরিক ছিলো। মক্কায় দুর্ভিক্ষের বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পাঁচশো দিনার পাঠিয়ে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব এবং সফওয়ান ইবনু উমাইয়াকে দিতে বলেন। যেন সেগুলোকে মক্কার কাফেরদের মাঝে বণ্টন করে দেয়। আবু সুফিয়ান উল্লিখিত দিনারগুলো গ্রহণ করলো। কিন্তু সফওয়ান ইবনু উমাইয়া সেটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। সেইসঙ্গে সে এ কথা বললো যে, এটির মাধ্যমে মুহাম্মাদ আমাদের যুবকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে।'[১১৭]

ইসলামি ইতিহাসে এমন অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার সবগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। উপরে আমরা যেসব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, সেগুলো এ কথার দলিল যে, কুফর ও শিরকের প্রতি অসন্তুষ্টি মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের সঙ্গে সৎব্যবহার ও সহমর্মিতা পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করে না। বরং অমুসলিমদের সঙ্গে সৎব্যবহার ও সহমর্মিতাকে উত্তম চরিত্র বলে গণ্য করা হয়। যার পূর্ণতা দিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. ভালো কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করা

অনুরূপভাবে কুফর ও শিরকের প্রতি মুসলিমদের ঘৃণা থাকার পরও তা তাদেরকে এ কথার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না যে, তারা অমুসলিমদের সঙ্গে ন্যায় ও ইনসাফ বজায় রাখতে একে অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত না করে

[১১৭] শরহু সিয়ারিল কাবির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৯।

হাত গুটিয়ে নেবে। এবং অত্যাচার ও অপরাধ দূর করতে, দুর্বল, অসহায়দের সহযোগিতা থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেবে। বরং ভালো ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করা শরিয়তে ইসলামির ওইসব মৌলিক বিষয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়, যার ব্যাপারে কুরআন মাজিদ নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং কাফেরদের ওপর জুলুম ও সীমালঙ্ঘন না করার ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ, সম্মানিত মাস, কুরবানির পশু, কুরবানির পশুর গলায় ঝুলানো হার এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যারা মসজিদে হারামে নিরাপদে অবস্থান করছে, তাদেরকে (হত্যার জন্য) হালাল করে নিয়ো না। এবং তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পরে শিকার করো। কোনো সম্প্রদায় তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে আসতে বাঁধা দেওয়ার কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। আর পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও উৎপীড়নের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠিন।'[১১৮]

মুফাসসিরগণের বর্ণনা অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াত নাজিলের কারণ হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর মক্কার কাফেররা যখন সাহাবিদেরকে ওমরা করতে বাধা দেয় তখন অনেক মুসলিম তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো। কারণ তারা সন্ধির সময়ে ওমরা করতে বাঁধা দিয়েছিলো। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয় এবং তাদেরকে প্রতিশোধ নিতে বাধা দেওয়া হয়। সুতরাং এ আয়াত এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আয়াতে বর্ণিত সহযোগিতার আওতায় অমুসলিমদের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। বরং আয়াতটি তাদের আলোচনাতেই নাজিল হয়েছে।

---

[১১৮] সূরা : মায়িদা, আয়াত : ২।

সুতরাং যদি কোনো অমুসলিমের কাছে মানবিক উন্নয়নের এমন কোনো আমল বা পদ্ধতি থাকে, যাতে ইসলামি শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো কথা না থাকে তাহলে মুসলিমদের জন্য সে আমলে বা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে অমুসলিমদের সঙ্গে সহযোগিতা করা উত্তম। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হিলফুল ফুজুল' সংগঠনে অমুসলিমদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে এ কথা প্রমাণ করেন।

বনু হাশেমের জন্য 'হিলফুল ফুজুল' বড়ো একটি গর্বের বিষয় ছিলো। সেই সংগঠনের আগে আরববাসী বংশীয় ও গোত্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অন্যের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো। এক বংশ অন্য বংশের সঙ্গে এমন চুক্তি করতো যে, আমরা হকের ওপর থাকি বা বাতিলের ওপর চোখ বন্ধ করে পরস্পরকে সহযোগিতা করবো। 'হিলফুল ফুজুল' হলো প্রথম সংগঠন, যার মাধ্যমে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে একে অন্যকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে তারা চুক্তিবদ্ধ হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা জুবায়ের ইবনু আবদুল মুত্তালিব-এর দাওয়াতে আবদুল্লাহ ইবনু জাদআন-এর বাড়িতে বনু হাশেম, জুহরা ও তাইম গোত্রের নেতারা সমবেত হন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিলো বিশ বছর। সেখানে ওই গোত্রের নেতারা মহান আল্লাহর নামে এ কথার ওপর চুক্তি করে যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সমুদ্রে একটি পশম পরিমাণ তরলতা থাকবে এবং একে অন্যকে সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই অবশ্যই নির্যাতিত ব্যক্তির পাশে দাঁড়াবো। এমনকি তার অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা তার পাশে থাকবো।'

জুবায়ের ইবনু মুতইম রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

ما أحب أن لي بحلف حضرته ابن جدعان حمر النعم، وأني أغدر به، هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة، ولو دعيت به لأجبت.

'এ কথা পছন্দ করি না যে, ইবনু জাদআন-এর বাড়িতে যে ওয়াদা করা হয়েছিলো, লাল উটের বিনিময়ে আমি সেটি ভঙ্গ করবো। বনু হাশেম, জুহরা ও তাইম পরস্পর এ চুক্তি করেছিলো যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নির্যাতিত ব্যক্তির পাশে থাকবে, যতক্ষণ সমুদ্রে একটি পশমের মাথা

পরিমাণ পানি থাকবে। দ্বিতীয় বার যদি আমাকে এমন চুক্তির জন্য আহ্বান করা হয়, তাহলে আমি তাতে সাড়া দেবো।'[১১৯]

হুমাইদি রহ. আবু বকর রা.-এর দু-ছেলে মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণনা করেন। তারা দুজনে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الاسلام لاجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلوما.

'আবদুল্লাহ ইবনু জাদআন-এর বাড়িতে শপথ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলাম। ইসলাম আসার পরেও আমাকে যদি এমন শপথের জন্য আহ্বান করা হয়, তাহলে আমি সাড়া দেবো। সেখানে মানুষেরা এ কথার ওপর শপথ করেছিলো যে, অতিরিক্ত সম্পদ তার মালিকের কাছে পৌঁছে দেবে। আর নির্যাতিত ব্যক্তির ওপর নির্যাতনকারীকে সম্মান দেবে না।'[১২০]

ইমাম হাকেম রহ. তার রচিত 'মুস্তাদরাকে' আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. থেকে নিচের শব্দে হাদিস বর্ণনা করেন—

شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين فما يسرني أن لي حمر النعم و أني أنكثه.

'আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. বলেন, ছোটোকালে আমি আমার চাচার সঙ্গে মুত্তালিবদের শপথে উপস্থিত ছিলাম। এটি আমাকে আনন্দ দেবে না যে, লাল উটের বিনিময়ে আমি সে পশথ ভঙ্গ করবো।'[১২১]

হাফেজ ইবনু কাসির রহ. বলেন, 'মুতাইয়িবিনদের শপথ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'হিলফুল ফুজুল'-এর শপথ। আর 'মুতাইয়িবিনদের শপথ' নামে যেটি প্রসিদ্ধ আছে, সেটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে হয়েছিলো।[১২২]

মোটকথা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হিলফুল ফুজুল'-এর শপথে

---

[১১৯] তাবাকাতে সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৮-১২৯।
[১২০] সিরাতে নববিয়া, ইবনু কাসির রহ. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২।
[১২১] মুস্তাদরাকে হাকেম, অধ্যায় : মানাকিব, হাদিস : ২৮৭০।
[১২২] সিরাতে নববিয়া, ইবনু কাছির রহ. খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৫৮।

উপস্থিতি এবং ইসলামি যুগে সেটির স্বীকারোক্তি অনেক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুহাইলি রহ. বলেন—

وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب، وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصي بن وائل وكان ذا قدر بمكة وشرف فحبس عنه حقه فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف: عبد الدار ومخزوما وجمح وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاصي بن وائل وزبروه أي انتهروه فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فصاح بأعلى صوته :

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... ببطن مكة نائي الدار والنفر
ومحرم أشعث لم يقض عمرته... يا للرجال وبين الحجر والحجر
إن الحرام لمن تمت كرامته... ولا حرام لثوب الفاجر الغدر.

'হিলফুল ফুজুল হলো আরবদের মধ্যে সব থেকে মর্যাদাপূর্ণ ও তাৎপর্যময় শপথ। উল্লিখিত শপথের ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কথা বলেছে এবং দাওয়াত দিয়েছে, সে হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা জুবায়ের ইবনু আবদুল মুত্তালিব। এই শপথের কারণ হলো, 'জুবায়েদ' বংশের জনৈক ব্যক্তি ব্যবসার মাল নিয়ে মক্কায় আসে। আস ইবনু ওয়ায়েল তার থেকে কিছু ক্রয় করে। মক্কাতে সে ক্ষমতাশীল ও বড়ো মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলো। আস ইবনু ওয়ায়েল বিক্রেতার অর্থ দিতে চাইলো না। 'জুবায়েদ' বংশের লোকটি তাদের বন্ধু আবদুদ দার, মাখজুমি, জুমাহ, সাহাম ও আদি ইবনু কাব-এর কাছে সাহায্য চাইলো। তারা সবাই আস ইবনু ওয়ায়েলের বিপক্ষে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালো। একইসঙ্গে তাকে বকা দিয়ে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলো। 'জুবায়েদ' বংশের লোকটি যখন এই দুঃসাহস দেখলো, তখন সন্ধ্যার সময় 'আবু কুবাইস' পাহাড়ে আরোহন করলো। তখন কুরাইশরা একটি মিটিং এ কাবা ঘরের কাছে বসে ছিলো। তাই ওই ব্যক্তি উঁচু আওয়াজে নিচের কবিতাগুলো পাঠ করে।

হে ফেহের বংশের মানুষ! এমন ব্যক্তির সহযোগিতায় এগিয়ে এসো,

যে মক্কা উপত্যকা থেকে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং নিজের আবাস ভূমি ও পরিবার থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

যে বঞ্চিত, বিক্ষিপ্ত এবং এখন পর্যন্ত তার বয়স পূর্ণ হয়নি। হে ওইসব মানুষ! যারা পাথরের মাঝে বসবাস করে।

নিঃসন্দেহে হারাম শরিফের মর্যাদা এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি। তবে প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য কোনো নিরাপত্তা নেই।'[১২৩]

فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب، وقال ما لهذا مترك فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار ابن جدعان، فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام قياما، فتعاقدوا، وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسا حراء وثبير مكانهما، وعلى التأسي في المعاش فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاصي بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه.

'জুবায়ের ইবনু আবদুল মুত্তালিব দাঁড়িয়ে বললেন, এমন কে আছে, যে এই মাজলুমের সাহায্য করবে? তার আওয়াজে বনু হাশেম, জুহরা, তাইম ইবনু মুররা ইবনু জাদআনের বাড়িতে জমা হলো। সে তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করলো এবং হারাম মাসে তথা জিলকদ মাসে তারা দাঁড়িয়ে শপথ নিলো এবং আল্লাহর নামে তারা পরস্পর এই অঙ্গীকার করলো যে, তারা জালেমের বিপক্ষে মাজলুমের সাহায্যে এক হাতের মতো থাকবে। যতক্ষণ সমুদ্রে একটি পশম পরিমাণ তরলতা থাকবে। তারপরও তারা মাজলুমের অধিকার আদায় করে দেবে। কুরাইশরা এই শপথকে 'হিলফুল ফুজুল'-এর শপথ বলে নামকরণ করে। তারপর তারা বললো, এই সব ব্যক্তি একটি ভালো কাজে একমত হয়েছে। এরপর তারা আস ইবনু ওয়ায়েলের কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে 'জুবায়েদ' বংশের লোকটির সম্পদ নিয়ে তা তাকে ফিরিয়ে দেয়।'[১২৪]

---

[১২৩] রওজুল উনুফ, আল্লামা সুহাইলি রহ. খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬।

[১২৪] রওজুল উনুফ, আল্লামা সুহাইলি রহ. খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬।

জুবায়ের ইবনু আবদুল মুত্তালিব উল্লিখিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিচের কবিতাগুলো আবৃত্তি করে।

إن الفضول تعاقدوا، وتحالفوا ... ألا يقيم ببطن مكة ظالم
أمر عليه تعاقدوا، وتواثقوا ... فالجار والمعتر فيهم سالم

'সম্মাণিত ব্যক্তিগণ পরস্পর অঙ্গিকার করেছে এবং কসম খেয়েছে যে, মক্কা উপত্যকায় কোনো জালেম থাকবে না।

এটি এমন বিষয়, যার ওপর তারা অঙ্গীকার করেছে এবং শপথ করেছে। সুতরাং আশ্রয় গ্রহণকারী এবং মুসাফির এই উপত্যকায় নিরাপদ ও সংরক্ষিত।'[১২৫]

ওই শপথকে 'হিলফুল ফুজুল'-এর শপথ বলে নাম করণের বিষয়ে সুহাইলি রহ.-এর বক্তব্য ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এ কথা রয়েছে যে, শপথ গ্রহণকারীরা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজের জন্য একত্রিত হয়েছিলো। (এ কারণে তাকে সম্মানিত শপথ বলে নামকরণ করা হয়েছে) তবে ইবনু কুতাইবা রহ. দ্বিতীয় একটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

كان قد سبق قريشا إلى مثل هذا الحلف جرهم في الزمن الأول فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم، أحدهم: الفضل بن فضالة، والثاني: الفضل بن وداعة، والثالث: فضيل بن الحارث. (هذا قول القتبي. قال الزبير: الفضيل بن شراعة والفضل بن وداعة، والفضل بن قضاعة) فلما أشبه حلف قريش الآخر فعل هؤلاء الجرهميين سمي حلف الفضول والفضول جمع فضل وهي أسماء أولئك الذين تقدم ذكرهم. وهذا الذي قاله ابن قتيبة.

'এ ধরনের শপথের ব্যাপারে কুরাইশদের অগ্রে চলে গেছে জুরহুম গোত্র। জুরহুম গোত্রের তিনব্যক্তি পরস্পর শপথ করে। আর অন্যান্যরা তাদের অনুসরণ করে। সে তিনজন হলো, ফজল ইবনু ফাজালা। ফজল ইবনু ওদাআ। ফুজাইল ইবনু হারিসা।... কুরাইশদের এই শপথ যখন জুরহুম গোত্রের লোকদের কসমের সঙ্গে সাদৃশ্য হলো তখন সেটিকে

[১২৫] রওজুল উনুফ, আল্লামা সুহাইলি রহ. খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬।

'হিলফুল ফুজুল' নামকরণ করা হলো। ফুজুল হলো 'ফজল'-এর বহুবচন। এটি ওইসব লোকদের নাম, যাদের আলোচনা উপরে চলে গেছে। সুহাইলি রহ. এমনটি উল্লেখ করেন। এরপর বলেন, ইবনু কুতাইবা রহ. যেটি উল্লেখ করেছেন, এটি সুন্দর।'[১২৬]

পরবর্তী সময়ে 'হিলফুল ফুজুল' একটি মূল ভিত্তিতে রূপ নেয় যাকে দলিল ও প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী সময়ে সেটিকে স্বীকৃতি দেন এবং ইসলাম প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি বলেন—

ولو دعيت به لأجبت.

'ইসলামের যুগেও আমাকে যদি এমন অঙ্গীকার এবং কসমের প্রতি আহ্বান করা হয়, তাহলে অবশ্যই আমি সাড়া দেবো।' এ কারণে অনেকে উল্লিখিত ঘটনার মাধ্যমে দলিল দিয়েছে এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতি আহ্বান করা হলে, তারা এগিয়ে এসেছে। সুহাইলি রহ. হিলফুল ফুজুলের নীতি সম্পর্কে বলেন—

وإن كان الإسلام قد رفع ما كان في الجاهلية من قولهم يا لفلان عند التحزب والتعصب وذلك أن الله عز وجل جعل المؤمنين إخوة ولا يقال إلا كما قال عمر رضي الله عنه يا لله ويا للمسلمين لأنهم كلهم حزب واحد وإخوة في الدين إلا ما خص الشرع به أهل حلف الفضول والأصل في تخصيصه قوله . صلى الله عليه وسلم . «ولو دعيت به اليوم لأجبت» يريد لو قال قائل من المظلومين يا لحلف الفضول لأجبت، وذلك أن الإسلام إنما جاء بإقامة الحق ونصرة المظلومين فلم يزدد به هذا الحلف إلا قوة وقوله عليه السلام «وما كان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة» ليس معناه أن يقول الحليف يا لفلان لحلفائه فيجيبوه، بل الشدة التي عنى رسول الله . صلى الله عليه وسلم . إنما هي راجعة إلى معنى التواصل والتعاطف والتآلف، وأما دعوى الجاهلية فقد رفعها الإسلام إلا ما كان من حلف الفضول كما قدمنا، فحكمه باق والدعوة به جائزة.

'ইসলাম যদিও জাহেলি যুগের সবকিছুকে শেষ করে দিয়েছে যেমন দলবন্দি বা বংশীয় হঠকারীতার শিকার হয়ে আরবদের এ কথা বলা,

[১২৬] রওজুল উনুফ, আল্লামা সুহাইলি রহ. খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬।

'হে অমুক'।...কেননা মহান আল্লাহ সব মুমিনকে ভাই ভাই করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন ওই বাক্য বলা যাবে, যা উমর রা. বর্ণনা করেছেন। আর সেটি হলো, 'يا لله ' 'يا للمسلمين' কেননা সব মুসলিম এক জাতি এবং দীনের দৃষ্টিতে একে অন্যের ভাই। কিন্তু 'হিলফুল ফুজুল' এ অংশ গ্রহণকারীদেরকে শরিয়ত বিশেষভাবে বিশেষিত করেছে। তাদেরকে বিশেষিত করার কারণ হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী। তিনি বলেন, ولو دعيت به لأجبت.'ইসলামের যুগেও আমাকে যদি এমন অঙ্গীকার এবং কসমের প্রতি আহ্বান করা হয়, তাহলে অবশ্যই আমি সাড়া দেবো।' তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, কোনো ব্যক্তি যদি এ কথা বলে ডাকে 'يا لحلف الفضول', তাহলে তার সাহায্যে আমি এগিয়ে যাবো। কেননা, ইসলাম অধিকার আদায় করে দিতে এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করতে এসেছে। 'হিলফুল ফুজুল'কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস সমর্থন করে যে, 'وما كان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة' জাহেলি যুগে যেসব শপথ ছিলো, ইসলাম কেবলমাত্র সেগুলোকে সমর্থনই যুগিয়েছে। ওই কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কোনো সাহায্যপ্রার্থী 'হে অমুক' শব্দের মাধ্যমে আহ্বান করলে তার সঙ্গে শপথকারীরা তার সাহায্যে উপস্থিত হবে। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হলো, একে অন্যের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা। অন্যের প্রতি সহমর্মী হওয়া। অন্যকে ভালোবাসা। জাহেলি যুগের সাংস্কৃতিকে ইসলাম পরিহার করেছে। তবে 'হিলফুল ফুজুল'-এর শপথের বিষয়ের মতো হলে সেগুলোকে সমর্থন করে। যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। সুতরাং আজ অবধি তার হুকুম অবিকল রয়েছে এবং আজও উল্লিখিত বিষয়ের ওপর শপথ করা জায়েজ আছে।

মোটকথা, 'হিলফুল ফুজুল'কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক রাখা এ কথার দলিল যে, মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের সঙ্গে এমন চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করা জায়েজ, বরং মুস্তাহাব যার উদ্দেশ্য হবে মজলুমকে সাহায্য করা এবং জালেমের জুলুম প্রতিহত করা কিংবা অন্য এমন কোনো উদ্দেশ্য যা থেকে

মানুষের উপকার হবে। আর মুসলিমরা যখন ভালো কাজের সহযোগিতায় এমন চুক্তিবদ্ধ হবে, তখন তারা তাদের চুক্তির আওতাধীন সব মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে। চাই সে মজলুম মুসলিম হোক বা অমুসলিম।

মক্কা বিজয়ের একটি কারণ এটিকেও মনে করা হয় যে, মুসলিমগণ তাদের বন্ধু গোত্র বনু খুজায়া যারা অমুসলিম ছিলো—তাদেরকে সহযোগিতা করেছিলো। আর সেটি এভাবে হয়েছিলো যে, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে এ কথা ছিলো যে, আরব গোত্রগুলোর এ স্বাধীনতা থাকবে যে, সন্ধিতে তারা যে-কোনো এক দলের পক্ষে যেতে পারে। হয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে যাবে। অন্যথায় কুরাইশদের পক্ষে যাবে। সন্ধিতে বনু খুজায়া গোত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ নিলো। আর বনু বকর গোত্র কুরাইশদের পক্ষ নিলো। বনু বকর ও বনু খুজায়ার মাঝে দীর্ঘদিনের পুরোনো শত্রুতা চলে আসছিলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে শান্তি ফিরে আসলো। সন্ধির সময়ের মধ্যে বনু বকর ইচ্ছে করলো যে, এই সুযোগে তারা বনু খুজায়া থেকে প্রতিশোধ নেবে। সুতরাং বনু বকরের কিছু লোক রাতে বনু খুজায়ার লোকদের সঙ্গে রাত যাপন করে তাদের কয়েকজনকে হত্যা করলো। মক্কার কুরাইশরা অস্ত্র দিয়ে বনু বকরকে সহযোগিতা করলো এবং গোপনে গোপনে কুরাইশদের নেতারা বনু বকরের সঙ্গে মিলে হত্যাযজ্ঞ চালালো।

এ ঘটনার পর বনু খুজায়ার আমর ইবনু সালেম নামক জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর ও বনু খুজায়ার মাঝের চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার কাছে সাহায্য চাইলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন 'نصرت يا عمر بن سالم' 'হে আমর ইবনু সালেম, আমি তোমাদের সাহায্য করবো।' এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের কাছে এ সংবাদ পাঠালেন, (তোমরা যেহেতু সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছো, তাই) নিচের তিনটি পথের একটিকে গ্রহণ করো।

১. বনু খুজায়া গোত্রের নিহতদের দিয়ত আদায় করো।
২. সন্ধি চুক্তি ভঙ্গকারী বনু বকর গোত্রের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্বের চুক্তি ছিন্ন করো।
৩. কুরাইশ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে যে সন্ধি চুক্তি হয়েছে, সেটিকে বিলুপ্ত করো। মক্কার কুরাইশরা তৃতীয় কথা, অর্থাৎ,

সন্ধিচুক্তি বিলুপ্ত করতে রাজি হলো। ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে জিহাদ করেন এবং মক্কা বিজয় হয়।[১২৭]

সারকথা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু খুজায়াকে সব ধরনের সাহায্য করার চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তিতে তাদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিলো, সেটি ভঙ্গ করা ছিলো মক্কা বিজয়ের একটি কারণ। যে চুক্তির ইতি ঘটেছিলো তখন, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কুরাইশ কাফেরদের মোকাবিলায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয় হয়ে যায়।

মোটকথা হলো, যে সব বিষয় সামষ্টিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় এবং যেসব কাজে ব্যাপকভাবে সব মানুষ উপকৃত হয় এমন কাজে মুসলিমদের জন্য অমুসলিদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রশস্ত হৃদয়ের প্রমাণ বহন করে।

অমুসলিম যোদ্ধাদের সঙ্গে মুসলিমদের ব্যবহার

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কালিমা সমুন্নত রাখা, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে সৃষ্টির ইবাদত থেকে ফিরিয়ে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আনা এবং ইসলামি দেশ ও দীনের ওপর হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে ইসলাম জিহাদকে জায়েজ ও বৈধ করেছে। সব ধর্ম ও জাতির মধ্যে যুদ্ধাবস্থায় শত্রুর ওপর বিজয়, তাদের ক্ষমতা ও শক্তি ভেঙে দেওয়া এবং জীবন ও অর্থ কবজা করাকে মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

যে সময় ইসলাম দুনিয়াতে আগমন করেছে, তখন সারা বিশ্বে কোনো ধরনের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে, যুদ্ধের কোনো কারণ ছাড়া, শত্রুর ওপর প্রাধান্য অর্জনের লক্ষ্যে এবং যুদ্ধের ময়দানে কোনো ধরনের নীতির অনুসরণ ছাড়াই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো। সম্ভবত ইসলামই এ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি প্রণয়নের ভূমিকায় অগ্রনী মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। যুদ্ধকে নির্দিষ্ট নিয়মের ওপর আনতে দুনিয়াব্যাপী একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছে। যে নীতি তাদেরকে নীতিহীন অবস্থা থেকে বের করে একটি বৈধ উদ্দেশ্যের দিকে এনেছে।

---

[১২৭] সিরাতে ইবনু হিশাম, এ ঘটনাটি আরও বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯। জাদুল মাআদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৯। ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪৯-৫০। ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬।

১. যুদ্ধের উদ্দেশ্য সংশোধন

যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রথম যে বিষয়টিকে মূল ভিত হিসেবে নির্ধারণ করেছে, সেটি হলো কোনো বৈধ কারণ এবং ভালো উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ হতে হবে। এ কারণে ইসলাম সেসব যুদ্ধকে অনর্থক ও বাতিল বলে আখ্যা দিয়েছে, যার পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে। যেমন : ক্ষমতার প্রকাশ, প্রসিদ্ধি অর্জন, সম্পদ লুট করা, ভূখণ্ড দখল করা, ভাষাগত বা মাতৃভূমিগত সাম্প্রদায়িকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বা হত্যা করা ইসলামি দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কিন্তু মহান আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা করা, ইসলাম ও মুসলিমদেরকে অন্যের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বা জিহাদ করা জায়েজ আছে। একটি হাদিসে আবু মুসা আশআরি রহ. বলেন—

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العلىا فهو في سبيل الله.

'জনৈক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলে যে, একজন গনিমতের সম্পদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে, একজন নাম অর্জনের লক্ষ্যে, আরেকজন সম্মান অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় কে জিহাদ করছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করতে যুদ্ধ করে, সেই মূলত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে।'[১২৮]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে—

أن رجلا قال: يارسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا أجر له.

'কোনো ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসুল, একজন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে চায় এবং এর মাধ্যমে দুনিয়ার পাথেয় অর্জন করতে চায়। (তার হুকুম কী?) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কোনো প্রতিদান বা সওয়াব পাবে না।'[১২৯]

---

[১২৮] সহিহ বুখারি, অধ্যায়, জিহাদ, হাদিস : ২৮১০।

[১২৯] সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : জিহাদ, হাদিস : ২৫১৬।

সুতরাং যেসব যুদ্ধ দুনিয়ার শত্রুতার প্রেক্ষিতে বা হটকারিতার বশবর্তী হয়ে অথবা যার মাধ্যমে অন্যকে গোলাম বানানো বা রাজত্ব করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে ইসলামি জিহাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ইসলামি জিহাদ দ্বারা দুটি বিষয় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

ক. ইসলামকে সংরক্ষণ করা বা কোনো অমুসলিম শক্তি ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর হামলা করলে সেটি প্রতিহত করা। পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতে মহান আল্লাহ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন—

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ﴾

'যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেননা, তারা নির্যাতিত। আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। যাদেরকে অন্যায়ভাবে কেবলমাত্র এ কারণে দেশান্তরিত করা হয়েছে যে, তারা বলেছে 'আমাদের পালনকর্তা হলো আল্লাহ।'[১৩০]

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। তবে তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘণকারীদের ভালোবাসেন না।'[১৩১]

খ. জিহাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো জুলুম ও ফিতনা প্রতিহত করা এবং কাফেরদের এমন শক্তিমত্তা ভেঙে দেওয়া, যা ইসলামের দাওয়াত দিতে এবং সেটি গ্রহণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতে মহান আল্লাহ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনিই সব থেকে সত্যবাদী।

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ﴾

---

[১৩০] সুরা হজ, আয়াত : ৩৯।

[১৩১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯০।

'কুফুর নির্মূল না হওয়া এবং দীনের পূর্ণতা অর্জন হওয়া পর্যন্ত তোমরা জিহাদ করতে থাকো।'[১৩২]

ইসলামি জিহাদের এই বৈশিষ্ট্যই রিবয়ি ইবনু আমের রা. ইরানের পালোয়ান রুস্তমের সামনে পেশ করেছিলেন। মুসলামনগণ যখন কিসরার ওপর হামলা করছিলেন, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, তোমরা এখানে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো? উত্তরে রিবয়ি ইবনু আমের রা. বলেন—

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام،

'মহান আল্লাহই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। যেন তার বান্দাদেরকে বান্দার ইবাদত থেকে বিরত রেখে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফেরাতে পারি। মানুষদেরকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে প্রশস্ততার দিকে নিতে পারি। বিভিন্ন ধর্মের অন্যায় থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিতে পারি।'[১৩৩]

রিবয়ি ইবনু আমের রা.-এর কথা 'ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام،' 'বিভিন্ন ধর্মের অন্যায় থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিতে পারি।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। বরং তার উদ্দেশ্য হলো, মানুষদেরকে জুলুম ও গোলামি থেকে বের করে ওই ন্যায় ও ইনসাফের দিকে নিয়ে যাবো। ভূপৃষ্ঠে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে। যেন প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং জালেমদের অবস্থান ও গাম্ভীর্যকে ভেঙে দিয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, যার মাধ্যমে প্রত্যেকে খোলা চোখে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। এবং যেন হক গ্রহণে কুফর ও শিরকের শান-শওকাত বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

উল্লিখিত নীতির আলোকে ইসলাম ওইসব যুদ্ধের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, যেগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্র দখল এবং মানুষদের দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ করা, তাদের সম্পদ ও ভূখণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

---

[১৩২] সুরা আনফাল, আয়াত : ৩৯।

[১৩৩] আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ইবনু কাছির রহ.। খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৯।

২. যুদ্ধ অবস্থায় চালু থাকা নীতির সংশোধন

যুদ্ধাবস্থায় যে নিয়মনীতি চালু আছে, তার জন্য ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যেন যুদ্ধটি কোনো নীতিহীন যুদ্ধে পরিণত না হয় এবং নিয়ম-বহির্ভূত না হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সৈন্যবাহিনীকে জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার মুহূর্তে তাদের সামনে উল্লিখিত নিয়ম-নীতি ব্যাখ্যা করে বলে দিতেন। সে সৈন্যবাহিনীকে উল্লিখিত নীতি অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করতেন। বুরাইদা ইবনুল হাসিব রা. বলেন—

كان رسول الله . صلى الله عليه وسلم . إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا و لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সৈন্যবাহিনী বা প্রতিনিধি দলের আমির নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে খোদাভীতি ও সঙ্গে থাকা মুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহর নামে তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কুফুরি করে, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করো। জিহাদ করো, তবে খেয়ানত করো না। ধোঁকা দিয়ো না। অঙ্গহানী করো না। কোনো বাচ্চাকে হত্যা করো না।'[১৩৪]

আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন—

أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا بعثَ جيشا قال : انطلقوا باسمِ اللهِ ، لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طِفلا صغيرا ، ولا امْرأة ، ولا تَغُلُّوا ، وضمُّوا غَنائمَكم ، وأَصلِحُوا وأَحْسِنُوا ، إن اللهَ يُحِبُّ المحْسِنينَ.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন, তখন বলতেন, আল্লাহর নামে রওনা করো। কোনো বয়োবৃদ্ধ, বাচ্চা, নারীকে হত্যা করবে না। খেয়ানত করবে না। গনিমতের সম্পদ এক জায়গায় জমা করবে। মানুষদেরকে সংশোধন করো এবং তাদের

[১৩৪] সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : জিহাদ, হাদিস : ৪৬১৯।

সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। ভালো ব্যবহারকারীদেরকে মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন।'[১৩৫]

দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম হলো, যখন কোনো সৈন্যবাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অভিযানে পাঠানো হয়। তখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সরদার তাদের উৎসাহের সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তাদের গাম্ভীর্যতা ও শৌর্যবীর্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেন সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে শত্রুর সামনে লড়তে পারে।...কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যবাহিনী পাঠানোর সময় এ কথার তাকিদ দেন যে, যুদ্ধের মাঝে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজায়েজ বিষয়ে শত্রুদের সঙ্গে যেন কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি না করা হয়। সহিহ বুখারিসহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে—

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক যুদ্ধে একজন নিহত মহিলা পাওয়া গেলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও বাচ্চাদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।'[১৩৬]

আবু বকর রা. যখন ইয়াজিদ ইবনু আবু সুফিয়ান রা.-কে আমির নিযুক্ত করে শাম অভিমুখে পাঠান। তখন তার সঙ্গে কিছু পথ চললেন এবং চলার সময় নিচের কথাগুলো বলেন—

إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلّٰهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ وَلَا تُحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَجْبُنْ.

'তুমি সেখানে এমন এক জাতিকে পাবে যারা মনে করে, তারা আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে বন্দি করে রেখেছে। তুমি তাদের ও তাদের চিন্তাধারার পেছনে পড়বে না। (অর্থাৎ, সেসব লোক যারা

---

[১৩৫] সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : জিহাদ, হাদিস : ২৬১৪।

[১৩৬] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : জিহাদ, হাদিস : ৩০১৫।

মহান আল্লাহর ইবাদত করার লক্ষ্যে নিজেদেরকে সবকিছু থেকে দূরে রেখেছে)...আমি তোমাকে দশটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। কোনো নারী, বাচ্চা, বয়োবৃদ্ধকে হত্যা করবে না। ফল দেয় এমন কোনো গাছ কাটবে না। কোনো আবাদিকে বিরান করবে না। খাবারের জন্য ছাড়া কোনো ছাগল বা উটকে জখম করবে না। কোনো খেজুর গাছ কাটবেও না এবং জ্বালাবেও না। খেয়ানত করবে না, হীনমন্য হবে না।'[১৩৭]

ইসলাম আসার আগ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ম ছিলো, যোদ্ধারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে যে পন্থা অবলম্বন করা সহজ হতো, তার সবই তাদের জন্য অনুমোদিত ছিলো। কিন্তু ইসলাম তাদের জন্য এই জায়েজ পন্থা অবলম্বন করেছে। এমনকি 'জিহাদ ও যুদ্ধ' শিরোনামে ভিন্ন একটি ইলমের সৃষ্টি হয়েছে। সে সম্পর্কে কিতাব লেখা হয়েছে। সম্ভবত এ বিষয়ে লিখিত সর্বপ্রথম কিতাব হলো ইমাম আওজায়ি রহ.-এর 'কিতাবুস সিয়ার' ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান শাইবানি রহ.-এর 'আস সিয়ারুল কাবির'। যেখানে যুদ্ধের বিধান ও রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কিত বিধানাবলী বিস্তারিত লেখা হয়েছে। আর এ সম্পর্কিত সব বিধানকে কুরআন-হাদিস, খুলাফায়ে রাশিদিন এবং সাহাবিদের আমলের আলোকে লেখা হয়েছে।

৩. যুদ্ধাবস্থায় ন্যায় ও ইনসাফ ঠিক রাখা

নিঃসন্দেহে যুদ্ধাবস্থায় ইসলাম সেসব নিয়ম-নীতির ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছে, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। তবে ইসলাম কেবল এগুলোর শিক্ষা দেওয়ার ওপরই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এ কথার ওপরও মুসলিমদেরকে তাকিদ দিয়েছে যে, যুদ্ধাবস্থায়ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সব ধর্ম ও জাতির মধ্যে এ কথা স্বীকৃত যে, যুদ্ধাবস্থায় শত্রুদের সম্পদ হালাল ও বৈধ হয়ে যায়। সুতরাং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বৈধ আছে যে, যেভাবেই হোক তারা শত্রুর সম্পদ আয়ত্ব করবে। কিন্তু ইসলাম এ অনুমতিকে ওই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেছে, যা মুসলিম তাদের শক্তির জোরে আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু শত্রুদের যেসব সম্পদ আমানত হিসেবে মুসলিমদের হাতে এসেছে ইসলাম এ অনুমতি দেয়নি যে, সেগুলোকে জোরপূর্বক জব্দ করে নেবে।

---

[১৩৭] মুআত্তা মালেক। হাদিস : ৯৬৫।

এ নীতির বাস্তবায়নের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত সে ঘটনা হতে পারে, যা খায়বার যুদ্ধে আসওয়াদ আনাসি রা.-এর সঙ্গে ঘটেছিলো। হাদিস ও সিরাতের কিতাবে এই ঘটনাটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। ঘটনাটিকে এখানে ইমাম বাইহাকি রহ.-এর বর্ণনা হতে নকল করা হলো। তিনি 'মাগাজির ইমাম মুসা ইবনু উকবা রহ. থেকে বর্ণনা করেন—

ثم دخلوا يعني إليهود حصنا لهم منيعا يقال له العموص فحاصرهم رسول الله قريبا من عشرين ليلة وكانت أرضا وخمة شديدة الحر فجهد المسلمون جهدا شديدا فوجدوا أحمرة أنسية ليهود فذكر قصتها ونهى النبي عن أكلها...

وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر كان في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ما تريدون قالوا نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فوقع في نفسه ذكر النبي فأقبل بغنمه حتى عهد لرسول الله فلما جاءه قال ماذا تقول وماذا تدعو إليه قال أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وأن لا نعبد إلا الله قال العبد فماذا إلى إن أنا شهدت وآمنت بالله قال لك الجنة إن مت على ذلك فأسلم.

'এরপর সেই ইহুদি একটি সংরক্ষিত দূর্গে প্রবেশ করে। যার নাম 'আনুস'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় বিশদিন যাবত সেটিকে অবরোধ করে রাখেন। সেখানকার ভূমি ও দূর্গ ছিলো প্রচণ্ড গরম। যে কারণে মুসলিম সৈনিকরা খুব কষ্টের শিকার হচ্ছিলো। সাহাবিগণ ইহুদিদের একটি পালিত গাধা পেলেন এবং তার ঘটনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনালে তিনি সেটি খেতে নিষেধ করলেন।

...এরপর খায়বারের একজন কৃষ্ণবর্ণের দাস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। যে তার মালিকের ছাগল চড়াচ্ছিলো। সে যখন খায়বার-বাসীকে অস্ত্র ওঠাতে দেখলো, তখন তাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের উদ্দেশ্য কী? তারা বললো, আমরা সে ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করবো যে মনে করে, সে নবি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সে দাসের মনে জায়গা করে নিলো এবং তার

ছাগলগুলো নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্যদলের দিকে এলো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কী বলেন এবং কীসের দিকে আহ্বান করেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি ইসলামের দিকে ডাকি এবং এ কথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবো না। দাস বললো, আমি যদি এমন সাক্ষ্য দিই এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনি, তাহলে আমি কী পাবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ অবস্থায় তুমি মারা গেলে জান্নাত পাবে। এরপর সে তখন ইসলাম গ্রহণ করলো।'[১৩৮]

সে দাস বললো, হে আল্লাহর নবি, আমার কাছের এই ছাগলগুলো আমানত রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলোকে আমাদের সৈন্যদের থেকে বের করে পাথরের মাধ্যমে তাড়িয়ে দাও। তোমার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ আমানত পৌঁছে দেবেন। সে অনুরূপ করলো এবং ছাগলগুলো মালিকের কাছে ফিরে গেলো।

অন্য একটি বর্ণনাতে জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে—

فقال له إني قد آمنت بك وبما جئت به فكيف بالغنم يا رسول الله فإنها أمانة وهي للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك قال أحصب وجوهها ترجع إلى أهلها فأخذ قبضة من حصباء أو تراب فرمى به وجوهها فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله ولم يصل لله سجدة قط قال رسول الله أدخلوه الخباء... فقال لقد حسن إسلام صاحبكم لقد دخلت عليه وأن عنده لزوجتين له من الحور العين.

'সে দাস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমি আপনার ও আপনার আনীত বিষয়ের প্রতি ইমান আনছি। হে আল্লাহর রাসুল, এই ছাগলগুলোর ব্যাপারে আমি কী করবো? এগুলো আমার কাছে মানুষের আমানত। কারও একটি ছাগল, কারও দুটি, আবার কারও ততধিক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

[১৩৮] দালায়িলুন নুবুওয়া, ইমাম বাইহাকি রহ. খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২১৯।

পাথরের টুকরো উঠিয়ে তাদের মুখে মেরে দাও, সেগুলো তার মালিকের কাছে পৌঁছে যাবে। দাস একমুষ্ঠি পাথর বা মাটি উঠিয়ে ছাগলের মুখের দিকে ছুঁড়ে দিলো। তখন ছাগলগুলো দ্রুতগতিতে তাদের মালিকের বাড়িতে চলে গেলো। (যুদ্ধের জন্য যেহেতু সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তাই) এরপর সে কাতারে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ একটি তির এসে তার গায়ে লাগলে সে শহিদ হলো। মহান আল্লাহর জন্য সে একটি সিজদা পর্যন্ত করার সুযোগ পেলো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের বললেন, তাকে খিমায় নিয়ে যাও। ...পরবর্তী সময়ে তিনি বলেন, তোমাদের সঙ্গীর ইসলামগ্রহণ কতই না সুন্দর ছিলো। আমি তার কাছে গিয়ে, তার পাশে উত্তম বর্ণের ডাগর চোখবিশিষ্ট্য দুজন স্ত্রী দেখতে পাই।'[১৩৯]

আনাস রা. থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে—

فقال : يا رسول الله ،إني رجل أسود اللون ، قبيح الوجه ، منتن الريح ، لا مال لي ، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة ؟ قال : نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل ، فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول ، فقال : لقد أحسن الله وجهك ، وطيب روحك ، وكثر مالك... لقد رأيت زوجتيه من الحور العين.

'ইমান আনার পর সেই দাস বললো, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কৃষ্ণবর্ণের, কুৎসিত চেহারা ও দুর্গন্ধময় একজন মানুষ। আমার কোনো সম্পদ নেই। আমি যদি তাদের সঙ্গে জিহাদে গিয়ে মারা যাই, তাহলে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে সে সামনে বাড়লো এবং জিহাদ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় তার কাছে গেলেন, যখন সে শহিদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার চেহারাকে সুন্দর করে দিয়েছেন, গন্ধকে সুঘ্রাণে পরিণত করেছেন এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।...আরও বললেন, আমি গৌরবর্ণের ডাগর চোখবিশিষ্ট্য তার দুজন স্ত্রী দেখছি।'[১৪০]

---

[১৩৯] দালায়িলুন নুবুওয়া, ইমাম বাইহাকি রহ. খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২০।

[১৪০] দালায়িলুন নুবুওয়া, ইমাম বাইহাকি রহ. খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২১।

মোটকথা, সহিহ হাদিসে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, ওই যুদ্ধে সাহাবিগণ অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এমনকি তারা গাধা জবাই করে তার গোশত খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাদেরকে সেটি খেতেও নিষেধ করা হলো। এমনকি গোশত পাকানো ডেগ পর্যন্ত উলটিয়ে দেওয়া হলো। এমন মুহূর্তে কৃষ্ণবর্ণের রাখাল শত্রুদের মালিকানাধীন একপাল ছাগল নিয়ে এলো। এ অবস্থায় মুসলিমদের জন্য সহজ পথ ছিলো ছাগলগুলোকে গনিমতের সম্পদ মনে করা। আর এই ব্যাখ্যা করে নেওয়া যে, এখন যুদ্ধাবস্থা চলছে। আর যুদ্ধাবস্থায় শত্রুদের মালিকানাধীন সম্পদ মুসলিমদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। উল্লিখিত ব্যাখ্যার পক্ষে এ কথা বলে দলিল দেওয়া যেতো যে, রাখাল মুসলিম হয়ে মুসলিমদের সঙ্গে মিলে গেছে। সেইসঙ্গে ইহুদিদের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতও হয়েছে। আর সেসব ইহুদিদের মাঝে অনেকে সেই ছাগলের মালিক ছিলো। (এমন ব্যাখ্যা ও দলিলের আলোকে ছাগলগুলো হালাল করা যেতো) কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে রাজি হলেন না। কেননা, ওই রাখাল ছাগলগুলোকে তার মালিকদের থেকে আমানতের ভিত্তিতে এনেছিলো। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালকে এসব ছাগল তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এমনকি ওই কঠিন অবস্থাতে, যখন তারা ছাগলের প্রতি অনেক বেশি মুখাপেক্ষী ছিলো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের মধ্যে যে ইনসাফ ও ন্যায়ের নীতি জারি করেছেন সাহাবা রা. অমুসলিমদের সঙ্গে এমন নীতির ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি যুদ্ধ অবস্থাতেও তারা এই নীতির ওপর চলার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। একবার খুবায়েব রা. কাফের শত্রুদের হাতে বন্দি ছিলেন। কাফেরদের কোনো একটি বাচ্চা হঠাৎ তার কাছে আসে। তিনি বাচ্চাটিকে স্বীয় রানের ওপর বসান। তখন তার হাতে খুর ছিলো। বাচ্চার মা এ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলো। খুবায়েব রা. বাচ্চার মাকে বললেন। তুমি এ কথা ভেবে ভয় পাচ্ছো যে, আমি এই বাচ্চাকে হত্যা করবো। শোনো, আমি কখনোই এমন করবো না।[১৪১]

খুবায়েব রা.-এর জন্য এমনটি করার সুযোগ ছিলো যে, ওই সুযোগকে গনিমত মনে করে কমপক্ষে বাচ্চাকে বন্ধক হিসেবে তার কাছে রাখতেন। আর বাচ্চার বিনিময়ে বন্দি থেকে মুক্তি নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমন করেননি। নিজের

[১৪১] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : মাগাজি, হাদিস : ৩৯৮৭।

জীবন দিতে রাজি হয়েছেন কিন্তু এতে রাজি হননি যে, মুসলিমদেরকে বলা হবে, তারা বাচ্চাকে হত্যা করেছে। অথবা নিজেকে মুক্ত করতে বাচ্চা ছিনতাই করেছে।

ইমাম আবু উবায়েদ কাসেম ইবনু সাল্লাম সফওয়ান ইবনু আমর ও সাইদ ইবনু আবদুল আজিজ থেকে বর্ণনা করেন—

ان الروم صالحت معاوية رضي الله تعالى عنه ان تؤدي إليهم مالا، وارتهن معاوية منهم رهنا، فجعلهم ببعلبك، ثم ان الروم غدرت، فأبي معاوية والمسلمون ان يستحلوا قتل من في ايدهم من رهنهم، وخلوا سبيلهم واستفتحوابذلك عليهم، وقالوا:وفاء بغدر خير من غدربغدر.

'রোমকরা মুয়াবিয়া রা.-এর সঙ্গে সন্ধি করেছিলো যে, তিনি তাদের সম্পদ ফেরত দেবেন। এই চুক্তির ওপর মুয়াবিয়া রা. তাদের কাছে একটি বন্ধক চান। তারা 'বালা বাক্কা' শহরকে বন্ধক হিসেবে রাখে। এরপর রোমকরা গাদ্দারি করলো এবং সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলো। তখনো মুয়াবিয়া রা. তাদের হাতে থাকা বন্দিদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করলেন না। বরং তাদেরকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন। এভাবেই তারা ওই এলাকা বিজয় করতে সক্ষম হন। মুসলিমরা তখন বললো, গাদ্দারির বিনিময়ে গাদ্দারি করা থেকে ওয়াদা পূরণ করা উত্তম।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এটি সম্ভব নয় যে, ইসলাম যে সব ইনসাফের বিধান চালু করেছে, তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হবে। ইসলামি ইতিহাস যুদ্ধ ও যুদ্ধহীন অবস্থায় অমুসলিমদের সঙ্গে ব্যবহারের যে নমুনা রেখে গেছেন, তার সবগুলোর বর্ণনা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবে আমরা আশা করি, যেসব ঘটনা ও হুকুম আমরা বর্ণনা করেছি, সেগুলো দীনে ইসলামের উৎকৃষ্টতা প্রমাণের উত্তম নমুনা। যে বক্তি এ বিষয়ে জানতে চায়, তার পরখ করার জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে।

ফিকহ, উসুলে ফিকহ এবং দার্শনিক আলেমগণ সকলেই এ কথার ওপর একমত যে, জিহাদ করা সত্তাগতভাবে ভালো কাজ নয়। বরং অন্য কারণে সেটি ভালোয় পরিণত হয়েছে। যার অর্থ হলো, কেবলমাত্র প্রয়োজনের মুহূর্তে জিহাদ করা যাবে। যদি শরিয়তের উদ্দেশ্য সন্ধির মাধ্যমে অর্জন হয়ে যায়, তাহলে জিহাদের প্রয়োজন নেই। এ জন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, ইসা আ. শেষ জামানায় এসে

জিহাদকে রহিত করবেন।[১৪২] কেননা, তখন যুদ্ধ জিহাদ ছাড়াই শরিয়তের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

এই হাদিসটি এ কথার ওপরও দলিল হয় যে, যদি কখনো রাষ্ট্রীয় বিবাদকে সন্ধির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহলে যুদ্ধ জিহাদে জড়িয়ে পড়া থেকে এটি বেশি ফজিলত রাখে। যদি সন্ধির পদ্ধতি শরিয়তের উপকারার্থে হয়ে থাকে। আর এ কথার মূল ভিত রয়েছে পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতটিতে—

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

'তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তাহলে আপনিও সন্ধি করুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।'[১৪৩]

হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুদায়েল ইবনু ওরাকা রা.-কে বলেন—

إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি। কেবলমাত্র উমরা করতে এসেছি। যুদ্ধ কুরাইশদেরকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা চাইলে আমি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করবো। সে সময়ে কুরাইশরা আমার ও অন্যদের জন্য পথ খুলে দেবে। যদি ইসলামের বিজয় হয়, তাহলে তাদের স্বাধীনতা থাকবে। তারা চাইলে অন্য মানুষ যাতে প্রবেশ করবে, তারাও তাতে তাদের সঙ্গে প্রবেশ করতে পারবে। অন্যথায় তারা সবাই আমার বিপক্ষে দাঁড়াবে। তারা যদি এ কথা মানতে অস্বীকার করে, তাহলে ওই সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আমার জীবন, আমার গর্দান বাকি থাকা অবধি এ ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবো।

---

[১৪২] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : আম্বিয়া, পরিচ্ছেদ : হজরত ইসা আ. এর অবতরণ। হাদিস : ৩৪৪৮।

[১৪৩] সুরা : আনফাল, আয়াত : ৬১।

মহান আল্লাহ অবশ্যই তার বিধান বাস্তবায়ন করবেন।'[১৪৪]

সব থেকে বড়ো সাহিত্যিক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জবানে পূর্ণ শক্তি ও স্পষ্টতার সঙ্গে সাহিত্যপূর্ণ ভাষাতে যুদ্ধ ও যুদ্ধহীন অবস্থায় ইসলামের অবস্থানের উত্তম নমুনা বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাক্যটি দেখুন—

إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم.

'যুদ্ধ কুরাইশদের ক্লান্ত করে দিয়েছে। তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' একেবারে স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বয়ান করেছেন যে, যুদ্ধ সত্তাগত কোনো ভালো কাজ নয়। সেটির দিকে যাওয়া ছাড়া যদি নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তাহলে যুদ্ধের দিকে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু শরিয়তের উদ্দেশ্যের বিনিময়ে, অথবা তার সেসব উত্তম ও সত্য নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, যার ওপর চলাকে আবশ্যক করা হয়েছে ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর বিনিময়ে সন্ধির মর্যাদা অর্জন কখনোই সম্ভব না। এটির মূল ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআনের এই বর্ণনা—

﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾

'তারা যতদিন তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার ঠিক রাখবে, তোমরাও ততদিন পর্যন্ত তাদের অঙ্গীকার ঠিক রাখবে।'[১৪৫]

কিন্তু শত্রুরা যদি সন্ধির ব্যাপারে কথাবার্তা বলা এবং আলোচনাকে একটি বাহানা হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের বাতিলের ওপর দীর্ঘ সময় টিকে থাকার মাধ্যম বানায়। জুলুম করতে থাকে এবং অধিকারীর অধিকার দিতে বিলম্ব করে। তখন সন্ধির এই পন্থা ও আলোচনা একটি ধোঁকা ও প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। ইনসাফের মানদণ্ডে সন্ধির ওপর অটল থাকার কারণে উল্লিখিত কোনো উপকার পাওয়া যাবে না। তখন সে পন্থা অবলম্বন করা হবে, যা কোনো একজন কবি তার কবিতায় বলেছেন—

والسيف أبلغ وعاظا على امم.

'কথার থেকে তলোয়ার বেশি ভালো উপদেশদাতা।'

---

[১৪৪] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : শর্তসমূহ। হাদিস : ২৭৩২।

[১৪৫] সুরা : তাওবা, আয়াত : ৭।

কী পরিমাণ দুধপান করলে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিধান প্রযোজ্য হবে?

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

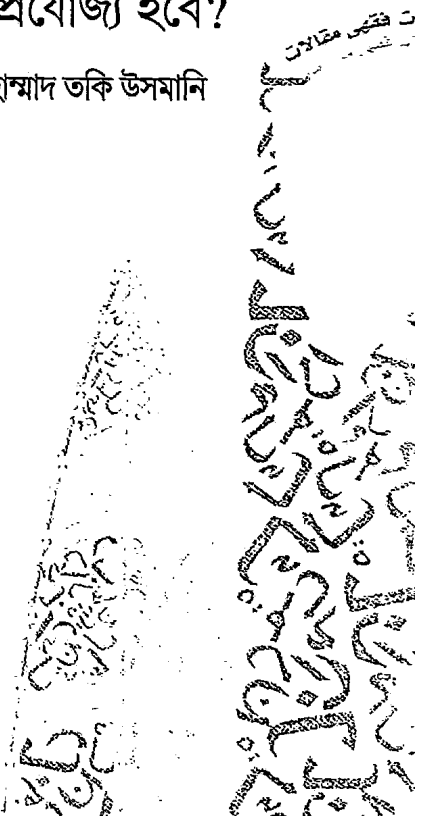

'কী পরিমাণ দুধপান করলে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিধান প্রযোজ্য হবে?' এ প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম'-এর প্রথম খণ্ডের স্তন্যদান অধ্যায়ে আরবি ভাষায় উপস্থাপন করেন।

—আবদুল্লাহ মায়মান

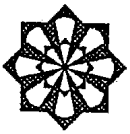

কী পরিমাণ দুধপান করলে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিধান প্রযোজ্য হবে?

['মাসআলাটি নিয়ে ফকিহগণ যেহেতু মতানৈক্য করেছেন। এ কারণে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে' এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তার অনুবাদ তুলে ধরা হলো।'—মায়মান]

হামদ ও সালাতের পর—

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه و سلم قال) لا تحرم المصة والمصتان.

'আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার বা দু-বার চুষলে সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না।' 'المصة' শব্দটি 'يمص-مص' 'বাবে নাসারা'র অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থ হলো একবার চোষা। এই হাদিসের ভিত্তিতে জাহেরি মতাবলম্বীরা দলিল পেশ করে যে, তিনবারের কম স্তন চুষলে হারাম প্রমাণিত হবে না। আমাদের কাছে হাদিসটি রহিত। যেমনটি সামনে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে-কোনোভাবে দুধ পান করালে তা দ্বারা সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।

এই মাসআলাতে ফকিহদের চারটি মাজহাব রয়েছে—

প্রথম মাজহাব

স্তন্যদানের মাধ্যমে হারাম প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কমবেশি স্তন্যদান বরাবর। যে পরিমাণ দুধ পান করলে রোজাদারের রোজা ভেঙে যাবে, এ পরিমাণ দুধ পান করলে স্তন্যদানের হারাম প্রমাণিত হবে। এটি হলো ইমাম আবু হানিফা ও মালিক রহ.-এর অভিমত। ইমাম আহমাদ রহ.-এর একটি অভিমত এমন রয়েছে। উল্লিখিত মতামতটি উমর ইবনু খাত্তাব, আলি ইবনু আবু তালেব, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. এবং কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ, সালেম ইবনু আবদুল্লাহ, তাউস, কাবিসা ইবনু জুয়াইব, সাইদ ইবনু মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনু জুবায়ের, রবিআ, ইবনু শিহাব, আতা ইবনু রবাহ ও মাকহুল রহ. থেকে বর্ণিত।[১৪৬]

এ ছাড়া কাতাদা, হাসান, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম আওজায়ি, ইমাম সাওরি, লাইস ইবনু সাদ রহ.-এরও একই অভিমত। লাইস ইবনু সাদ রহ.-এর অভিমত হলো, কমবেশি দুধ পানে হারাম সাব্যস্ত হওয়ার ওপর মুসলিমদের ঐকমত্য প্রমাণিত।[১৪৭]

ইবনু মুনজির রহ. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে এ অভিমত নকল করেন। ইমাম নববি রহ. মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যায়[১৪৮] এটিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অভিমত বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর আমি এ কথা বলি যে, ইমাম বুখারি রহ.-এরও এই অভিমত। যেমনটি সহিহ বুখারিতে তার উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায়।

দ্বিতীয় মাজহাব

একবার বা দু-বার চুষলে সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না। তবে তিন বা ততধিকবার চুষলে হারাম প্রমাণিত হবে। এটি ইমাম আবু ছাওর, আবু উবায়েদ, দাউদ জাহেরি, ইবনু মুনজির রহ.-এর মাজহাব। ইমাম আহমাদ রহ.-এর এমন একটি অভিমত রয়েছে। জায়েদ ইবনু সাবেত রা. থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে।[১৪৯]

---

[১৪৬] দেখুন—মুদাওনাতুল কুবরা, ইমাম মালেক রহ. খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৮৭।

[১৪৭] মুগনি, ইমাম ইবনু কুদামা রহ. খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫৩৬।

[১৪৮] খণ্ড : ১০. পৃষ্ঠা : ২৯।

[১৪৯] বিস্তারিত দেখুন, শরহু মুহাজ্জাব, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৭।

তৃতীয় মাজহাব

পাঁচবারের কম চুষলে সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না। এটি ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাব। ইমাম আহমাদ রহ.-এর সহিহ মাজহাব এটি। আয়শা, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের, সাদ ইবনু জুবায়ের, উরওয়া ইবনু জুবায়ের রা. এবং ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, ইবনু হাজম রহ.-এর এই অভিমত। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আলি রা. এবং আতা ও তউস রহ.-এর অনুরূপ একটি অভিমত রয়েছে।[১৫০] তাদের থেকে প্রথম মাজহাবের অনুরূপ একটি অভিমত রয়েছে। যা ইতোপূর্বে 'আল-মুদাওনাতুল কুবরা' থেকে নকল করা হয়েছে।

চতুর্থ মাজহাব

দশবারের কম চুষলে সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না। এ মাজহাবটি হাফসা রা. থেকে বর্ণিত আছে।[১৫১] অনেকে আয়শা রা.-এর প্রতি উল্লিখিত মাজহাবকে সম্পৃক্ত করেছেন। তার তাহকিক সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম মাজহাবের পক্ষে আলেমদের দলিলসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো।

১. মহান আল্লাহ বলেন—

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾

'তোমাদের যে মায়েরা তোমাদেরকে স্তন্যদান করেছেন, তারা তোমাদের জন্য হারাম।'[১৫২]

উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ শর্তহীনভাবে স্তন্যদানকারীনিকে হারাম বলেছেন। আর শর্তহীন স্তন্যদান করার মধ্যে কমবেশি উভয়টি রয়েছে। বিধায় পবিত্র কুরআনের শর্তহীন বিধানকে 'খবরে আহাদ' বা কেয়াসের মাধ্যমে শর্তযুক্ত করা জায়েজ নেই। যারা বলেছেন যে, আয়াতটি 'মুজমাল' (অস্পষ্ট)। হাদিসে যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারা ভুল করেছে। কেননা 'اَرْضَاعْ' এর অর্থে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই। আরবি ভাষা জানে

---

[১৫০] বিস্তারিত দেখুন, শরহু মুহাজ্জাব।

[১৫১] মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ.।

[১৫২] সুরা : নিসা, আয়াত : ২৩।

এমন প্রত্যেকে এটির অর্থ জানে। বিধায় আয়াতটি 'মুজমাল' (অস্পষ্ট) নয়। বরং 'মুহকাম'। যার অর্থ একেবারেই স্পষ্ট এবং তার উদ্দেশ্য যবনিকাহীন। সুতরাং পবিত্র কুরআন এবং মুতাওয়াতির হাদিস ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে সেটিকে বিশেষিত করা বা শর্তযুক্ত করা যাবে না।[১৫৩]

২. ইমাম আবু হানিফা রহ. একটি হাদিস বর্ণনা করেন—

عن الحكم بن عتيبة عن قاسم بن المخيمرة عن شريح بن هاني، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال: يحرم من الرجاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره.

'আলি রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। বংশের কারণে যেসব আত্মীয় হারাম হয়, স্তন্যদানের কারণেও তারা হারাম হয়। চাই স্তন্যদান কম হোক বা বেশি।' ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।'[১৫৪]

এই দুর্বল বান্দা বলছে, হাদিসটির সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। হাকাম ইবনু উতাইবা রহ. তো সিহাহ সিত্তার বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে। তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত। ফকিহ ছিলেন। অবশ্য কখনো কখনো 'তাদলিস' করতেন। কাসেম ইবনু মুখাইমিরাহ ওইসব বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বর্ণনাকে ইমাম বুখারি রহ. তালিক হিসেবে তার কিতাবে উল্লেখ করেন। পাঁচজন বর্ণনাকারী তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। শুরাই ইবনু হানি রহ.-এর প্রকৃত নাম হলো, হারিস কুফি। যিনি বুখারি ব্যতিত বাকি পাঁচটি প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাবের বর্ণনাকারী। আর ইমাম বুখারি রহ. 'আল-আদাবুল মুফরাদে'ও তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি 'মুখদ্‌রমিনদের' অন্তর্ভুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য। সুতরাং হাদিসটি সহিহ। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. উল্লিখিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা সেটি সহিহ হওয়ার প্রমাণ।

৩. বুখারি ও মুসলিম শরিফে এই হাদিসটি রয়েছে—

---

[১৫৩] বিস্তারিত দেখুন—আহকামুল কুরআন, ইমাম জাস্‌সাস রহ.। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫০।

[১৫৪] উকুদুল জাওয়াহিরুল মুনিফা, আল্লামা জাবিদি রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৯।

عن عقبة بن حارث قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امراة سوداء فقال أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امراة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال (كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك).

'উকবা ইবনু হারিস রা. বলেন, আমি একজন নারীকে বিয়ে করি। একজন কালো বর্ণের মহিলা এসে আমাকে বললো, আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলি, আমি অমুকের মেয়ে অমুককে বিয়ে করেছি। আমার কাছে কালো বর্ণের একজন মহিলা এসে আমাকে বললো, আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। অথচ সে মহিলা মিথ্যে বলেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দ্বিতীয়বার তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চেহারার সামনে গিয়ে বললাম সে তো মিথ্যে বলেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মহিলা যখন এ কথা বলছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছে। তখন তোমাদের বিয়েকে কীভাবে ঠিক রাখবে! ওই নারীকে তুমি ছেড়ে দাও।'[১৫৫]

বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল দেওয়ার কারণ এই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকবা ইবনু হারিস রা.-কে এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, কতোবার দুধ পান করিয়েছে। বরং শুধু দুধ পান করানোর কারণে হারাম হওয়ার কথা বললেন।

৪. অনুরূপভাবে সেসব হাদিস হানাফিদের দলিল। যেখানে শর্তহীনভাবে দুধপান করানোর কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হারাম হওয়ার বিধান বর্ণিত আছে। যেমন : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বর্ণনা। 'حرم من الرضاع ما حرم من النسب' 'স্তন্যদান দ্বারা তারা হারাম হয়ে যায়, বংশের কারণে যারা হারাম হয়। 'ان الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة' 'স্তন্যদানের কারনে সেসব আত্মীয় হারাম হয়ে যায়, জন্মসূত্রে যারা হারাম হয়।' ইত্যাদি।

---

[১৫৫] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : বিয়ে, পরিচ্ছেদ : দুধপানকারীনির সাক্ষি। হাদিস : ৪৮১৬।

৫. অনুরূপভাবে সাহাবিদের অনেক আসার হানাফিদের পক্ষে দলিল বা প্রমাণ হতে পারে। তার মধ্যে একটি আসার হলো ইমাম নাসায়ি রহ. কর্তৃক 'সুনানে নাসায়ি'তে বর্ণিত হাদিস—

عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب ان شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثير.

'কতাদা থেকে বর্ণিত। স্তন্যদান সম্পর্কে আমরা ইবরাহিম নাখায়ি রহ.-কে লিখিত প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি লিখলেন, শুরাইহ রহ. বলেন, আলি ও ইবনু মাসউদ রা. বলতেন, স্তন্যদানের কারণে হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। চাই সেটি কম হোক বা বেশি।'[১৫৬]

হানাফিদের দলিলের মধ্যে আরেকটি দলিল হলো ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কর্তৃক 'মুয়াত্তা'-এ বর্ণিত আসার। তিনি বলেন—

أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد : أن ابن عباس كان يقول : ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم.

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলতেন, দু-বছরের মাঝে যে দুধ পান করানো হয়, তা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হবে। যদিও সেটি একবার চোষার মাধ্যমে হয়ে থাকে।'[১৫৭]

হাদিসটির একজন বর্ণনাকারী রয়েছে 'সাওর ইবনু জায়েদ দাইলামি মাদানি মাওলা'। ইবনু মাইন, আবু জুরআহ ও ইমাম নাসায়ি রহ. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১৫৮]

১৩৫ হিজরি সনে তার ইনতিকাল হয়। জাফর আহমাদ উসমানি রহ. 'ইলাউস সুনান'[১৫৯] এ বলেন, হাদিসটির সূত্র সহিহ।

হানাফিদের আরও একটি দলিল হলো ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. কর্তৃক

---

[১৫৬] সুনানে নাসায়ি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮, হাদিস : ৩৩১১।

[১৫৭] মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ রহ.। পৃষ্ঠা : ২৭৬। হাদিস : ৬২১।

[১৫৮] তালিকুল মুমাজ্জাদ আনিল ইসআফ।

[১৫৯] খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৮০।

স্বীয় কিতাব 'মুসান্নাফ' এ ইবনু জুরাইজ রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস। আমর ইবনু দিনার রহ. বলেন, তারা আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে শুনেছেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো যে, একবার বা দুবার দুধপান করলে কি হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায়? উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেছিলেন। দুধবোন সম্পর্কে আমরা কেবল হারাম হওয়ার কথাই জানি। এ কথা শুনে প্রশ্নকারী বললো, আমিরুল মুমিনিন অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. মনে করেন যে, একবার বা দুবার দুধপান করলে হারাম সাব্যস্ত হয় না। তার উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বললেন, তোমার ও আমিরুল মুমিনিনের সিদ্ধান্ত থেকে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত উত্তম।

এ ছাড়া ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. তার কিতাব 'মুসান্নাফ'-এ ইবনু জুরাইজ আতার সূত্রে এ কথা নকল করেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর কাছে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.-এর ব্যাপারে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, দুধপান সম্পর্কে তিনি আয়শা রা.-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, সাতবারের কম স্তন চুষলে হারাম সাব্যস্ত হবে না। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, মহান আল্লাহ আয়শা রা. থেকে উত্তম। আর মহান আল্লাহ বলছেন, 'وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ' 'তোমাদের দুধবোনকে তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে।'[১৬০] মহান আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, একবার দুধ পান করলো না কি দুবার। (কোনো ধরনের শর্তারোপ করেননি)[১৬১] উল্লিখিত হাদিসটিকে ইমাম দারাকুতনি রহ. ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. থেকে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন।[১৬২] খালেদ ইবনু ইউসুফ হাম্মাদ ইবনু জায়েদ থেকে আমর ইবনু দিনার রহ.-এর সূত্রেও এই হাদিসটি বর্ণনা করেন।[১৬৩] ইমাম বাইহাকি রহ.ও বিভিন্ন সূত্রে এই হাদিস উল্লেখ করেছেন।[১৬৪]

তৃতীয় মাজহাবের প্রবক্তাগণ দুধপান পরিচ্ছেদ শিরোনামে উল্লিখিত নিচের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন—

---

[১৬০] সুরা : নিসা, আয়াত : ২১।

[১৬১] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৬৬। হাদিস : ১৩৯১১।

[১৬২] দেখুন—খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৮৩।

[১৬৩] দেখুন—খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১২৯, অধ্যায় : দুধপান, নং ২৩।

[১৬৪] দেখুন—খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৫৮।

أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله . صلى الله عليه وسلم . وهن فيما يقرأ من القرآن.

'আয়শা রা. বলেন, নির্দিষ্ট দশবার চুষে দুধপান করার কারণে হারাম হওয়ার বিধান পবিত্র কুরআনে নাজিল হয়েছিলো। তারপর নির্দিষ্ট পাঁচবার চোষার আয়াত দ্বারা সেটি রহিত করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের সময় পাঁচবার চোষা সম্পর্কিত আয়াতের তেলাওয়াত কুরআনে ছিলো।'[১৬৫]

হাদিসটির উত্তর এই যে, দুধপানের পরিমাণ বিষয়ক যত শর্তের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলো রহিত হয়ে গেছে। আর এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, শর্তহীনভাবে দুধ পান করলেই হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম নববি রহ. একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, দুধপানের পরিমাণের ব্যাপারে বর্ণিত সব হাদিস রহিত হওয়ার বিষয়টি কি কেবলমাত্র দাবি করলেই প্রমাণিত হতে পারে? ইমাম নববি রহ.-এর প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, আমাদের এই দাবি দলিলহীন নয়। বরং তার পক্ষে শক্তিশালী দলিল রয়েছে। কিছু নিচে তুলে ধরা হলো।

১. আলি রা.-এর হাদিস, যেটিকে আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।

أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثير.

'আলি ও ইবনু মাসউদ রা. বলতেন, স্তন্যদানের কারণে হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। চাই সেটি কম হোক বা বেশি।'[১৬৬]

ইমাম আবু হানিফা রহ. হাদিসটিকে কয়েক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যাদের প্রত্যেকের ফকিহ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। হাদিসটিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্টভাবে এ কথাটি বলে দিয়েছেন যে, হারাম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কমবেশি দুধপান করা বরাবর। আয়শা রা.-এর হাদিসে আপনারা এ কথা জানতে পারছেন যে, দুধপানের পরিমাণ বেশি থেকে কমের দিকে এসেছে। সুতরাং প্রথম দিকে দশবার চুষার সঙ্গে হারাম হওয়ার বিধান ছিলো। তারপর সেটি পাঁচবারে নেমে আসে। এরপর 'একবার দু-বার

[১৬৫] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৬৭০।

[১৬৬] সুনানে নাসায়ি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮, হাদিস : ৩৩১১।

চুষলে হারাম হবে না' এই হাদিস তিনবার চুষলে হারাম হওয়ার কথা প্রমাণ করে। যেমন : আহলে জাহের উল্লিখিত হাদিস দ্বারা দলিল দিয়ে থাকে। আর এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আলি রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি এ বিষয়ের সর্বশেষ হাদিস ছিলো। যে কারণে অনেক সাহাবি সেটি সম্পর্কে অবগত নন।

২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. উল্লিখিত রহিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন। ইমাম তউস রহ. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন। দুধপান সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো। আমিও তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষেরা এ কথা বলছে যে, একবার বা দুবার দুধপানের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় না। উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, প্রথম দিকে এমনটিই ছিলো। কিন্তু এখন একবার চোষার দ্বারাও হারাম সাব্যস্ত হবে।[১৬৭]

তার সূত্রটি নিচে দেওয়া হলো—

عن ابي الحسن الكرخي، قال حدثنا الحضرمي، قال حدثنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا ابو خالد، عن حجاج، عن حبيب بن ابي ثابت عن طاؤوس الخ.

ইবনুল হুমাম রহ. এ কথাটিই 'ফাতহুল কাদির'-এ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তার মূল উৎসের কথা বলেননি। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে নিচের বর্ণনাটি নকল করেন—

آل أمر الرضاع إلى أن قليله و كثيره يحرم.

'দুধপানের বিষয়টি এমনভাবে নিচের দিকে এসেছে যে, তার কমবেশি উভয়টি দ্বারা হারাম প্রমাণিত হয়।'[১৬৮]

উল্লিখিত বর্ণনার মূল উৎস আমি পাইনি। অবশ্য ইবনুল হুমাম রহ. বর্ণনার ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন।

যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে তো এর বিপরীত বর্ণনাও রয়েছে। যেমন ইমাম বাইহাকি রহ. 'আস সুনানুল

---

[১৬৭] দেখুন—আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫১।

[১৬৮] ফাতহুল কাদির, অধ্যায় : দুধপান, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৮৮।

কুবরা'তে[১৬৯] উরওয়াহ রহ.-এর এই বর্ণনা নকল করেছেন যে, উরওয়াহ রহ. বলেন, আমি সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রহ.-এর কাছে গিয়ে তাকে একবার দুবার দুধ চোষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি সে কথা বলবো, যা আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন। আমি জিজ্ঞেস করালাম, তারা দুজন কী বলেছেন? তিনি বলেন, তারা দুজনে বলতেন। 'لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا.' 'একবার বা দুবার দুধ চুষলে হারাম হবে না। দশবার দুধপান বা তার চেয়ে কম পান করলে হারাম হবে না।' এই বর্ণনার পর ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, ইবনু আব্বাস রা. থেকে উরওয়াহ রহ.-এর বর্ণনা তার কাছে সব থেকে সহিহ।

উল্লিখিত বর্ণনার উত্তরে আমরা এ কথা বলবো যে, হাফেজ মারদিনি রহ. এ ব্যাপারটিকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেটিই এখানকার জন্য যথেষ্ট এবং তৃপ্তিদায়ক। তিনি (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা উল্লিখিত বর্ণনার বিপরীত। ইমাম মালিক, ইবনু আবু শাইবা ও ইমাম তাবারানি রহ. থেকে বিভিন্ন সহিহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. দুধপানের ক্ষেত্রে কমবেশি উভয়ের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। স্বয়ং ইমাম বাইহাকি রহ. তার 'আল-মারেফা' কিতাবে উল্লিখিত বর্ণনা নকল করেছেন। সেটি এরূপ—

عن الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، أن قليل الرضاع وكثيرها يحرم في المهد.

তারপর ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, 'روي عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل' 'কম দুধপানের বিষয়ে ইবনু আব্বাস রা. থেকে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে।' তবে প্রথম বর্ণনাটি বেশি সহিহ। (কমবেশি দুধপান হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে উভয়টি সমান) মোটকথা, ইমাম বাইহাকি রহ. 'আল-মারেফা' কিতাবে যে কথার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, সেটি 'আস সুনানুল কুবরা'-এর বর্ননার একেবারে বিপরীত।[১৭০]

---

[১৬৯] সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি রহ. খণ্ড : ৪৫৮-৪৫৯।

[১৭০] দেখুন—আল-জাওহারুন নাকি' সুনানে বাইহাকি এর টীকায়। খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৫৯।

৩. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক'-এ একটি বর্ণনা রয়েছে—

عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاؤوس عن أبيه قال كان لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم رضعات معلومات قال ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم.

'হারাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নবি পত্নীগণের কাছে নির্দিষ্ট কয়েকবার দুধপান করার বিধান ছিলো। কিন্তু তারা সবাই সে মতামত পরিহার করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদের কাছে কমবেশি উভয় ধরনের দুধপান হারামের কারণ হয়েছে।'[১৭১]

ইবনু জুরাইজ রহ. নকল করেন—

عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن طاووس قال قلت له إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس فقال طاووس قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم.

'ইবনু জুরাইজ রহ. বলেন, আবদুল কারিম তউস থেকে বর্ণনা করে বলেন। আমি তাকে বললাম যে, তারা মনে করে সাতবারের কম দুধ পান করলে হারাম সাব্যস্ত হবে না। তারপর সেটি পাঁচ বারে চলে আসে। ইমাম তউস রহ. বললেন, বিষয়টি এমনই ছিলো। অবশ্য পরবর্তিকালে একটি ঘটনা ঘটে যায়। আর সেটি হলো হারামের বিধান চলে আসে। বিধায় এখন একবার পান করার কারণেও হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে।'[১৭২]

৪. আয়শা রা.-এর হাদিস পাঁচবার দুধপান করার মাধ্যমে হারাম হওয়ার হুকুমকে রহিত করার ওপর প্রমাণ বহন করে। কেননা যদি পাঁচবার দুধপানের মাধ্যমে হারাম হওয়ার বিধান রহিত না হতো, তাহলে পাঁচবার দুধপান করলে হারাম হওয়ার আয়াত কুরআনে থাকতো এবং নামাজে সে আয়াত তেলাওয়াত করা জায়েজ হতো। অথচ সব উম্মত এ কথার ওপর একমত যে, কুরআনের কোথাও এ আয়াত নেই এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করাও জায়েজ নেই। এমন কোনো আয়াতকে বর্তমানে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত

[১৭১] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড :৭, পৃষ্ঠা : ৪৬৭, হাদিস : ১৩৯১৪।
[১৭২] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড :৭, পৃষ্ঠা : ৪৬৮, হাদিস : ১৩৯১৬।

করা বৈধ নয়। এমনকি মারদিনি রহ. বলেন, ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর এমন কোনো কথা কুরআন-হাদিসের কোথাও নেই। সুতরাং আয়শা রা.-এর বর্ণনা এ কথার দলিল যে, প্রথমে দশবার দুধপানের শর্তসম্বলিত আয়াত কুরআনে নাজিল হয়েছিলো। তারপর পাঁচবার দুধপান সম্পর্কিত আয়াতটি দশবারের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। আর সর্বশেষ সংখ্যার শর্তহীন আয়াত কুরআনে রয়েছে। আর বর্তমানে কোনো ধরনের সংখ্যার শর্ত ছাড়াই দুধপান করা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হবে।

কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, আয়শা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসের শেষে স্পষ্টভাষায় এ কথা রয়েছে যে, পাঁচবার দুধপান করলে হারাম হওয়ার আয়াতটি রহিত হয়নি। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের সময়ও সেটি ছিলো। কেননা আয়শা রা. সেখানে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'فتوفي رسول الله . صلى الله عليه وسلم . وهن فيما يقرأ من القرآن.' 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের সময় পাঁচবার চোষা সম্পর্কিত আয়াতের তেলাওয়াত কুরআনে ছিলো।'[১৭৩] এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো যে, এই হাদিসের শেষ শব্দের বর্ধিত অংশের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু আবু বকর; একক ব্যক্তি। আর এ কথা স্পষ্ট যে, বর্ণনাতে তার ভুল হয়েছে। এই হাদিসের বিপরীত 'মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক'-এ এই হাদিস রয়েছে। 'ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه و سلم' এখান থেকে বোঝা যায় যে, এই বর্ণনার বর্ধিত অংশ বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে হয়েছে। অথবা আবদুল্লাহ ইবনু আবু বকর রহ.-এর পক্ষ থেকে হয়েছে। যেমনটি উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় তার বিশ্লেষণ আসবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা যদি এ কথা মেনে নিই যে, বর্ধিত অংশটি সঠিক। তাহলেও তার উদ্দেশ্য হবে, পাঁচবার দুধপানের বিষয়ের হাদিসটি রহিত হওয়ার সময়কালটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের সময়ের অতি নিকটবর্তী ও নতুন ছিলো। যে কারণে অনেক সাহাবি তা রহিত হওয়ার বিষয়ে অবগত ছিলেন না। ফলে তারা উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত

[১৭৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৬৭০।

করতেন।[১৭৪] অন্যথায় কোনো ব্যক্তি কি এ কথার কল্পনা করতে পারে যে, আবু বকর রা. পবিত্র কুরআন সংকলনের সময় তার কোনো একটি অংশ বাদ দিয়েছেন! যখন সেটি তারই মেয়ে জানতেন এবং অনেক সাহাবিরা. সেটিকে নামাজে তেলাওয়াত করতেন। আল্লাহর কসম! তা কখনোই হতে পারে না। এমনটি কল্পনা করাও অসম্ভব।

তারপর খোদ শাফিয়ি মাজহাবের আলেমগণও এ কথা স্বীকার করেন যে, পাঁচবার দুধপানের শর্তের আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের ধারণা হলো, এ আয়াতটি 'রজম'-এর আয়াতের মতো শুধু তার তেলাওয়াত রহিত হয়েছে এবং তার বিধান আজ অবধি বাকি আছে। কিন্তু আপনারা এ কথা খুব ভালোভাবে জানেন যে, নিয়ম হলো কোনো আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হওয়ার সঙ্গে তার হুকুমও রহিত হয়ে যায়। আর তেলাওয়াত রহিত হওয়ার পর তার হুকুম বাকি থাকার জন্য ভিন্ন দলিলের প্রয়োজন পড়ে। আর এখানে এমন কোনো দলিল নেই। আবার এ আয়াতকে 'রজমের' আয়াতের ওপর কিয়াস করা সহিহ নয়। কেননা 'রজমের' আয়াতের হুকুম বাকি থাকার বিষয় অকাট্য এবং মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সে ব্যাপারে সারগর্ভ বিশ্লেষণ তার জায়গায় করা হবে ইনশাআল্লাহ। একইসঙ্গে এ কথাও প্রমাণিত যে, 'রজমের' আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হওয়ার পরও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রজমের' হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং কোনো হাদিসে কি এমন প্রমাণ আছে যে, পাঁচবার দুধপান করানোর আয়াত রহিত হওয়ার পর দুধপান করানোর ব্যাপারে ভিন্নভাবে পাঁচবার দুধপান করানোর শর্তারোপ করা হয়েছে? বরং আলি রা.-এর হাদিস পাঁচবার দুধপান করানো সম্পর্কিত হাদিসটি রহিত হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলেছেন, যে হুকুম রহিত হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচবার দুধপান করানোর শর্তটিও রহিত হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতকে 'রজমের' আয়াতের ওপর কীভাবে কিয়াস করা যায়?

যদি এমন প্রশ্ন করা হয়, আয়শা রা. থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, অল্প দুধপানের কারণে তিনি হারাম সাব্যস্ত করার পক্ষে নয়। তাহলে তিনি এমন

[১৭৪] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩। শরহু নববি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৯।

মতামত কীভাবে গ্রহণ করলেন? অথচ তিনিই তো দশবার দুধপান করানোর বিষয়ে বর্ণিত হাদিসের বর্ননাকারী। এ প্রশ্নের ব্যাপারে আমরা বলবো যে, ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. তার উত্তর দিয়ে বলেন, আয়শা রা. বড়োদের (দুধপানের সময়সীমা অতিক্রম করার পর) দুধপান করার কারণে হারাম সাব্যস্ত হওয়ারও প্রবক্তা ছিলেন। তবে অন্যান্য নবিপত্নীগণ এমন মতামত পোষণ করেননি। আমাদের (হানাফি) ও শাফিয়িদের কাছে বয়সে বড়ো ব্যক্তি দুধপান করার কারণে হারাম সাব্যস্ত হওয়া বিষয়ক হাদিসের ব্যাপারে রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। সুতরাং আয়শা রা.-এর হাদিসে দুধপানের সীমার বিষয়টি রহিত হয়ে গেছে।[১৭৫]

অধম (মুফতি তকি উসমানি) এই আরজ করছি যে, ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. উপরে যা কিছু বলেছেন, সেটি সহিহ হওয়ার স্বপক্ষে দলিল হলো এই হাদিস। যা ইমাম ইবনু মাজাহ রহ. স্বীয় 'সুনানে' দুধপান অধ্যায়ে আয়শা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন—

لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا.

'অর্থাৎ, রজম ও বড়োদের দুধপানের আয়াতটি দশবারের শর্তে নাজিল হয়েছিলো।'[১৭৬] উল্লিখিত হাদিসে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, দশবার দুধপান বিষয়ক হাদিসটি বড়োদের সম্পর্কিত ছিলো।

ইমাম মালিক রহ. কর্তৃক 'মুয়াত্তা' কিতাবে বর্ণিত হাদিস দ্বারাও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَتْ أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ على قَالَ سَالِمٌ فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

'নাফে রহ. থেকে বর্ণিত। সালেম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমর তাকে বলেন আয়শা রা. তার নিজ বোন উম্মে কুলসুম রা.-এর কাছে তাকে এ

[১৭৫] আহকামুর কুরআন, ইমাম জাস্‌সাস রহ. খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬২।

[১৭৬] সুনানে ইবনু মাজাহ, অধ্যায় : দুধপান, হাদিস : ১০৪৪।

কথা বলে পাঠালেন যে, সে যেন (সালেমকে) দশ-বার দুধপান করিয়ে দেয়। যেন সে আমার (আয়শা রা.) কাছে যাতায়াত করতে পারে। (কেননা তখন আমি তার দুধ সম্পর্কিত খালা হয়ে যাবো) (সালেম বলেন) উম্মে কুলসুম রা. আমাকে তিনবার দুধপান করানোর পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুতরাং তিনি তিনবারের অধিক আমাকে দুধপান করাতে পারেননি। উম্মে কুলসুম রা. আমাকে দশবার দুধপান না করানোর কারণে আমি আয়শা রা.-এর কাছে যাতায়াত করতাম না।[১৭৭]

লক্ষ করুন! আয়শা রা. সালেমকে তার কাছে যাতায়াত করতে নিষেধ করতেন কেন? তার কারণ হলো, সে বড়ো হওয়ার কারণে দশবার দুধপানের সংখ্যা পূর্ণ করেনি। এতদ্বসত্ত্বেও মুসলিম শরিফের হাদিসে আয়শা রা. দশবার দুধপানের শর্তের হাদিসটি রহিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাষায় বলেছেন। সুতরাং এটি এ কথা প্রমাণ করে যে, আয়শা রা. ছোটো বাচ্চার দুধপানের ক্ষেত্রে দশবারের শর্তটি রহিত হওয়ার পক্ষে ছিলেন। আর বড়োদের বিষয়ে উল্লিখিত হুকুম বাকি থাকার প্রবক্তা ছিলেন। ইমাম বাইহাকি রহ. বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে এ কথাটির সমর্থন পাওয়া যায়।

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم صرن إلى خمس يحرمن وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.

'আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারাম সাব্যস্ত করার কারণ হিসেবে কুরআনে নির্দিষ্ট দশবার দুধপানের কথা নাজিল হয়েছিলো। তারপর নির্দিষ্ট পাঁচবার দুধপানের কথা নাজিল হয়। কোনো ব্যক্তি পাঁচবার দুধপান করা ছাড়া আয়শা রা.-এর কাছে প্রবেশ করতে পারতো না।'[১৭৮]

কেউ যদি এ কথা বলে যে, দুধপানের ক্ষেত্রে ছোটো-বড়োর মধ্যে পার্থক্য করার কারণ কী? অথচ আয়শা রা.-এর কাছে ছোটো-বড়ো দুটি ক্ষেত্রেই হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায় দুধপানেরই কারণে। এমন প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো, উভয়ের মধ্যে তার পার্থক্য করার সম্ভাবনাময় কারণ হলো, বড়ো

[১৭৭] মুয়াত্তা মালেক, হাদিস : ২২৩৯।

[১৭৮] মুয়াত্তা মালেক, হাদিস : ২২৫৩।

মানুষের দুধপানের ক্ষেত্রে তিনি সালেম মাওলা আবু হুজাইফা রা.-এর ঘটনার মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহলা বিনতু সুহাইলকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ' 'তাকে পাঁচবার দুধপান করিয়ে দাও।' যেমনটি মুয়াত্তা মালিক কিতাবের বর্ণনায় আছে।[১৭৯] অথবা নির্দেশ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ' 'তাকে দশবার দুধপান করিয়ে দাও।' যেমনটি আহমাদ রহ. ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণনায় আছে।[১৮০] বড়োদেরকে দুধপান করানোর বিধানটি যেহেতু কিয়াস-বহির্ভূত ছিলো। সে কারণে আয়শা রা সেটিকে স্ব-অবস্থানে) সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এ কারণে সতর্কতার প্রতি লক্ষ রেখে এমন কাউকে নিজের কাছে আসতে দিতেন না, যাকে দশবার দুধপান করানো পূর্ণ হয়নি। আর এ কারণে শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ. বলেন—

الأظهر أن عائشة و حفصة إنما كانتا تذهبان إلى عشر رضعات تورعا وتشفيا للخاطر، لا من جهة حكم الشرع.

'স্পষ্ট কথা এই যে, আয়শা ও হাফসা রা. দশবার দুধপানের মতামত গ্রহণ করেছেন সতর্কতামূলক এবং অন্তরের স্থিরতার জন্য। শরয়ি হুকুমের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।'[১৮১] সারকথা হলো, এ ছিলো আহকারের (আমার) কাছে স্পষ্ট হওয়া মাসআলার বিবরণ। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, আয়শা রা. ছোটোদের দুধপানের ক্ষেত্রেও এমন সীমাবদ্ধতার পক্ষে ছিলেন। তাহলে বলবো এটি ছিলো তার ইজতিহাদি মতামত। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আলি, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর মতো বিজ্ঞ ফকিহ সাহাবিদের অভিমত তার অভিমতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই শেষ পর্যন্ত এ কথা বলা যেতে পারে যে, হুকুমটি রহিত হওয়ার বিষয়ে আয়শা রা.-এর জানা ছিলো না। উল্লিখিত ফকিহ সাহাবিগণ সেটি সম্পর্কে জানতেন। আর নিয়ম অনুযায়ী 'হ্যাঁ' সূচক 'না' সূচকের ওপর প্রাধান্য পায়। (আয়শা রা.-এর অভিমতটি 'না' সূচক। আর সাহাবিদের অভিমত 'হ্যাঁ' সূচক।

---

[১৭৯] মুয়াত্তা মালেক, হাদিস : ২২৪৮।

[১৮০] ফাতহুর রাববানি, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ১৮৫।

[১৮১] আল-মুসাওওয়া শরহু মুয়াত্তা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০।

বিধায় সাহাবিদের অভিমত প্রাধান্য পাবে)

৫. যারা আয়শা রা. থেকে পাঁচবার দুধপানের শর্তে হারাম সাব্যস্ত হওয়ার মতামত নকল করেন। তারা সালেম ইবনু আবদুল্লাহ ও উরওয়াহ ইবনু জুবায়ের রা. থেকে বর্ণনা নকল করেন। আর এ দুজন কমবেশি উভয় ক্ষেত্রে হারাম সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে ছিলেন। সালেম ইবনু আবদুল্লাহ-এর বিষয়ে আলোচনার শুরুতে আমরা 'মুদাওয়ানাতুল কুবরা' থেকে এ কথা নকল করেছি যে, সালেমের অভিমত প্রথম শ্রেণির অভিমতের মতোই। আর উরওয়া ইবনু জুবায়ের-এর ব্যাপারে তো ইমাম মালিক রহ. তার 'মুয়াত্তা' কিতাবে বর্ণনা করেন—

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.

'ইবরাহিম ইবনু উকবা থেকে বর্ণিত। তিনি দুধপানের বিষয়ে সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রা.-কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রা. বলেন, দু-বছরের মধ্যে যা পান করানো হবে সেটিই হারাম করে দেবে। যদিও না সে ক্ষেত্রে এক-ফোটা পান করানো হয়। আর দু-বছরের পরে যা পান করানো হবে, সেটি খ্যাদ্যের মতো বলে বিবেচ্য হবে। ইবরাহিম ইবনু উকবা বলেন, পরবর্তী সময়ে আমি উরওয়া ইবনু জুবায়ের রা.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রা.-এর মতো উত্তর দেন। ...ইমাম তহাবি রহ. বলেন, উরওয়া রা.-এর কাছে উল্লিখিত বর্ণনার হুকুম রহিত হওয়ার কারণেই তিনি নিজের বর্ণনার বিরোধিতা করেছেন।[১৮২] নির্ভুল কী তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

[১৮২] আল-জাওহারুন নাকি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৫৫।

ইসলামে দাসত্বের বাস্তবতা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

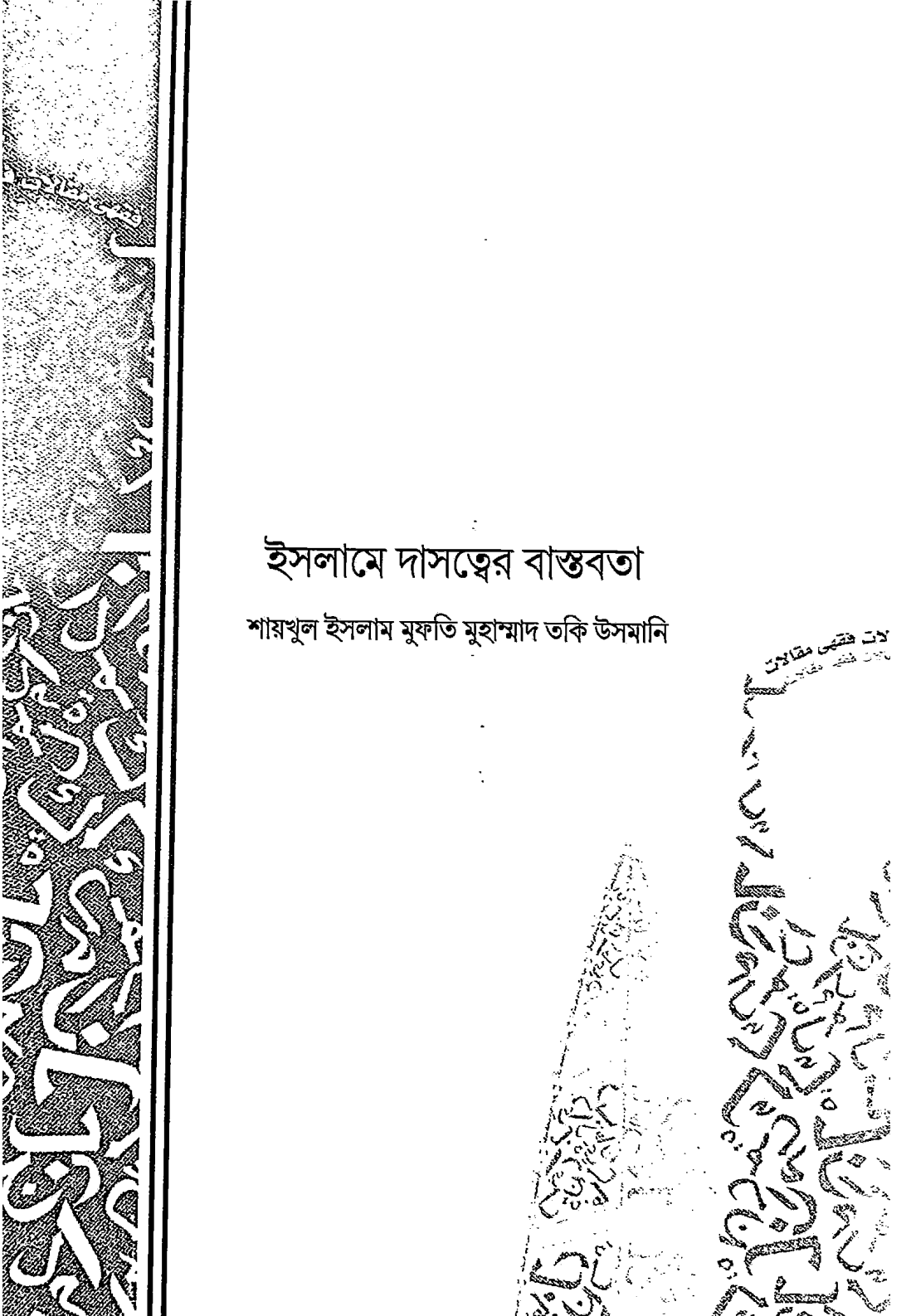

'ইসলামে দাসত্বের বাস্তবতা' প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) 'الرق في الاسلام' শিরোনামে 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপস্থাপন করেন।

—আবদুল্লাহ মায়মান

ইসলামে দাসত্বের বাস্তবতা

[দাসত্বের মাসআলাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমারা যেহেতু ইসলামের বিপক্ষে বহু প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে। তাই শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) এ বিষয়ে 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানে তার অনুবাদ তুলে ধরা হলো।]

হামদ ও সালাতের পর—

পশ্চিমারা ও তাদের দোসররা ইসলামের যেসব মাসআলার বিপক্ষে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে, তার মধ্যে একটি মাসআলা হলো ইসলাম কর্তৃক দাসত্বের মাসআলাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া। ফলে বর্তমানে মানুষদের এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, 'দাসত্বের' মাসআলা ইসলামের গৌরবময় কপালে একটি কালিমার-ন্যায় এবং ইসলামের বিপক্ষে খারাপ ধারণা সৃষ্টির একটি মাধ্যম। এ কারণে আমি 'দাসত্বের বাস্তবতা এবং ইসলামে তার অবস্থান'কে এই প্রবন্ধে পেশ করবো। যাতে মানুষের সামনে তার বাস্তবতা প্রকাশিত হয়।

প্রকৃত অর্থে পশ্চিমারা ও তাদের দোসরদের ভুলের মূল কারণ হলো, তারা ইসলামি সামাজিক ব্যবস্থার দাসত্বকে ইউনানি, রোম ও ইউরোপীয় দাসত্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। যারা চরম নির্যাতন ও জুলুমের মধ্যে জীবনযাপন করতো। যাদের মানুষ পর্যন্ত মনে করা হতো না। তাদের জন্য কোনো ধরনের অধিকার স্বীকার করা হতো না। সামাজিক জীবনে তাদের সামান্যতম কোনো অবস্থান ছিলো না।

মূলকথা, ইসলামের দাসত্বের মাসআলা ইউরোপিয়দের দাসত্বের মাসআলার সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্কে রাখে না। স্বয়ং পশ্চিমাদের অনেক ইনসাফদার ব্যক্তিরা এ কথাটি স্বীকার করে। 'গোস্তাও লিবোন' (G.Lebon) ফরাসি ভাষায় রচিত তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তামাদ্দুনে আরব' 'Civilization of Arab' (আরবের সংস্কৃতিতে) লেখেন—

'আমাদের বইয়ের ইউরোপীয় পাঠকদের সামনে (গোলাম) দাস শব্দের সঙ্গে এমন এক শ্রেণির চিত্র সামনে চলে আসে, যারা শিকলে আবদ্ধ। খাদ্যের পরিবর্তে... খাচ্ছে। যাদের থাকার জায়গা মনে করা হয় ভূগর্ভস্থ গৃহকে।

এখানে আমি এ কথার রহস্য উদঘাটন করতে চাচ্ছি না যে, উল্লিখিত চিত্রটি সেসব দাসদের, যারা কয়েক বছর আগে আমেরিকার ইংরেজদের কাছে শিকলে আবদ্ধ ছিলো। কথাটি সঠিক নাকি ভুল। এটি যুক্তিসংজ্ঞত কি না যে, এসব দাসদের মালিক তাদের সঙ্গে এমন লজ্জাজনক ব্যবহার করতো এবং এমন একটি পুঁজি ও সম্পদকে ধ্বংস ও বরবাদ করতো। যেমনটি ছিলো আগেকার হাবশিদের অবস্থা। আমি শুধু এ কথা বলতে চাই যে, খ্রিস্টানদের দাসত্বের চিত্র থেকে মুসলিমদের দাসত্বের চিত্রটি একেবারেই ভিন্ন।'

যাই হোক! এ পৃথিবীতে যখন ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো, তখন গোটা দুনিয়ায় ছিলো দাসপ্রথার সয়লাব। দাসদের সঙ্গে এমন নিচু ও খারাপ আচরণ করা হতো, যা শুনে মানবিকতার ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো। ইসলাম এসে প্রজ্ঞার সঙ্গে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দাসত্বকে একেবারেই হারাম করেনি এবং তাকে সমূলে শেষও করেনি। বরং তার জন্য শরিয়ত বিশেষ বিধান ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে এর পরিণামে তারা মানবতার সফলতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতিতে অংশ নিতে পারে।

কাউকে দাস বানানোর বিষয়টিকে ইসলাম শর্তের সঙ্গে বৈধ বলেছে তা হলো, কাফেরদের মোকাবিলায় যে শরয়ি জিহাদ হবে। সেখানে গ্রেফতার হওয়া সৈন্যদেরকে দাসে পরিণত করা যাবে। (এ ছাড়া অন্যদেরকে দাস বানানো যাবে না।) অথচ রোমকদের নিয়ম ছিলো, যুদ্ধে বন্দি ছাড়াও গুনাহ করার কারণে মানুষদেরকে দাসে পরিণত করা হতো। এবং বাঁদিদের থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানদেরকেও গোলাম বানানো হতো। আর ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, কাফেরদের মোকাবিলায় শরয়ি জিহাদে যে সব যোদ্ধারা বন্দি হবে, তাদের ছাড়া

আর কাউকে দাসে পরিণত করা জায়েজ নেই।

তা ছাড়া জিহাদের ময়দানে বন্দি শত্রুদের জন্য ইসলামে যে তাদেরকে দাসে পরিণত করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই বিষয়টি এমন নয়। বরং এ বিষয়ে আমিরুল মুমিনিনকে ইসলাম চার ধরনের কর্তৃত্ব দিয়েছে—

ক. তাদেরকে হত্যা করা হবে।

খ. দাসে পরিণত করা হবে।

গ. মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ঘ. তাদের থেকে কোনো ধরনের মুক্তিপণ নেওয়া ছাড়াই অনুগ্রহ করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সুতরাং বন্দিদের দাসে পরিণত করাকে ইসলাম কোনো ফরজ বা ওয়াজিব বিধান হিসেবে ধার্য করেনি। বরং উল্লিখিত চারটি বৈধ পন্থার একটি হলো দাসে পরিণত করা।

প্রকৃত অর্থে যুদ্ধের বিষয়টি একটি বিদঘুটে বিষয়। অনেক সময় এমন অবস্থা সামনে আসে যে, বন্দিদেরকে দাসে পরিণত করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কারণ, যদি সব বন্দিকে হত্যা করা হয়, তাহলে জনশক্তিকে ধ্বংস করা হয়। আর যদি সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কাফেরদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং মুসলিমদের বিপক্ষে তাদের যুদ্ধ করতে সহযোগিতা করা হয়। আবার তাদেরকে যদি একেবারে বন্দি করে রাখা হয়, তাহলে তাদের যোগ্যতাকে নষ্ট করা এবং কোনো ধরনের উপকার অর্জন ছাড়া তাদের পেছনে সম্পদ নষ্ট করতে হয়। কিন্তু যদি শর্ত ও সীমারেখা ঠিক রেখে তাদেরকে দাসে পরিণত করা হয়, তাহলে উল্লিখিত সমস্যাগুলো সামনে আসে না। যেহেতু দাসত্বের মাধ্যমে তারা তাদের মানবিক জীবন পাবে। আর এর মাধ্যমে ইসলামি আদর্শও পেয়ে যাবে। অন্যদিকে সেসব দাসদের মাঝে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতার মাধ্যমে সমাজ সংস্করণে শক্তি সঞ্চয় হবে। এ কারণে ইসলাম চারটি দরজা খুলে দিয়েছে। আর সমকালীন শাসককে এই স্বাধীনতা দিয়েছে যে, উল্লিখিত চার পদ্ধতির মধ্যে অবস্থার বিবেচনায় উত্তম পদ্ধতিটি গ্রহণ করবে।

এভাবে দাসদের জন্য ইসলাম এমন অধিকারের কথা বলেছে, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো জাতি বা ধর্মে নেই। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي

الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

'পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, নিকটতম প্রতিবেশি, দূরতম প্রতিবেশি, কাছে উপবেসনকারী, মুসাফির এবং তোমাদের হাত যাদের মালিক (দাস), তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'[১৮৩]

হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.

'তোমাদের দাস তোমাদেরই ভাই। মহান আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যার ভাই তার অধীন থাকবে তার উচিত হবে, সে নিজে যা খাবে তাকে তা খাওয়াবে। নিজের পরিধেয় পোশাকের অনুরূপ তাকে পরাবে। তার সাধ্যের বাইরের কোনো কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেবে না। আর যদি এমন কাজ তার থেকে নিতে চাও, তাহলে তুমি নিজে তাকে সাহায্য করো।'[১৮৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لا يدخل الجنة سيئ الملكة يعني الذي يسيئ إلى مملوكه قالوا : يا رسول الله ! أليس أخبرتنا أن هذه الامة أكثر الامم مملوكين ويتامى ؟ قال : نعم . فأكرموهم ككرامة أولادكم . وأطعموهم مما تأكلون.

'অধীন দাসের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আমাদেরকে এ সংবাদ দেননি যে, অন্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের মধ্যে দাস ও এতিমের সংখ্যা বেশি হবে? (তারপরও তাদের সবার সঙ্গে কীভাবে ভালো ব্যবহার হবে? বরং তাদের কারও সঙ্গে ভালো

[১৮৩] সুরা নিসা, আয়াত : ৩৬।

[১৮৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩০।

ব্যবহার আবার কারও সঙ্গে মন্দ আচরণ করতে হবে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, (আমি বলেছি) তবে তোমরা তাদেরকে নিজের সন্তানের মতো দেখবে এবং তোমাদের খাদ্য থেকেই তাদেরকে খাওয়াবে।'[১৮৫]

অন্য একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.

'যে ব্যক্তি তার দাসকে চড় মারবে বা প্রহার করবে, তার কাফ্ফারা হলো ওই দাসকে আজাদ (মুক্ত) করে দেওয়া।'[১৮৬]

দাসদের অধিকারের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই সতর্ক ছিলেন যে, দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় শেষ যে কথা, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র মুখ থেকে বের হয়েছিলো, সেটি দাসদের অধিকার আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে ছিলো। আনাস রা. বলেন—

كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه و سلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه (الصلاة . وماملكت أيمانكم).

'যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন তখন এই অসিয়ত করেন যে, 'নামাজের প্রতি যত্নবান হও এবং তোমাদের অধীন দাসীদের প্রতি লক্ষ রাখো।'[১৮৭]

আলি রা. বলেন—

قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم « الصلاة وما ملكت أيمانكم.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা ছিলো নামাজের হেফাজত করো এবং দাসদের প্রতি লক্ষ রাখো।'[১৮৮]

'সুনানে আবু দাউদ'-এ হাদিসটি নিচের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে—

---

[১৮৫] সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৩৬৯১।
[১৮৬] সুনানেআবু দাউদ, হাদিস : ৫১৬৮।
[১৮৭] সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস : ২৬৯৭।
[১৮৮] সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৬৯৮।

عن علي قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم «الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم».

'নামাজের হেফাজত করো। নামাজের হেফাজত করো। দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।'[১৮৯]

হাদিসের কিতাবসমূহে এ ধরনের অগণিত হাদিস বিদ্যমান। যার সবগুলো এখানে একত্রিত করা সম্ভব না। সারকথা এই যে, ইসলাম দাসত্বের নীতিকে একেবারেই পরিবর্তন করে মালিক ও তার অধীনের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও বন্ধুসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে ইসলামে কেবল দাসত্বের শব্দটিই বাকি রয়েছে। বরং ইসলাম দাস (গোলাম) নামটিই পরিবর্তন করে দিয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل.

'তোমাদের কেউ যেন তার অধীন দাসকে 'আবদি, আমাতি' (আমার গোলাম, আমার বাদি) বলে না ডাকে। আর কোনো অধীন দাস যেন তার মালিককে 'রব্বি, রব্বাতি' (আমার প্রভু) বলে না ডাকে। দাস তার মালিককে 'সাইয়িদি, সাইয়িদাতি' (আমার নেতা, আমার নেত্রী) বলে ডাকবে। কেননা তোমরা সবাই হলে দাস, আর 'রব' (প্রভু) হলো মহান আল্লাহ।'[১৯০]

দাস সম্পর্কিত উল্লিখিত বিধান শুধু কিতাবের পৃষ্ঠায় সংরক্ষিত নয়। বরং ইতিহাসের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমগণ তার ওপর আমল করে দেখিয়েছে। মুসলিমগণ তাদের দাসদের সঙ্গে আপন ভাইয়ের মতো ব্যবহার করতেন। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে আপনি এমন অনেক দাস দেখতে পাবেন, যারা দাস হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্য ও সম্মানের অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছেন। অনেক দাস ইলম ও মারেফাতের এমন ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেছেন যে, স্বাধীন মানুষেরা পর্যন্ত তার কাছে

---

[১৮৯] সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : আদব, পরিচ্ছেদ : দাসদেও অধিকার.. , হাদিস : ৫১৫৬।

[১৯০] সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : আদব, পরিচ্ছেদ : দাস যা বলবে না.. , হাদিস : ৪৯৭৫।

সমাধান চাওয়া শুরু করেছে। অনেক দাস ইসলাম গ্রহণ করার পর এমন জীবন লাভ করেছেন, যা দেখে স্বাধীন মানুষ ঈর্ষা করতে শুরু করেছে। আমাদের পুরো ইতিহাস এমন দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। স্বাক্ষী হিসেবে যা যথেষ্ট।

এ ছাড়াও দাসদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা ইসলামি ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোনো যুগের সঙ্গে বিশেষিত থাকেনি। বরং পুরো ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রত্যেক যুগ ও সময়ে দাসদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গেছে। যার মধ্যে ইসলামি সমাজব্যবস্থাতে দাস প্রথাকে বৈধ করার হেকমত ও রহস্য স্পষ্ট ফুটে ওঠে। সুতরাং যে ব্যক্তি 'আসমাউর রিজাল' এবং হাদিস বর্ণনাকারীদের অবস্থা অধ্যয়ন করেছে, সে দেখেছে যে, সেসব আলেম ও বর্ণনাকারীদের একটি বড়ো অংশ হলো আজাদকৃত (মুক্ত) দাস। যেমন : মক্কা মুকাররমায় আতা ইবনু আবু রবাহ রহ.। ইয়েমেনে তউস ইবনু কাইসান রহ.। মিশরে ইয়াজিদ ইবনু হাবিব রহ.। শামে মাকহুল রহ.। হিজাজে জাহহাক ইবনু মুজাহেম রহ.। এদের প্রত্যেকেই আজাদকৃত (মুক্ত) দাস ছিলেন। তারা সবাই একই যুগের মানুষ এবং নিজ এলাকায় ইলম ও ফিকহের সর্বোচ্চ স্থানে উত্তীর্ণ ব্যক্তি।

ইসলাম দাসের অধিকার বলার পাশাপাশি তাদেরকে বেশি বেশি আজাদ (মুক্ত) করতে উৎসাহ দিয়েছে। যেমন : জাকাতের সম্পদ ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে দাস আজাদকে একটি স্বতন্ত্র খাত হিসেবে নির্ধারণ করেছে। সব ধরনের কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে দাস আজাদকে সবার আগে বলা হয়েছে। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস-দাসিকে চড় মারার কাফফারা-স্বরূপ তাকে আজাদ করে দেওয়ার বিধান দিয়েছেন। যেমনটি আগের হাদিসে গেছে। দাস আজাদের ক্ষেত্রে এমন সব ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অনেক নেক আমলের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ফজিলত বর্ণনা করা হয়নি। হাসি-মজাক করে আজাদ করলেও বাস্তবিক পক্ষেই সেটিকে আজাদ হিসেবে ধরে নিয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময়ও বেশি বেশি দাস আজাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সহিহ বুখারির দাস আজাদ অধ্যায়ের 'সূর্যগ্রহণের সময় আজাদ করা উত্তম' পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কিত হাদিস রয়েছে।

এই উৎসাহ দানের ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবিগণ রা. অনেক বেশি দাস আজাদ করতেন। আজাদ করার জন্য সুযোগ খুজতেন। হাদিস শরিফে আছে—

فقال النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهما فقال يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن تعتقه قال فهو عتيق؟

'একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দুজন দাস আসে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল হাইসাম রা.-কে বললেন, তুমি এদের থেকে একজনকে নিয়ে নাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবি, আপনি একজনকে আমার জন্য নির্বাচন করে দিন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদার হতে হয়। (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন দাসের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন) একে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখেছি। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। আবুল হাইসাম রা. তাকে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা জানালেন। তখন তার স্ত্রী তাকে বললো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তুমি এই দাসকে আজাদ করা ছাড়া সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। এ কথা শোনামাত্র আবুল হাইসাম রা. বলেন, সে আজাদ।'[১৯১]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে—

أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك فقال أما إني أشهدك أنه حر.

'আবু হুরায়রা রা. যখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রওনা করেন, তখন তার দাস তার সঙ্গে ছিলো। পথিমধ্যে তারা একে অন্যের থেকে হারিয়ে যান। কিছু দিন পর তার দাস এমন সময় ফিরে আসে যখন আবু হুরায়রা

[১৯১] সুনানে তিরমিজি, অধ্যায় : জুহুদ, পরিচ্ছেদ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের জীবনযাপন। হাদিস : ২৩৬৯।

রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা, এই যে তোমার দাস। তোমার কাছে চলে এসেছে। এ কথা শুনে আবু হুরায়রা রা. বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, সে স্বাধীন (মুক্ত)।[১৯২]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জর রা.-কে একটি দাস দান করলেন। সেই সঙ্গে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা বললেন যে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু জর তাকে আজাদ করে দিলেন।'[১৯৩]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোনো দাসের মাঝে এমন কোনো গুণ দেখতেন, যা তার ভালো লাগতো, তখন তাকে আজাদ করে দিতেন। দাসরা তার এ বিষয়টি বুঝে গিয়েছিলো। তাই অনেক সময় কোনো দাস মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় করতো এবং সর্বক্ষণ মসজিদে থাকতো। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. তার এ ভালো অবস্থা দেখে তাকে আজাদ করে দিতেন। মানুষেরা তাকে বলতো, জনাব, এই দাস আপনাকে ধোঁকা দিতে এবং নিজেকে আজাদ করতে এমনটি করেছে। (প্রকৃত অর্থে মসজিদে বসে ইবাদত করা তার উদ্দেশ্য না) তাদের এমন প্রশ্নের উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলতেন,

من خدعنا بالله انخدعناله.

'মহান আল্লাহর মধ্যস্থতায় যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেবে আমরা তার ধোঁকায় পড়বো।'[১৯৪]

উসমান রা. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি প্রতি শুক্রবারে একজন করে দাস আজাদ করতেন।

যাই হোক! এগুলো হলো সেসব ঘটনার সামান্য নমুনা যা দ্বারা গোটা ইসলামি ইতিহাস পরিপূর্ণ। এ বিষয়ক সমস্ত ঘটনা এখানে জমা করা সম্ভব নয়। তবে এ

---

[১৯২] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : আজাদ করা। পরিচ্ছেদ : যখন দাসকে বলবে, সে অল্লাহর জন্য..., হাদিস : ২৫৩০।

[১৯৩] আদাবুল মুফরাদ, পরিচ্ছেদ : খাদেমকে ক্ষমা করা, হাদিস : ১৬৩। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২২৮১

[১৯৪] তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, আল্লামা নববি রহ. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮০। ত্বাকাতে ইবনু সাদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬৭।

সামান্য কিছু ঘটনা এ কারণে পেশ করলাম, যাতে ইসলামি সমাজব্যবস্থার সঠিক চিত্রটি সামনে আসে। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার কিতাব 'আন-নাজমুল ওহ্হাজ'-এ লেখেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বয়সের বছর সংখ্যা অনুযায়ী তিষট্টিজন দাস আজাদ করেন। আয়শা রা. ঊনসত্তরজন দাস আজাদ করেন। তার বয়সও হয়েছিলো ঊনসত্তর বছর। আবু বকর সিদ্দিক রা. বহু দাস আজাদ করেছেন। আব্বাস রা. সত্তরজন দাস আজাদ করেছেন।[১৯৫] উসমান রা.ও যখন বিরোধিদের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন, তখন বিশজন দাসকে আজাদ করেছিলেন। হাকিম ইবনু হিজাম রা. রুপার জিঞ্জির পরিহিত একশো দাস আজাদ করেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. এক হাজার দাস আজাদ করেন। এক হাজার ওমরা এবং ষাটটি হজ করেছেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উদ্দেশ্যে তিনি এক হাজার ঘোড়া প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। জুলকালা হিময়ারি রা. একদিনে আট হাজার দাস আজাদ করেন। আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. ত্রিশ হাজার দাস আজাদ করেন।[১৯৬]

কেবল উল্লিখিত আটজন মনীষী উনচল্লিশ হাজার তিনশো বাইশ জন দাস আজাদ করেছেন। এ সংখ্যার মাধ্যমে দাস আজাদ করার ব্যাপারে মুসলিমদের বদান্যতা অনুমাণ করা যায়। দাস আজাদে যে মুসলিমদের অবস্থা এই, তারা কি দাসদের সঙ্গে একজন ভদ্র ভাইয়ের মতো ব্যবহার করবে না?

মোটকথা, এ হলো ইসলামে দাসত্ব ও তার ফলাফল। এখন ইসলামে বৈধ দাসত্ব সম্পর্কে আমরা সেসব পশ্চিমাদের অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া পেশ করবো, যারা ইসলামে দাসত্বের চিত্র দেখেছেন।

১. ফ্রান্সের লেখক 'মোসিউ আবু' লেখেন—'ইসলামি রাষ্ট্রে দাসত্ব কোনো দোষের বিষয় ছিলো না। কুসতুনতুনিয়ার সব শাসক যারা আমিরুল মুমিনিন হয়েছে, তাদের সবাই দাসীর পেট থেকে জন্ম নিয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের বাহাদুরি ও সাহসে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অধিকাংশ সময় মিশরের শাসকবর্গ দাস ক্রয় করে তাদেরকে দেখাশুনা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন। নিজের মেয়েদেরকে তাদের সঙ্গে বিয়ে দিতেন। আপনি যদি কায়রোর শাসক, মন্ত্রি ও সেনাপ্রধানের প্রতি লক্ষ করেন, তাহলে তাদের একটি

[১৯৫] মুস্তাদরাকে হাকেম-এ বর্ণিত।

[১৯৬] ফাতহুল আল্লাম শরহু বুলুগিল মারাম, অধ্যায় : আজাদ করা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩২।

বড়ো অংশকে এমন পাবেন, শিশুকালে যাদেরকে আটশো থেকে বারোশো দিরহামের বিনিময়ে কেনা-বেচা করা হয়েছে।'

২. 'লেডি বিলনট' নামক একজন ইংরেজ নারী। আরব ভূমি ভ্রমণ করেছে। 'নজদ' নামক এলাকা ভ্রমণকালে একজন আরবের সঙ্গে তার যে কথাবার্তা হয়েছিলো সে সম্পর্কে সে লেখে—

'একটি বিষয় এমন, যা একেবারেই তার বুঝে আসেনি। সেটি এই যে, ইংরেজ সরকার কর্তৃক দাসদের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করার কী ফায়দা? আমরা বললাম, এটি কেবল মানবতার প্রতি ভালোবাসার দাবি। সে উত্তরে বললো, এটি ঠিক আছে। কিন্তু দাস ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কোনো ধরনের নির্দয়তা নেই। সে বারবার বলছিলো, কেউ কি দাসদের সঙ্গে আমাদেরকে খারাপ ব্যবহার করতে দেখেছে? বাস্তবতা হলো আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে আরবে দাসদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারলাম না। সত্যি বলতে আরবে দাস কর্মচারী নয়, বরং একটি আদরের বাচ্চা।'

এগুলো হলো সেসব ঘটনা, যা ড. গোস্তাও লিবন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তামাদ্দুনে আরব'-এ উল্লেখ করেছেন। শেষে তিনি বলেন—

'সেসব ইউরোপবাসী, যারা প্রাচ্যের দেশসমূহে দাস ব্যবসাকে বন্ধ করতে চায়। প্রকৃত অর্থে যদিও তারা মানুষের কল্যাণকামী, তাদের নিয়ত সঠিক কিন্তু প্রাচ্যের অধিবাসিরা এ কথা না মেনে বলে, কল্যাণকামী ব্যক্তিরা তো হাবশাবাসিদের ওপর বড়ো অনুগ্রহ করেছে কিন্তু অন্যদিকে এরাই চীনাদেরকে কামান ও ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে আফিম কিনতে বাধ্য করে এক বছরে যে পরিমাণ জীবনকে শেষ করে, দাসত্বের রীতিনীতি দশবছরেও সে পরিমাণ জীবন হত্যা করে না।'[১৯৭]

দাসত্বের বিধান কি রহিত হয়ে গেছে?

এই শেষ যুগে এসে ইউরোপের অনেক লোক ইসলামে দাসত্বের শর্ত, তার সীমারেখা, হেকমত এবং ইসলামি ইতিহাসে তার সুন্দর ফলাফল সম্পর্কে না জেনে বা না জানার ভান করে ইসলামের দাসত্ব-নীতির প্রতি অভিযোগ করে

[১৯৭] দেখুন! তামাদ্দুনে আরব। পৃষ্ঠা : ৪৩৪।

বসেছে। যে কারণে মুসলিমদেরই একটি দল (সেসব অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে) ইসলামের দাসত্ব বিধানের ওপর অভিযোগ তোলে আর পশ্চিমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, বর্তমানে ইসলাম দাসত্বের অনুমতি দেয় না। ইসলামের শুরু যুগে দাসত্বের অনুমতি ছিলো। পরবর্তী সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে সে অনুমতি রহিত হয়ে যায়। হিন্দুস্তানে সর্বপ্রথম এই অগ্রহণযোগ্য ও ভ্রান্ত দাবির কেতনধারী ও প্রচারক ছিলো 'চেরাগ আলি।' এ ব্যক্তি স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানের বন্ধু ও সাথীদের একজন ছিলো। সে উল্লিখিত দাবি প্রমাণের লক্ষ্যে নিজ গ্রন্থে 'আজামুল কালাম ফি ইরতিকাইল ইসলাম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখে। যেখানে এমন দুর্বল ও হালকা দলিল পেশ করে, যা পড়ে একজন বিষাদগ্রস্ত নারীরও হাসি পাবে। আমাদের জন্য সেসব দলিল উল্লেখ করা ও তা খণ্ডন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা যে ব্যক্তির গায়ে দীন ও ইলমে দীনের সামান্যতম আঁচড় লেগেছে, সে উল্লিখিত দলিলগুলো ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করবে না। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থে লেখক এমন একটি ভ্রান্ত কথা পেশ করেছে যা থেকে এমনটি হতে পারে যে, অনেকের কাছে তার বাস্তবতা অস্পষ্ট রয়ে যাবে। বিধায় সে ভুলটি উল্লেখ করে সেটির উত্তর দেওয়া ভালো মনে করছি।

সে ভুলটি হলো এই, সে সুরা মুহাম্মাদ-এর এ আয়াত দ্বারা দলিল দেয়—

﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

'এমনকি তোমরা যখন তাদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলবে তখন তাদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। এরপর চাইলে কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া তাদেরকে ছেড়ে দেবে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে।'[১৯৮]

তার দাবি হলো, উল্লিখিত আয়াতে বন্দিদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ শুধু দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। একটি হলো, কোনো ধরনের মুক্তিপণ ছাড়া ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় হলো, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এখানে যুদ্ধ বন্দিদেরকে হত্যা করা বা দাসে পরিণত করার কথা নেই। এখান থেকে বুঝা যায় যে, যুদ্ধ বন্দিদেরকে হত্যা করা বা দাসে পরিণত করার বিধান ছিলো ইসলামের শুরু যুগে। পরবর্তী সময়ে এ আয়াত উল্লিখিত দুই বিধানকে রহিত করে দিয়েছে।

এই ভুলটি যেহেতু অনেক লোককে ভুল বোঝাবোঝি বা সন্দেহে ফেলতে পারে।

---

[১৯৮] সুরা : মুহাম্মাদ, আয়াত : ৪।

তাই একটু বিস্তারিত পরিসরে এর উত্তর দেওয়া উচিত বলে মনে করছি।

মূলকথা হলো, উল্লিখিত আয়াতে দাসত্বকে হারাম করা বা এর অনুমতি রহিত করার স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. আমরা যদি উল্লিখিত আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাই যে, উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে দাসত্বকে নিষিদ্ধ করার মতো কোনো শব্দ নেই। কেননা 'إِمَّا' 'ইম্মা' শব্দটি সর্বক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার ওপর দলিল হতে পারে না। কেননা, শব্দটি একত্রিত করণের অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন এ কথা বলা হয় :

﴿جالس إما الحسن وإما زيد﴾

'বসা ব্যক্তি হাসান অথবা জায়েদ।' কিন্তু এ বাক্যটির মাধ্যমে তাদের দুজন ছাড়া অন্যদের সঙ্গে বসার বিষয়টিকে নাকচ করা হয় না।

ইবনু হিশাম রহ. বলেন, 'إِمَّا' 'ইম্মা' শব্দটি পাঁচ অর্থে ব্যবহার হয়।

ক. সন্দেহের অর্থ দেওয়ার জন্য। যেমন : 'جائني إما زيد و إما عمرو' 'আমার কাছে জায়েদ এসেছে বা উমর এসেছে।' এ বাক্যটি তখন বলা হয়, যখন আগন্তুক সম্পর্কে আপনার জানা নেই যে, সে কোন ব্যক্তি।

খ. অস্পষ্টতার অর্থ দিতে ব্যবহার হয়। যেমন : পবিত্র কুরআনের এ আয়াত—

﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عليهمْ﴾

'কিছু লোক এমন আছে, যাদের বিষয়টি মহান আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত মুলতবি থাকবে যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না কি তাদের তাওবা কবুল করা হবে।'[১৯৯]

গ. এই শব্দটি বাছাই করার অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, কাউকে দুটি কাজের যে-কোনো একটি নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। যেমন : পবিত্র কুরআনের এ আয়াত—

﴿إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾

---

[১৯৯] সুরা : তাওবা, আয়াত : ১০৬।

'তোমার স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছে করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারো। আবার ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করতে পারো।'[২০০]

অন্যত্র বর্ণিত হচ্ছে—

﴿إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾

'হয়তো তুমি আগে নিক্ষেপ করো, নয়তো আমরা আগে নিক্ষেপ করি।'[২০১]

ঘ. 'إِمَّا' শব্দটি বৈধতার অর্থে ব্যবহার করা হয়। সেটি ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হতে পারে। অথবা নাহবি (আরবি ব্যাকরণের) দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হতে পারে। নাহবি দিক থেকে বৈধতার দৃষ্টান্ত হলো, 'جالس إما الحسن وإما ابن سيرين' 'হয়তো হাসান, নয়তো ইবনু সিরিন-এর সঙ্গে ওঠাবসা করতে পারো।'

ঙ. 'إِمَّا' শব্দটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য আসে। যেমন : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে—

﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

আমি মানুষদের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। হয়তো তারা কৃতজ্ঞ হবে, নয়তো অকৃতজ্ঞ হবে।'[২০২]

উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, 'إِمَّا' 'ইম্মা' শব্দটি সীমাবদ্ধতার অর্থ দিতে আসে না। তবে যখন দুটি বিপরীতমুখি জিনিসের মাঝে আসে, তখন সীমাবদ্ধতার অর্থ দেয়। সেটি এ কারণে নয় যে, 'إِمَّا' 'ইম্মা' এর মাঝে সীমাবদ্ধতার অর্থ রয়েছে। বরং এ কারণে যে, যুক্তির নিরিখেই দুটি বিপরীতমুখী জিনিসের মধ্যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এ জন্য উল্লিখিত আয়াতে যে দুটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কোনো ধরনের বিরোধ না থাকায় তৃতীয় একটি জিনিসের মাধ্যমেও উভয়টির মধ্যকার সমস্যা দূর করা সম্ভব। এখান থেকেই বুঝা যায় যে, আয়াতের 'إِمَّا' 'ইম্মা' শব্দটি সীমাবদ্ধতার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং (উভয়টি একত্রিত

[২০০] সুরা : কাহাফ, আয়াত : ৮৬।
[২০১] সুরা : ত্বহা, আয়াত : ৬৫।
[২০২] সুরা : ইনসান, আয়াত : ৩।

হওয়া অসম্ভবের নীতির ভিত্তিতে) বৈধতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (অর্থাৎ, অনুগ্রহ করা বা মুক্তিপণ উভয়টিকে একত্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছে) উভয়ের মাঝে বিপরীতমুখীতার অর্থ দেওয়ার জন্য সেটিকে আনা হয়নি।

যখন এ বিষয়টি বোঝা গেলো, তখন এটিও স্পষ্ট হলো যে, উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে দুটি বৈধ পন্থার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাই আয়াতটি অন্যান্য পন্থা উল্লেখ করার ব্যাপারে নীরব রয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেনি। আর যুদ্ধ বন্দিদেরকে হত্যা করা বা তাদেরকে দাসে পরিণত করা অন্যান্য শরয়ি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত, সুতরাং এ আয়াত সেসব দলিলের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও না এবং সেগুলোকে অস্বীকারও করে না। যুদ্ধ-বন্দিদেরকে দাসে পরিণত করার বিষয়টি অন্যান্য অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। যার আলোচনা সামনে করা হবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং এ আয়াতের ওপর ভিত্তি করে দাসে পরিণত করার বৈধতাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব না।

উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ কেবল দুটি পদ্ধতির কথা তথা অনুগ্রহ করা (মুক্তিপণ নেওয়া ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া) বা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। অন্য দুটি পন্থা তথা হত্যা বা দাসে পরিণত করার কথা বলেননি। এমনটি করার হেকমত হলো, হত্যা ও দাসে পরিণত করার বিষয়টি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিলো। কুরআন নাজিলের সময় উল্লিখিত দুটি পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ ছিলো না। তবে অনুগ্রহ করা বা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মানুষের মনে সন্দেহ ছিলো। এ কারণে মহান আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতে সে দুটি পদ্ধতি জায়েজের কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহ. অন্যভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি তার তাফসিরে বলেন।[২০৩]

'إِمَّا' 'ইম্মা' শব্দটি সীমাবদ্ধতার অর্থ দেয়।[২০৪] কাফেররা বন্দি হওয়ার পর

---

[২০৩] মাফাতিহুল গইব, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫০৮।

[২০৪] যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে. 'إِمَّا' 'ইম্মা' সীমাবদ্ধতার জন্য আসে না। সুতরাং এখানে ইমাম রাজি রহ.-এর বিচ্যুতি ঘটেছে।

তাদের বিষয়টি দুটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং হত্যা, দাসে পরিণত করা, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া বা মুক্তিপণ ছাড়া দেওয়ার মধ্যে যে-কোনো একটি করা জায়েজ আছে। আমরা বলি, এটি হলো আসল হুকুম। অবশ্য উল্লিখিত আয়াতে শুধু ওই ব্যাপক হুকুম বয়ান করা হয়েছে, যা সব বন্দিদের ক্ষেত্রে জায়েজ। যেহেতু দাসে পরিণত করার বিধানটি আরব বন্দিদের ক্ষেত্রে জায়েজ নেই। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবি বংশোদ্ভূত ছিলেন। এ কারণে উল্লিখিত আয়াতে দাসের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আর হত্যার বিষয়টি হলো, সেটি রক্তপাতের সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াত 'فَضَرْبَ الرِّقَابِ' তাদের ঘাড়ে আঘাত করো।'[২০৫] উল্লেখ রয়েছে। (এ কারণে এখানে সেটি উল্লেখ করা হয়নি) সুতরাং উল্লেখ করার জন্য মাত্র দুটি বিষয় অবশিষ্ট রয়েছে। (একটি হলো কোনো ধরনের মুক্তিপণ নেওয়া ছাড়া ছেড়ে দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি হলো, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। আর এ দুটিকেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে)

২. এরপর আমরা যদি 'مَنًّا' 'অনুগ্রহ' শব্দের প্রতি লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাই উল্লিখিত শব্দটি কখনো কখনো দাসে পরিণত করার অর্থ দেয়। কেননা, 'مَنًّا' 'অনুগ্রহ'-এর অর্থ হলো, বন্দিকে কোনো আর্থিক মুক্তিপণ না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাকে হত্যাও করা হবে না। আর এ অর্থটি দাসে পরিণত করার মাঝেও পাওয়া যায়। কেননা, দাসে পরিণত করার মধ্যে তার থেকে কোনো ধরনের আর্থিক মুক্তিপণ নেওয়া হচ্ছে না এবং হত্যাও করা হচ্ছে না) এ কারণে জামাখশারি রহ. 'তাফসিরে কাশশাফ'[২০৬]-এ বলেন, 'مَنًّا' 'অনুগ্রহ' শব্দ থেকে এমনটি উদ্দেশ্য নেওয়া জায়েজ আছে যে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে হত্যা করা হবে না এবং দাসে পরিণত করা হবে। অথবা তাদের প্রতি এমন অনুগ্রহ করা হবে যে, তাদের থেকে ট্যাক্স গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে 'জিম্মিদের'[২০৭] আওতাভুক্ত করে রাখা হবে। যদি জামাখশারি রহ.-এর উল্লিখিত তাফসির গ্রহণ করা

---

[২০৫] সুরা : মুহাম্মাদ, আয়াত : ৪।

[২০৬] খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১৬।

[২০৭] মুসলিম দেশে ট্যাক্সের মাধ্যমে বসবাসরত অমুসলিম। (অনুবাদক)

হয় আর সেটি গ্রহণে কোনো ধরনের বাধাও নেই।[২০৮] তাহলে উল্লিখিত তাফসির অনুযায়ী আয়াতের মধ্যে দাসত্বের কথাও রয়েছে আয়াতটি দাসত্বকে নিষিদ্ধ করে না অথবা এর আলোচনা থেকে নীরবও নয়।

৩. এ আয়াতের পরে দাসপ্রথাকে বৈধতা দেয় এমন অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে। অনুগ্রহ করে বা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া বিষয়ক আয়াতটি যদি দাস প্রথাকে রহিত করতো, তাহলে পরবর্তী সময়ে দাস প্রথার বৈধতার ব্যাপারে অন্যান্য আয়াত নাজিল হতো না।

এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, অনেক তাবিয়ি, যেমন : সাইদ ইবনু জুবায়ের, ইমাম জহ্হাক ও ইমাম সালাবি রহ.-এর নিকট সুরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কি। যেমনটি ইমাম কুরতুবি রহ. তার তাফসিরে বলেছেন।[২০৯] আর সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসিরকারকদের মতে এই সুরাটি মাদানি। তবে এই সুরা বদরের যুদ্ধের নিকটতম সময়ে বা তার আগে নাজিল হয়েছে। যেমনটি 'তানবিরুল মিকইয়াস' কিতাবে ইবনু আব্বাস রা.-এর তাফসির এ কথা প্রমাণ করে।[২১০] অথবা সেটি

---

[২০৮] ওই তাফসিরটি হজরত হাসান বসরি রহ.-এর বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। কেননা, যুদ্ধ বন্দিকে হত্যা করা তিনি পছন্দ করতেন না। আর এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন। '' উল্লিখিত আয়াত দ্বারা তিনি এভাবে ইস্তেম্বাত করতেন যে, ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধান বা তার স্থলাভিষিক্ত) বন্দি হাতে আসার পর তাকে হত্যা করা উচিত নয়। কিন্তু ইমামকে আরও তিনটি বিষয়ের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

ক. হয়তো ওই বন্দিদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের থেকে মুক্তিপণ নেওয়া ছাড়া ছেড়ে দেবে।

খ. তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে।

গ. তাদেরকে দাসে পরিণত করবে। (তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২৩৮) উল্লিখিত তাফসির থেকে এ কথা বুঝে আসে যে, দাসে পরিণত করাকে তিনি অনুগ্রহের আওতাভুক্ত করেছেন। তাফসিরে ইবনু জারির, খণ্ড : ২৬, পৃষ্ঠা : ২৪-এ চিন্তা করলে এটিই বোঝা যায়। কেননা তার বক্তব্যেও এ কথার প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'مَنٌّ' 'অনুগ্রহ' শব্দটি সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

[২০৯] আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবি রহ., খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৩২৩।

[২১০] তানবিরুল মিকইয়াস, (চারটি তাফসিরের সমষ্টি প্রকাশিত, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৯৭) প্রসিদ্ধ আছে যে, তানবিরুল মিকইয়াসকে হজরত ইবনু আব্বাস রা.-এর দিকে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। এখানে সম্ভাবনার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বদরযুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে।[২১১] সুতরাং এই সুরা নাজিল হওয়ার সময়টি দ্বিতীয় হিজরির বাইরে নয়। অথচ নিচের আয়াতটি তার পরে নাজিল হয়েছে। মুহাররামাত সম্পর্কিত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন—

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

'সেসব নারী যাদের স্বামী আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। তবে তারা যদি তোমাদের দাসি হয়ে যায়, (তাহলে ইদ্দত শেষে তোমাদের জন্য এমন মহিলাকে বিয়ে করা জায়েজ আছে)।'[২১২]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ যুদ্ধ বন্দিদেরকে নিজেদের বন্দিত্বে রাখা এবং তাদেরকে দাসে পরিণত করাকে জায়েজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেটি অনুগ্রহ করা বা মুক্তিপণ নেওয়ার আয়াতের পরে নাজিল হয়েছে। অনুগ্রহ করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার আয়াতের মাধ্যমে যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে যেতো, তাহলে অষ্টম হিজরিতে তার বৈধতা কীভাবে নাজিল হলো?

সুরা আহজাবে মহান আল্লাহ বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عليكَ﴾

'হে নবি, আমি আপনার জন্য সেসব স্ত্রীদেরকে বৈধ করেছি, আপনি যাদের মোহর আদায় করেছেন। এবং মহান আল্লাহর দেওয়া গনিমত-স্বরূপ যেসব নারীর মালিক হয়েছেন সেসব নারীদেরকেও আপনার জন্য হালাল করেছি।'[২১৩]

এ আয়াতের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ সেসব নারীদেরকে দাসী বানানোর অনুমতি দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে ভাগে পান। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ যে, বদর যুদ্ধে নারীদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে পাওয়া যায়নি। উহুদ ও আহজাব যুদ্ধেও এমনটি পাওয়া যায়নি। বরং খায়বার ও তার পরবর্তী যুদ্ধে এমন সম্পদ অর্জন হয়। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে যে হুকুম দেওয়া

[২১১] তাফসিরে ইবনু কাসির, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭৩।
[২১২] সুরা : নিসা, আয়াত : ২৪।
[২১৩] সুরা : আহজাব, আয়াত : ৫০।

হয়েছে, তা অবশ্যই অনুগ্রহ করা বা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার আয়াতের পরে নাজিল হয়েছে। তারপরও এ আয়াতের পর মহান আল্লাহ বলেছেন—

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾

'তাদের পরিবর্তে অন্য মাহিলাকে গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ নয়। যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে। তবে অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়।'[২১৪]

ইবনু কাসির রহ. এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন, অনেক ওলামা যেমন : আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. মুজাহিদ রহ., ইমাম জহ্হাক রহ., ইমাম কতাদাহ রহ., ইবনু জায়েদ রহ., ইমাম ইবনু জারির রহ.-সহ আরও অনেকে বলেন, নবিপত্নীদেরকে যখন এই স্বাধীনতা দেওয়া হলো যে, তারা ইচ্ছে করলে দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিতে পারে আবার ইচ্ছে করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরকালকে বেছে নিতে পারে। ফলে নবিপত্নীগণও যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরকালকে গ্রহণ করেন, তাই তাদের এই ভালো কাজের পুরষ্কার-স্বরূপ এ আয়াত নাজিল হয়। নবিপত্নিগণ যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করলেন, তখন তাদের প্রতিদান-স্বরূপ মহান আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেসব পত্নিদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ও সংরক্ষিত করে দিলেন। তাদের ছাড়া অন্যদেরকে বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছেন। তাদের স্থানে অন্য কাউকে আনতেও নিষেধ করেছেন। যদিও অন্য মহিলাদের সৌন্দর্য তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ভালো লাগে। অবশ্য দাসী ও যুদ্ধ বন্দিদেরকে রাখতে কোনো নিষেধ নেই। পরবর্তী সময়ে মহান আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বাধা উঠিয়ে নেন এবং এ আয়াতের বিধানকে রহিত করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি দেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আর কোনো মহিলাকে বিয়ে করেননি। যেন নবিপত্নীদের ওপর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুগ্রহ অবশিষ্ট থাকে।[২১৫]

---

[২১৪] সুরা আহজাব, আয়াত : ৫২।

[২১৫] তাফসিরে ইবনু কাসির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫০১।

ইবনু কাসির রহ.-এর বক্তব্য এ কথার ওপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, এ আয়াতটি স্বাধীনতা প্রদানের আয়াতের পরে নাজিল হয়েছে। আর স্বাধীনতার বিধান সম্বলিত আয়াতের বিষয়ে এ কথা স্বীকৃত যে, সেটি ৯ম হিজরিতে নাজিল হয়েছে। যেমনটি হাফেজ ইবনু হাজার রহ. 'ফাতহুল বারি'তে তার বিশ্লেষণ করেছেন।[২১৬]

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতটি নিশ্চিত নবম হিজরি বা তার পরে নাজিল হয়েছে। আর এ আয়াতে বন্দি করা ও দাস বানানোর অনুমতি রয়েছে।

অন্যভাবে এ কথা বলা যায়, ইবনু কাসির রহ.-এর উল্লিখিত বক্তব্য স্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, এ আয়াত নাজিলের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোনো নারীকে বিয়ে করেননি। আর তিনি সর্বশেষ যে নারীকে বিয়ে করেছিলেন সে ছিলো মাইমুনা রা.। সপ্তম হিজরির ওমরাতুল কাজাতে তাকে বিয়ে করেন।[২১৭] তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ আয়াত সপ্তম হিজরির পর নাজিল হয়েছে। সুতরাং, অনুগ্রহ করা ও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার আয়াতের পরে এমন কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যার মধ্যে বন্দি করা এবং তাদেরকে দাসে পরিণত করার বৈধতা রয়েছে।

৪. অনুগ্রহ করা ও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক ক্ষেত্রে বন্দিদেরকে দাসে পরিণত করার বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন আহজাব যুদ্ধের কিছুদিন পরে সংঘটিত ঘটনাতে বনু কুরাইজার মহিলা ও তাদের সন্তানদেরকে বন্দি বানান। অনুরূপভাবে খায়বারের মহিলাদেরকে বন্দি করেন এবং সে বন্দিদের মধ্যে উম্মুল মুমিনিন ছফিয়্যা রা. ছিলেন। বনু মুস্তালিকের মহিলাদেরকে বন্দি করা হয় এবং তাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনিন জুআইরিয়া রা. ছিলেন। একইভাবে আওতাস গোত্রের মহিলাদেরকে বন্দি করা হয়। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। হাওয়াজিন গোত্রের মহিলাদেরকে বন্দি করা হয় এবং তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারীদের মাঝে বণ্টন করা হয়। তা ছাড়া রাসুল

[২১৬] তাবাকাতে ইবনু সাদ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৩২।

[২১৭] তাফসিরে সুরাতুল আহজাব, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪০১। কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ : মেয়েকে উপদেশ দেওয়া, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৫০।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে সর্বশেষ বের হওয়া কথাটি ছিলো এই—

الصلاة وما ملكت أيمانكم.

'নামাজকে হেফাজত করো এবং অধিনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি লক্ষ রাখো।'[২১৮]

যেমনটি ইবনু মাজাহ ও সুনানে আবু দাউদ শরিফের উদ্ধৃতিতে আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই উক্তিতে দাসত্বের বৈধতা এবং দাসের মালিক হওয়া উভয়টিরই স্বীকৃতি বিদ্যমান। আর এই শেষ কথাটি থেকে অকাট্য আর কোনো হুকুম হতে পারে না। এখানে রহিত হওয়ার আর কোনো সম্ভবনা নেই। কেননা এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা।

পরবর্তীকালে সাহাবিগণ ও তাদের পরবর্তী উম্মতের মধ্যেও দাসত্বের বিধানের ওপর ধারাবাহিক আমল হয়ে আসছে। কোনো একজনও সেটিকে অস্বীকার করেনি। তাহলে কি তাদের সবাই অনুগ্রহ করা ও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার আয়াত সম্পর্কে জানতেন না? (নাউজুবিল্লাহ) না কি তাদের কেউ পবিত্র কুরআনকে বোঝেননি? না কি তাদের সবাই মহান আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে বেপরোয়া ছিলো? কোনো সাহাবি, তাবিয়ি, ফকিহ ও মুহাদ্দিসের সম্পর্কে কি এমন কথার কল্পনা করা যায়? যারা একনিষ্ঠ ইসলাম ধর্ম প্রচারে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করেছেন। কোনো সমালোচকের সমালোচনার ভয় পাননি!!

সুতরাং স্পষ্ট এবং যথার্থ সত্য কথা হলো, আগে উল্লিখিত শর্ত ও সীমারেখার সঙ্গে ইসলামে দাসত্ব প্রথা জায়েজ ও বৈধ। তার কোনো কিছু রহিত হয়নি। সে সম্পর্কে শরয়ি বিধান সেটিই, যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি। আর এর রহিত হওয়ার কথা পরিত্যাজ্য। উম্মতের ইজমার পরিপন্থি এবং শরয়ি দলিলের উপস্থিতিতে সেটি কোনো দলিলই না।

---

[২১৮] সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৬২৫।

বি. দ্র.

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করা আবশ্যক। সেটি হলো, দুনিয়ার অধিকাংশ জাতি পরস্পর এই চুক্তি করেছে এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধ বন্দিকে দাস বানানো হবে না। অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্রও উল্লিখিত চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ এই চুক্তিতে শরিক। সুতরাং যতদিন এই চুক্তি বলবৎ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যও যুদ্ধ বন্দিদেরকে দাস বানানো জায়েজ হবে না। অবশ্য এখানে প্রশ্ন আসে যে, এ ধরনের চুক্তি করা কি জায়েজ আছে? পূর্ববর্তীদের বক্তব্যে এ বিষয়ে আমি স্পষ্ট কোনো কথা পাইনি। তবে যা বোঝা যায়, এমন চুক্তি করা জায়েজ আছে। কেননা, দাস বানানো কোনো ওয়াজিব বা জরুরি বিধান নয়। সেটি বন্দিদের বিষয়ে চারটি বৈধ বিষয়ের একটিমাত্র। আবার এ বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান বা হাকেমের স্বাধীনতা রয়েছে। অন্য দিকে আজাদ করার ফজিলত ও অন্যান্য বিধান থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে স্বাধীন থাকা বেশি পছন্দনীয়। তাই অন্যান্য জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লিখিত চুক্তি মেনে চলে এবং সেটি ভঙ্গ না করে সে সময় পর্যন্ত এমন চুক্তি ঠিক রাখায় কোনো সমস্যা নেই।

والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম থেকে গৃহিত।[২১৯]

[২১৯] খ: ১, পৃ: ২৬৩।

সংশোধিত হদ বিল কী? নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'সংশোধিত হুদ বিল কী? নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল।' সম্প্রতি জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে 'নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল' নামে একটি বিল পাশ করা হয়েছে। এ বিলের আইনি ভেদ সম্পর্কে কেবল সেসব ব্যক্তিই অবগত হতে পারে, যারা আইনের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। সাধারণ মানুষদেরকে এ কথা বলা হচ্ছে যে, এ বিলের কারণে কষ্টের শিকার নারীরা সুখ ও সমৃদ্ধি পাবে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বিলের বাস্তবতা উদঘাটন করেছেন। মাসিক 'আল-বালাগ'-এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে।

—আবদুল্লাহ মায়মান

সংশোধিত হদ বিল কী? নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল

হামদ ও সালাতের পর—

সম্প্রতি জাতীয় অ্যাসেম্বলি কর্তৃক 'নারী অধিকার সংরক্ষণ' নামে যে বিল পাশ হয়েছে, তার আইনি ভেদ সম্পর্কে কেবল তারাই জানতে সক্ষম হবে, যারা আইনি সূক্ষ্মতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কিন্তু জনসাধারণের সামনে তার যে চিত্রটি তুলে ধরা হচ্ছে সেটি এই যে, হুদুদ অর্ডিন্যান্স নারীদের ওপর যে পরিত্রানহীন জুলুম চাপিয়ে রেখেছে এই বিল সেটিকে দূর করবে। এটির মাধ্যমে অগণিত নির্যাতিত ও কষ্টের শিকার নারীদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি আসবে। সেইসঙ্গে এমন দাবিও করা হচ্ছে যে, এই বিলে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো কথা নেই।

আসুন, একটু গভীর দৃষ্টি ও বাস্তবতাকে উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে দেখি যে, এই বিলের মূলকথা কী? উল্লিখিত দাবির সঙ্গে সেটি কতটুকু মিল রাখে। সম্পূর্ণ বিল পরখ করলে দেখা যায় উল্লিখিত বিলের মূলকথা (Substantive) মাত্র দুটি।

১. প্রথম কথা হলো, জোরপূর্বক জিনার (ধর্ষণ) ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে এবং পরিভাষায় যাকে 'হদ' বলে—এই বিলে সেটিকে একেবারেই শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিলের আলোকে কোনো অবস্থাতেই ধর্ষককে শরয়ি শাস্তি দেওয়া যাবে না বরং সব ক্ষেত্রেই তাকে শাসনমূলক শাস্তি দিতে হবে।

২. দ্বিতীয় কথা হলো, হুদুদ অর্ডিন্যান্সের শাস্তির মধ্যে যে অপরাধকে জিনা নামে শাস্তির কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিলো সেটিকে এখন অশ্লীলতা (Lewdness) নাম দিয়ে তার শাস্তি হালকা করা হয়েছে এবং সেটি প্রমাণের পদ্ধতিকে কঠিন করা হয়েছে।

এখন এই মৌলিক কথা দুটির প্রত্যেকটির ওপর ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে।

ধর্ষণের শরয়ি শাস্তিকে একেবারেই খতম করে দেওয়া স্পষ্টভাবে কুরআন-সুন্নাহর বিধানের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া। কিন্তু বলা হচ্ছে যে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে জিনার যে 'হদ' (শাস্তি) নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি তখন প্রযোজ্য হবে, যখন জিনায় লিপ্ত নর-নারী উভয়ের সন্তুষ্টিতে অপরাধটি হবে। কিন্তু যখন কোনো অপরাধী কোনো নারীর ইচ্ছে ছাড়া জিনা করে সে সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহে কোনো শাস্তির বিধান নেই। আসুন, প্রথমে দেখি তাদের এই দাবিটি কতটা সহিহ?

ক. পবিত্র কুরআনে সুরা নুর-এর দ্বিতীয় আয়াতে জিনার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ণিত হচ্ছে—

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

'জিনায় লিপ্ত নর-নারী প্রত্যেককে একশো বেত্রাঘাত করো।'[২২০]

এ আয়াতে শর্তহীনভাবে জিনা শব্দ এসেছে। যা সব ধরনের জিনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইচ্ছায় জিনা বা জোরপূর্বক জিনা উভয়টি এর মধ্যে রয়েছে। বরং এটি সাধারণ বিবেকের কথা যে, জোরপূর্বক জিনার অপরাধ স্বেচ্ছা প্রণোদিত জিনা থেকে মারাত্মক। সুতরাং স্বেচ্ছা প্রণোদিত জিনায় যদি এই শাস্তি আরোপ করা হয়। তাহলে জোরপূর্বক জিনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত শাস্তির প্রয়োগ হবে আরও কঠোরভাবে।

এ আয়াতে যদিও জিনাকারী নারীর কথাও রয়েছে। কিন্তু সুরা নুরেই কিছুটা পরে এমন নারীকে এই শাস্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যার সঙ্গে জোরপূর্বক জিনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে—

---

[২২০] সুরা নুর, আয়াত : ২।

﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'আর যে ব্যক্তি নারীদেরকে বাধ্য করবে। মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে উল্লিখিত নারীদের প্রতি দয়াময় ক্ষমাশীল।'[২২১]

এখান থেকে স্পষ্ট হয়, যে নারীর সঙ্গে জোরপূর্বক জিনা করা হয়েছে, তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি বাধ্য করেছে তার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপে সে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, যা সুরা নুরের দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

খ. একশো বেত্রাঘাতের এই শাস্তি অবিবাহিতদের জন্য। মুতাওয়াতির হাদিসের মাধ্যমে তার সঙ্গে এটিও সংযুক্ত করা হয়েছে যে, অপরাধী যদি বিবাহিত হয়, তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। পাথর মেরে হত্যা করার এই বিধানকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জিনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন তেমনিভাবে জোরপূর্বক জিনার ক্ষেত্রেও সেটি প্রয়োগ করেছেন।

'ওয়ায়েল ইবনু হুজর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মহিলা নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। এমতাবস্থায় রাস্তায় এক ব্যক্তি জোরপূর্বক তার সঙ্গে জিনা করে। সে মহিলা চিৎকার করলে অপরাধী পুরুষ পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অপরাধী নিজে স্বীকার করে যে, সে ওই মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক জিনা করেছিলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর হদ প্রয়োগ করলেও মহিলার ওপর কোনো হদ প্রয়োগ করেননি'

ইমাম তিরমিজি রহ. তার 'জামে'কিতাবে হাদিসটি দুটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় সূত্রটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[২২২]

গ. সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে। এক দাস এক দাসীর সঙ্গে জোরপূর্বক জিনা করে। যার ফলে উমর রা. পুরুষের ওপর হদ প্রয়োগ করলেও নারীকে কোনো শাস্তি দেননি। কেননা তার সঙ্গে জোরপূর্বক জিনা করা হয়েছে।[২২৩]

---

[২২১] সুরা নুর, আয়াত : ৩৩।

[২২২] জামে তিরমিজি, অধ্যায় : হদ, পরিচ্ছেদ নং ২২, হাদিস : ১৪৫৪,১৪৫৩।

[২২৩] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : ইকরাহ, (বাধ্য করা) পরিচ্ছেদ নং ৬।

সুতরাং পবিত্র কুরআন, সুন্নতে নববি এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সিদ্ধান্ত থেকে কোনো ধরণের সন্দেহ সংশয় ছাড়া এ কথা প্রমাণিত হয় যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জিনা করলে যেমনিভাবে তার ওপর 'হদ' (শাস্তি) আরোপ করা হবে। তেমনিভাবে জোরপূর্বক জিনা করলেও 'হদ' (শাস্তি) আরোপ করা হবে। এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, কুরআন-সুন্নাহে জিনার যে 'হদ' (শরয়ি শাস্তি) নির্ধারিত, সেটি কেবল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জিনা করলে প্রয়োগ হবে জোরপূর্বক জিনা করলে তার প্রয়োগ হবে না।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, জোরপূর্বক জিনার ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত করার ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে কেন? এর আসল কারণ হলো একটি চরম বেইনসাফি প্রোপাগান্ডা। যা 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স' বাস্তবায়নের পর থেকে কোনো কোনো দল চালিয়ে আসছে। সে প্রোপাগান্ডাটি এই, 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' অধীনে কোনো নির্যাতিতা নারী কারও বিপক্ষে জোরপূর্বক জিনার মুকাদ্দামা পেশ করলে তাকে জোরপূর্বক জিনার বিষয়ে চারজন সাক্ষী আনতে বলা হতো। আর সে যখন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারতো না, তখন উলটো তাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকানো হতো। এ হলো সে কথা, যা দীর্ঘদিন ধরে আওড়ানো হচ্ছে। এমনিভাবে যুগের পর যুগ ধরে আওড়ানো হচ্ছে যে, বিশেষ শিক্ষিত লোকেরাও তা সঠিক মনে করছে। আর এটিই হলো সেই বিষয় যা রাষ্ট্রপ্রধান তার প্রকাশিত বক্তব্যে এই বিল বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

কোনো প্রোপাগান্ডাকে যখন গলিতে গলিতে এমন প্রসিদ্ধ করা হয় যে, বাচ্চাদের মুখেও সেটি শোনা যায় তখন এর বিরুদ্ধে কথা-বলা ব্যক্তিকে সাধারণের দৃষ্টিতে পাগল বলে মনে করা হয়। কিন্তু যারা ইনসাফের ভিত্তিতে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে চায় আমি আন্তরিকভাবে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি যে, দয়া করে প্রোপাগান্ডা থেকে সরে এসে আমার উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলোকে নিবিড় মনে চিন্তা করে দেখুন।

ঘটনা হলো, আমি নিজে বেফাকি শরিয়ত আদালতের জজ এবং পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ সতেরো বছর সুপ্রিম কোর্টের শরিয়া আপিল বেঞ্চের সদস্য হিসেবে 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' অধীনে দায়েরকৃত অনেক মামলার শুনানি করেছি। আমার জানামতে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন একটি মামলাও

চোখে পড়েনি, যেখানে জোরপূর্বক জিনার শিকার নির্যাতিতা নারীকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' অধিনে এমনটি হওয়া সম্ভব না। তার কারণ এই যে, 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স'-এর অধীনে চারজন সাক্ষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তিকে শর্ত করা হয়েছে কেবল জোরপূর্বক জিনা হদের যোগ্য হওয়ার জন্য। কিন্তু তার সঙ্গে ১০-এর ৩ ধারায় জোরপূর্বক জিনার জন্য শাসনমূলক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যেখানে চারজন সাক্ষীর শর্তারোপ করা হয়নি। বরং সেখানে কোনো একজন সাক্ষী, বা মেডিকেল টেস্ট বা রাসায়নিক নিরীক্ষা রিপোর্টের মাধ্যমেও অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে। যার ফলে জোরপূর্বক জিনার অনেক অপরাধী উল্লিখিত ধারার অধিনে নিয়মিত সাজা পাচ্ছে।

চিন্তার বিষয় হলো, যে নির্যাতিতা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলো তাকে যদি কখনো শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' কোন ধারা অনুযায়ী দেওয়া হলো? যদি বলা হয় যে, তাকে মিথ্যে অপবাদের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ, জিনার ব্যাপারে সে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে) তাহলে অপবাদ অর্ডিন্যান্সের ৩ নম্বর ধারার ২ নম্বর ব্যতিক্রমী ধারাতে স্পষ্টভাষায় এ কথা লেখা আছে যে, যে ব্যক্তি আইন অথরিটির কাছে জিনার অভিযোগ নিয়ে যাবে, শুধু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় অপবাদের ভিত্তিতে তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। হুঁশ ও অনুভূতি থাকলে কোনো আদালতই এমন মহিলাকে শাস্তি দিতে পারে না। দ্বিতীয় অবস্থা এমন হতে পারে যে, সে মহিলাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জিনা করার শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কোনো আদালত যদি এমন করে থাকে, তাহলে সেখানে তো এমনটি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই যে, সে মহিলা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি। বরং এখানে একটি মাত্র অবস্থা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সেটি হলো, আদালত সাক্ষীদেরকে যাচাই করার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, মহিলা কর্তৃক জোরপূর্বক জিনার দাবি মিথ্যে। আর এ কথা সবার কাছে স্পষ্ট যে, কোনো মহিলা যদি কোনো পুরুষের ওপর এ অপবাদ আরোপ করে যে, সে তাকে জোরপূর্বক জিনা করেছে আর সাক্ষীর মাধ্যমে পরবর্তীকালে তার দাবি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয় যে, মহিলা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তার সঙ্গে জিনা করেছে এমন অবস্থায় তাকে

শাস্তি দেওয়া ইনসাফের কোনো দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না। কিন্তু এমন মহিলাকে যেহেতু নিশ্চিতভাবে মিথ্যেবাদী সাব্যস্ত করার জন্য সাধারণত যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এমন দৃষ্টান্ত একটি দুটিমাত্র। তা ছাড়া নিরানব্বই শতাংশ মামলাতে এমন হয় যে, যদিও আদালত পুরুষের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক জিনা করার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে না। অন্যদিকে মহিলার ইচ্ছারও তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না তাই এমন অবস্থাতে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহের কারণে মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' অধীনে গত সাতাশ বছরে যেসব মামলা হয়েছে, সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখলে খুব সহজে এ কথার সত্যতা মিলবে। আমি ছাড়া আরও যেসব জজ এমন মামলার শুনানি করেছেন, সব সময় আমি তাদের সবার এমন প্রতিক্রিয়াই পেয়েছি যে, এ ধরনের মামলাতে মহিলার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হলে তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। কেবল পুরুষকে শাস্তি দেওয়া হয়।

যেহেতু 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স' বাস্তবায়নের সময় থেকে এ আওয়াজ তোলা হচ্ছে যে, এর কারণে অনেক নির্দোষ মহিলার শাস্তি হচ্ছে। তাই একজন আমেরিকান স্কলার চার্লস কেনেডি এ আওয়াজ শুনে এমন মামলার জরিপ করতে পাকিস্তানে আসে। 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' অধীনে দায়েরকৃত মামলা তদন্ত করে তিনি একটি জরিপ তৈরি করেন এবং নিজের বিশ্লেষণের ফলাফল একটি রিপোর্টে প্রকাশ করেন। যেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে রিপোর্টের ফলাফল উল্লিখিত বাস্তবতার সঙ্গে একেবারেই মিল রাখে। সে তার রিপোর্টে বলেছে—

Women fearing convictionunder section 10 (2) frequently bring charges of rapcunder 10 (3) against alleged partners. The FSC finding no circumstantial evidenceto supporthe later charge, convicthe male accusedunder section 10 (2)...the women is exonerated of aû rrong doing dueto reasonable doubt 'rule'. (Charles Cannedy:the status of women in Pakistan in islami"ation of lass P.74))

'যেসব মহিলার ১০ এর ২ নম্বর ধারার অধীনে (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া

জিনার অপরাধে) শাস্তি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তারা তাদের সঙ্গে জড়িত অপরাধীর বিরুদ্ধে ১০-এর ৩ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের করে। ফেডারেল শরিয়া কোর্টের কাছে যেহেতু এমন কোনো সাক্ষী প্রমাণ থাকে না, যার মাধ্যমে জোরপূর্বক জিনা প্রমাণ করা যায় বিধায় তারা ১০-এর ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী পুরুষকে (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জিনা করার) শাস্তি দেয়। ...আর মহিলা 'সন্দেহের ফায়দা' আইন অনুযায়ী তার সব ভুল পদক্ষেপের শাস্তি থেকে মুক্তি পায়।'

এ হলো একজন নিরপেক্ষ অমুসলিম স্কলারের সাক্ষী। 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' ব্যাপারে যার কোনো ধরনের সহমর্মিতা নেই। তাদের প্রতিও কোনো মায়া নেই, যারা স্বেচ্ছায় ভুল কাজে লিপ্ত হয়ে পরিবারের চাপে পড়ে নিজের কাজের বিপরীত জোরপূর্বক জিনার মামলা দায়ের করে। তাদের থেকে চারজন চাক্ষুষ (Circumstantial evidance) সাক্ষী চাওয়া হয় না বরং ইঙ্গিতবহ প্রমাণাদি চাওয়া হয়। আর তারা এমন প্রমাণও পেশ করতে পারে না, যার মাধ্যমে জোরপূর্বক জিনার বিষয়টি প্রমাণিত হবে। তারপরেও শুধু পুরুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। আর সন্দেহ আইনের ফায়দা অনুযায়ী এমন ক্ষেত্রে মহিলার কোনো শাস্তি হয় না।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স'-এ এমন কোনো কথা নেই, যার ভিত্তিতে জোরপূর্বক জিনার শিকার হওয়া নারী চারজন সাক্ষী হাজির না করতে পারায় তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

অবশ্য হয়তো কোনো ঘটনা এমন হয়েছে যে, মামলা আদালতে পৌঁছানোর আগে তদন্তের পর্যায়ে থাকা অবস্থায় পুলিশ আইন বহির্ভূতভাবে কোনো মহিলার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করেছে। সেটি এভাবে যে, মহিলা জোরপূর্বক জিনার অভিযোগ নিয়ে এসেছে কিন্তু পুলিশ তাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জিনার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। তবে এই বাড়াবাড়ির সঙ্গে 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' কোনো দুর্বলতার কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশের পুলিশ প্রত্যেক আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই এমন করে থাকে। তবে এর কারণে আইন পরিবর্তন করা হয় না। আইনের দৃষ্টিতে হিরোইন রাখা অপরাধ। কিন্তু পুলিশ কত নির্দোষ মানুষের মাথায় হিরোইন রেখে তাদেরকে আটক করছে! এর অর্থ এই নয় যে, হিরোইন নিষিদ্ধের আইনই বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে।

জোরপূর্বক জিনার শিকার নারীর সঙ্গে কখনো যদি পুলিশ এমন বাড়াবাড়ি করে, তাহলে ফেডারেল শরিয়া কোর্ট তার রায়ের মাধ্যমে সেটির পথ রুদ্ধ করেছে। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এখনো এমন আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে এমন কোনো আইন প্রণয়ন করা হোক যেখানে এ কথা থাকবে যে, জোরপূর্বক জিনার শিকার নারী মামলা দায়ের করলে তার মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' কোনো ধারাতেই তাকে গ্রেফতার করা হবে না। যে এমন নারীকে গ্রেফতার করবে, তাকে ধারা অনুযায়ী বাস্তবেই শাস্তি দেওয়ার আইন করা হবে। কিন্তু এ কথার ওপর ভিত্তি করে জোরপূর্বক জিনার শরয়ি হদকে নিঃশেষ করার কোনো সুযোগ নেই।

সুতরাং জোরপূর্বক জিনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিলে যেভাবে শরয়ি হদকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেটি কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট খেলাফ এবং নারীদের সঙ্গে বাড়াবাড়ির বিষয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

অশ্লীলতা

উল্লিখিত বিলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সেসব ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেগুলোকে অশ্লীলতা শিরোনামে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' এ বিধান ছিলো যে, জিনার ওপর শরয়ি নিয়ম অনুযায়ী যদি চারজন সাক্ষী পাওয়া যায়, তাহলে 'অর্ডিন্যান্স' এর ৫ম ধারা অনুযায়ী অপরাধীর ওপর জিনার শরয়ি হদ আরোপ করা হবে। আর যদি চারজন সাক্ষী পাওয়া না যায়, কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হয়। তাহলে তাকে শাসনমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এখন এই বিলে 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স'-এর ৫ম ধারায় থাকা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জিনার ক্ষেত্রে শরয়ি হদকে বাকি রাখা হয়েছে। যার জন্য চারজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। কিন্তু বিলের ৮ম ধারার মাধ্যমে সেটিকে অসহনীয় পুলিশি তদন্তের অধীনে এনে এটি আবশ্যক করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি চারজন সাক্ষী নিয়ে আদালতে অভিযোগ করবে। পুলিশ এমন মামলার কোনো 'এফআইআর' (FIR) করতে পারবে না। এভাবে বিষয়টিকে প্রমাণের পদ্ধতিটিকেও কঠিন করা হয়েছে। একইভাবে চারজন সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে জিনার যে শাসনমূলক শাস্তি 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' ছিলো সেটিতে নিম্নোক্ত পরিবর্তন করা হয়েছে।

১. 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' এই অপরাধকে 'শাস্তিযোগ্য জিনা' বলা হয়েছিলো। আর

এখন উল্লিখিত বিলে তার নাম পরিবর্তন করে 'অশ্লীলতা' রাখা হয়েছে। এই পরিবর্তন একেবারে সঠিক এবং ভালো পদক্ষেপ। কেননা, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চারজন সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধকে জিনা বলা মুশকিল। অবশ্য সেটিকে জিনার চেয়ে নিচের কোনো নাম দেওয়া উচিৎ ছিলো। 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' এই দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিলো। যেটি পরিবর্তন করতে আলেমগণের কমিটিও সুপারিশ করেছেন।

২. 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' এই অপরাধের শাস্তি দশ বছর পর্যন্ত হতো। কিন্তু উল্লিখিত বিলে সেটিকে কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে। যাই হোক, এটি যেহেতু শাসনমূলক শাস্তি, তাই সেটির পরিবর্তনকে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত বলা যায় না।

৩. 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' জিনা একটি পুলিশি তদন্তযোগ্য (Cognizable) অপরাধ ছিলো। উল্লিখিত বিলে সেটিকে পুলিশি তদন্তযোগ্য অপরাধ বলা হয়নি। সুতরাং এ ব্যাপারে থানায় 'এফ. আই. আর' (FIR) দায়ের করা যাবে না। বরং সরাসরি আদালতে অভিযোগ (Complaint) করতে বলা হয়েছে। আর অভিযোগ দায়েরের সময় দুজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। যাদের হলফ নামা আদালতে নথিভুক্ত করা হবে। এরপর আদালত যদি মনে করে যে, অভিযোগটি সামনে চালানোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে, তাহলে অভিযুক্তকে সমন জারি করবে। আর সামনের কার্য দিবসে অভিযুক্তকে নিশ্চিত হাজির করতে তার মুচলেকা ছাড়া আর কোনো জামানত চাইবে না। আর আদালত যদি মনে করে যে, মামলাটির সামনে অগ্রগতির কোনো কারণ নেই, তাহলে তখনই মামলা খারিজ করে দেবে।

এভাবে অশ্লীলতার অপরাধ প্রমাণ করাকে এত কঠিন করা হয়েছে যে, সাধারণত এর মাধ্যমে কোনো অপরাধীর শাস্তি হওয়া কঠিন।

প্রথমত ইসলামি বিধান অনুযায়ী জিনা ও অশ্লীলতার অপরাধ সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী অপরাধ। শুধু কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ নয়। এ জন্য এটি পুলিশি তদন্তযোগ্য অপরাধ হওয়া উচিত। অবশ্য অপরাধের পুলিশি তদন্তের সময় এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজে পুলিশের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করতে গিয়ে তারা যেন অনর্থক কোনো নিরাপরাধীকে হয়রানি না করে। এ বিষয়ে ফেডারেল শরিয়া

কোর্টের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত রয়েছে। যেগুলো বাস্তবায়নের পর এমন আশঙ্কা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছিলো এবং সাতাশ বছর যাবত এ অপরাধ পুলিশি তদন্তের অধীনে ছিলো। এই সময়ের মধ্যে এমন মামলার কারণে পুলিশ কর্তৃক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হয়রানি করার ঘটনা অনেক কমে গেছে। তবে এই আশঙ্কাকে আরও দৃঢ়ভাবে বন্ধ করতে এমনটি বলা যেতে পারে যে, এমন অপরাধের তদন্ত কোনো 'এস. পি' পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা করবে এবং আদালতের নির্দেশ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। উল্লিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধারণ হয়রানিও কেটে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অভিযোগকারীর ওপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যে, তাৎক্ষণিকভাবে 'হদের' ক্ষেত্রে চারজন ও 'অশ্লীলতার' ক্ষেত্রে দুজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করবে। এটি আমাদের ফৌজদারি আইনে একেবারেই উপমাহীন বিষয়। সাক্ষী বিষয়ক আমাদের সব আইনে 'হদ' ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ প্রমাণের জন্য সাক্ষীর সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বরং কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী ছাড়াই শুধু আলামত (Circumstantial evidancc) দেখেও রায় দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং উল্লিখিত অপরাধের ক্ষেত্রে মেডিকেল রিপোর্ট ও রাসায়নিক পরীক্ষা সাক্ষীর ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে। শরিয়তের দৃষ্টিতে একজন মাত্র সাক্ষীর ওপর ভিত্তি করে বা সাক্ষীর কোনো আলামতের ওপর ভিত্তি করেও শাসনমূলক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। অতএব, শাসনমূলক শাস্তি আরোপের জন্য অভিযোগের সময় দুজন সাক্ষীর শর্তারোপ করা অশ্লীলতার অপরাধীদেরকে প্রয়োজন ছাড়াই তাদেরকে রক্ষা করার সমার্থক।

একইভাবে অভিযুক্তের জন্য এটি আবশ্যক করে দেওয়া যে, তার সশরীরে হাজির হওয়া ছাড়া আর কোনো জামানত গ্রহণ করা যাবে না। এটি আদালতের হাত বেঁধে দেওয়ার সমতুল্য। মামলার প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর এ কারণেই ফৌজদারি আইনের ৪৯৬ নং ধারায় আদালতকে আগে থেকেই এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে, এ বিষয়টি আদালতের অধীনে থাকবে যে, সে চাইলে শুধু অভিযুক্তের শরীরকে মুচলেকা করবে আবার চাইলে তার থেকে অন্য কোনো জামানতও নিতে পারে। সাধারণ থেকে সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রেও আদালতের এই স্বাধীনতা রয়েছে। অথচ 'অশ্লীলতার' মতো মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত থেকে এ ধরনের স্বাধীনতাকে

ছিনিয়ে নেওয়া কোনোভাবেই উচিত হয়নি। এখন একটি কথা রয়ে যায় যে, মামলা পরিচালনার জন্য যদি যথেষ্ট কারণ না থাকে, তাহলে আদালত উল্লিখিত মামলাকে খারিজ করে দিতে পারে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩০৩ ধারায় আগে থেকেই আদালতকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিলো। সেটিকে দ্বিতীয়বার এই বিলের অংশ বানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট।

৪. 'হুদুদ অর্ডিনেন্সে' ছিলো যে, কারও বিরুদ্ধে যদি হদের উপযুক্ত জিনার অভিযোগ দায়ের করা হয় কিন্তু আদালতে হদের সব শর্ত পাওয়া না যায়। তবে কমপক্ষে অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে ১০-এর ৩ ধারা অনুযায়ী তাকে শাসনমূলক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত বিলে ফৌজদারি আইনের যে ২০৩ (সি) সংযুক্ত করা হয়েছে তার ৬ নম্বর উপধারায় এ কথা লেখা হয়েছে, যে জিনা হদের উপযুক্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হবে, তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার কোনো মামলা করা যাবে না।

এখন এ কথা স্পষ্ট যে, হদের উপযুক্ত জিনার জন্য কঠিন শর্ত রয়েছে। অনেক সময় শুধু উল্লিখিত বিষয়ের নিয়মের ওপর ভর করে তা পাওয়া যায় না। এমন পরিস্থিতিতে মজবুত সাক্ষীর ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হলেও আদালত তাকে জিনার শাস্তি দিতে পারবে না, শুধু তাই নয় বরং তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার নতুন কোনো অভিযোগও করতে পারবে না। চিন্তার বিষয় হলো, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার মামলা দায়ের করার ওপর পরিপূর্ণ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা অশ্লীলতাকে (প্রমোট) রক্ষা করা ছাড়া আর কী হতে পারে?

অনুরূপভাবে অনুমোদিত বিলের ১২ (এ) ধারাতে বলা হয়েছে যে, কারও বিরুদ্ধে যদি জোরপূর্বক জিনার (ধর্ষণ) অভিযোগ আরোপ করা হয় তাহলে কোনো পর্যায়েই উল্লিখিত অভিযোগকে 'অশ্লীলতার' রূপে পরিবর্তন করা যাবে না।

এ কথার স্পষ্ট ফলাফল এই যে, কারও বিরুদ্ধে যদি কোনো মহিলা জোরপূর্বক জিনার (ধর্ষণ) অভিযোগ দায়ের করে কিন্তু জোরপূর্বক জিনার বিষয়টি প্রমাণে কোনো ধরনের সন্দেহ থেকে যায় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে যাবে। 'অশ্লীলতার' আওতায় তার বিরুদ্ধে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।

যে যুগে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জিনা কোনো অপরাধ ছিলো না সে যুগে জোরপূর্বক জিনাকারী তার প্রতি উত্থাপিত অভিযোগকে এ বলে প্রতিহত করতো যে, জিনা তো নিশ্চিত হয়েছে কিন্তু মহিলার ইচ্ছায় হয়েছে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে মহিলার সন্তুষ্টির বিষয়ে আদালতের সন্দেহ হলে, অভিযুক্তকে মুক্তি দিতো। 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' অভিযুক্ত নিজেকে রক্ষা করতে তার পক্ষ থেকে এমনটি বলার সুযোগ রাখা হয়নি। কেননা মহিলার সন্তুষ্টি থাকলেও জিনা অপরাধ ছিলো। যে আদালত জোরপূর্বক জিনার মামলার শুনানি করে, সে আদালতই তাকে শাসনমূলক জিনার অধীনে শাস্তি দিতে পারতো। কিন্তু এই নতুন সংস্করণের কারণে সম্ভবত সে আস্থা ফিরে এসেছে যে, অভিযুক্ত নিজেকে বাঁচাতে যদি বলে, ওই মহিলার ইচ্ছায় আমি তার সঙ্গে জিনা করেছি। আর মহিলার রাজি থাকার বিষয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তাহলে কেউ তার চুল পর্যন্ত বাঁকা করার ক্ষমতা রাখে না। যে আদালত তার এই মামলা শুনানি করেছে, সে এ কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না যে, উল্লিখিত (বিলের) ধারা জোরপূর্বক জিনার মামলাকে অশ্লীলতার মামলায় পরিবর্তনের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। আর তার সম্পর্কে নতুন কোনো অশ্লীলতার মামলা করলে সে ব্যাপারে উল্লিখিত ধারার বাক্য অস্পষ্ট রয়েছে। কিন্তু যদি অন্য কোনো কারণ না থাকে, তাহলেও মামলা দায়ের না করার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, মামলা দায়ের করার জন্য এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, দুজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নিয়ে আদালতে গিয়ে (Complain) অভিযোগ করবে। আর এখানে তো দুজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই। শেষ ফলাফল এই যে, এমন অপরাধী ব্যক্তি অপরাধ থেকে একেবারেই মুক্তি পাবে এবং তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন হয়, যে অশ্লীলতাকে অপরাধ বলা হয়েছে, বাস্তবিক অর্থে সেটি কোনো অপরাধ কি না? যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে সেটিকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং তার অপারাধীকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়া ব্যাপী এই ভিন্নধর্মী নীতি প্রণয়ন করা হয় কেন?

‘হুদুদ অর্ডিন্যান্সে’ কিছু অতিরিক্ত সংযোজন

উল্লিখিত বিলের মাধ্যমে ‘হুদুদ অর্ডিন্যান্সে’ কিছু অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে। যেমন—

১. মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী যখন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতের কার্যবিধি অনুযায়ী ‘হদের’ রায় হয়ে যাবে, তখন কারও জন্য তার শাস্তি কমানো বা ক্ষমা করার অধিকার থাকবে না। সুতরাং ‘হুদুদ অর্ডিন্যান্সের’ ২০-এর ৫ নম্বর উপধারায় লেখা ছিলো যে, ফৌজদারি অপরাধের ১৯ নম্বর পরিচ্ছেদে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক শাস্তি মওকুফ করা বা কমানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বিধানটি হদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। উল্লিখিত বিলে ‘হুদুদ অর্ডিন্যান্সে’ আরও যে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পরিবর্তন করা হয়েছে তা হলো সেখানে ‘হুদুদ অর্ডিন্যান্সের’ এই ২০-এর ৫ নম্বর ধারাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যার উদ্দেশ্য এই যে, কোনো আদালত কাউকে কোনো শাস্তি দিলে সবসময় সরকারের হাতে এই ক্ষমতা থাকবে যে, সে উল্লিখিত শাস্তি রহিত বা হালকা করতে পারবে।

   উল্লিখিত পরিবর্তনটি কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

   ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

   ‘আল্লাহ ও রাসুল কোনো ফায়সালা দিলে কোনো মুমিন নর-নারীর জন্য উল্লিখিত বিষয়ে ভিন্ন কোনো অধিকার থাকে না।’[২২৪]

   রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে ঘটনা খুব প্রসিদ্ধ। যে .ানে হদের সিদ্ধান্ত হয়েছে এমন একজন নারীর পক্ষে সুপারিশ করার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রিয় সাহাবি উসামা রা.-কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে এ কথাও বলেছিলেন যে, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেয়েও যদি চুরি করে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দেবো।[২২৫]

---

[২২৪] সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৬।

[২২৫] সহিহ বুখারি, অধ্যায় : হদ, পরিচ্ছেদ নং ১২, হাদিস : ৬৭৮৮।

এ কথার ওপর সব উম্মত একমত যে, 'হদ' ক্ষমা করা বা সেটিকে কমানোর অধিকার কোনো সরকারের কর্তৃত্বাধীন নয়। সুতরাং বিলের এই অংশটি কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক।

২. 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' ৩ নং ধারায় লেখা ছিলো যে, এই অর্ডিন্যান্সের' বিধান অন্যান্য বিধানের ওপর প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ, কখনো অন্য আইন এবং 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' আইনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' বিধানের ওপর আমল করতে হবে। উল্লিখিত বিলে এই ধারাটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

এটি এমন একটি ধারা, যার মাধ্যমে কেবল আইনি জটিলতা দূর করা উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং অতীতের অনেক নির্যাতিতা নারীদের নির্যাতন বন্ধ করা হয়েছিলো এই ধারার মাধ্যমে।

তার একটি উদাহরণ এই যে, পারিবারিক আইনের অধীনে কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিলে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তালাক কার্যকর হতো না, যতক্ষন পর্যন্ত তার নোটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে না পাঠানো হতো। যদিও শরয়ি দৃষ্টিতে ইদ্দত শেষে সেই মহিলা ইচ্ছে অনুযায়ী অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু পারিবারিক আইনের দাবি হলো, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে তালাকের নোটিশ পৌঁছানো পর্যন্ত আইন অনুযায়ী ওই মহিলা তালাক দাতার স্ত্রী থাকবে। অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। আজ পর্যন্ত এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, স্বামী ইউনিয়ন কাউন্সিলে তালাকের নোটিশ পাঠায়নি। আর স্ত্রী নিজেকে তালাকপ্রাপ্তা ভেবে ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এখন এ জালেম স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে জিনার অভিযোগ করেছে। কেননা, পারিবারিক আইনের অধীনে সে এখনো তার স্ত্রী। এমন মামলা আসলে সুপ্রিম কোর্টের শরিয়া বেঞ্চ 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সের' অন্যান্য ধারার সঙ্গে ৩ নম্বর ধারার ভিত্তিতে সেসব মহিলাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। সেইসঙ্গে এ কথা বলেছে যে, 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স' যেহেতু শরিয়তের আদলে তৈরি করা আর শরিয়তের দৃষ্টিতে ওই মহিলার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা জায়েজ আছে বিধায় তার বিয়ের বিষয়ে পারিবারিক আইন প্রয়োগ হবে না। কেননা, এই আইন অন্যান্য আইনের ঊর্ধ্বের আইন।

এখন উল্লিখিত ধারাকে বিলুপ্ত করার পর বিশেষ করে 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' বিয়ের যে সংজ্ঞা ছিলো সেটিকেও এই বিলে বিলুপ্ত করার মাধ্যমে মহিলাদের সমস্যাকে আরও এক ধাপ বেড়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

ওলামা কমিটিতে আমরা এই মাসআলাটি উঠিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত এ কথার ওপর সবাই একমত হয়েছিলো যে, উল্লিখিত ধারার স্থানে নিচের ধারাটি লেখা হোক—

'In the interpretation and application of this Ordinancethe injunctions of as Islam as laid down in the Holy Qur`an and Sunnah Shall have effect, not with standing aûthing contained in aû other lawfor the time deing in force.'

'এই অর্ডিন্যান্সের' ব্যাখ্যা ও তালাকের ক্ষেত্রে সর্বদা কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামি বিধানই কার্যকর হবে। চাই বর্তমানের কোনো আইনে যা কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হোক না-কেন।'

কিন্তু আজ জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে যে বিল পাশ করা হয়েছে, সেখানে এ ধারাটিও গায়েব হয়ে গেছে এবং তার ফলস্বরূপ অনেক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. অপবাদ অর্ডিন্যান্সের ১৪ নম্বর ধারায় পবিত্র কুরআনের 'লিআনের' বিষয়টি রয়েছে। অর্থাৎ, কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীর প্রতি জিনার অভিযোগ করে এবং চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে তাহলে মহিলার দাবির প্রেক্ষিতে 'লিআনের' নিয়ম অনুযায়ী তাকে কসম খাওয়ানো হবে। স্বামী-স্ত্রীর কসম খাওয়ার পর তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। অপবাদ অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে যে, স্বামী যদি 'লিআন' করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে সে সময় পর্যন্ত বন্দি রাখা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে 'লিআনে' রাজি না হবে। উল্লিখিত বিলে এই অংশটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো, স্বামী যদি 'লিআনে' আগ্রহী না হয়, তাহলে স্ত্রী অসহায় অবস্থায় ঝুলে থাকবে। 'লিআনের' মাধ্যমে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে না। আবার বিয়ে-বিচ্ছেদও করতে পারবে না।

অপবাদ অর্ডিন্যান্সে এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'লিআনের' মাঝে স্ত্রী যদি জিনার কথা স্বীকার করে নেয়, তাহলে তার ওপর জিনার শাস্তি আরোপ

করা হবে। উল্লিখিত বিলে এই অংশটিকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ স্বীকার করে নেওয়ার পর তার ওপর জিনার শাস্তি প্রয়োগ না করার কোনো অর্থ নেই। যখন কিনা 'লিআন' করাই হচ্ছে মহিলার দাবিতে এবং তাকে স্বীকার করতেও কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। সুতরাং বিলের এই অংশটিও কুরআন-সুন্নাহর বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৪. 'জিনা অর্ডিন্যান্সের' ২০ নম্বর ধারাতে বলা হয়েছিলো : সাক্ষীর মাধ্যমে আদালতের কাছে যদি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন অপরাধ করেছে যা 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স' ছাড়া অন্যান্য আইনে অপরাধ। তাহলে উল্লিখিত অপরাধের শাস্তি দেওয়া আদালতের ইখতেয়ারের অধীন হলে তাকে সে শাস্তি দিতে পারবে।

এ ধারাটি ছিলো, আদালতের কার্যক্রমের জটকে দূর করার জন্য। কিন্তু উল্লিখিত বিলে আদালতের এই ইখতেয়ারকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিলের অবস্থা এই যে, জিনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব শাস্তিমূলক অপরাধকে 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স' থেকে বের করে 'অন্যান্য শাস্তি'র অধিনে করা হয়েছে। আর 'হুদুদ অর্ডিন্যান্সে' শুধু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জিনায় লিপ্ত হওয়াকে 'হদ'যোগ্য শাস্তি হিসেবে বাকি রাখা হয়েছে। সুতরাং এই সংশোধনের ফল এই হবে যে, যদি কোনো পুরুষের বিপক্ষে হদযোগ্য জিনার অভিযোগ করা হয়। কিন্তু সাক্ষীর মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ নারীর ওপর জোর করেছে। অথবা জিনা প্রমাণ হয় না কিন্তু মহিলাকে উত্যক্ত করা প্রমাণিত হয় তাহলে অভিযুক্তকে আদালত উত্যক্ত করা বা ধর্ষণের শাস্তি দিতে পারবে না। আদালত এ কথা জেনে বুঝেই তাকে ছেড়ে দেবে যে, সে সেই মহিলাকে উত্যক্ত করেছে অথবা জোরপূর্বক তার সঙ্গে জিনা করেছে। এরপর অভিযুক্ত হয়তো এ বারেই ছাড়া পেয়ে যাবে। অথবা তার বিরুদ্ধে নতুন করে উত্যক্ত করার অভিযোগ দায়ের করতে হবে। আর আদালতের নতুন কার্যক্রমে সেটিকে নতুন করে শুরু করা হবে।

আইন প্রণয়ন বড়ো স্পর্শকাতর দায়িত্ব। তার জন্য খুব নিবিড় মনে একাগ্রতার সঙ্গে প্রান্তিকতামুক্ত হয়ে সব কিছুকে সামনে রাখার প্রয়োজন পড়ে। প্রোপাগান্ডার ময়দানে শুধু শ্লোগানে মুগ্ধ হয়ে ও প্রভাবিত হয়ে যখন আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন তার অবস্থা এমন পরিস্থিতির শিকার হয়।

এরপর আদালত নতুন আইনের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য উপস্থাপন করতে দীর্ঘদিন আইনের বেড়াজালে আটকে থাকে। এক আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তর হতে থাকে। নির্যাতিতদের প্রতি সহমর্মিতায় বাধা সৃষ্টি হয়।

সারকথা

সারকথা হলো, আগে সবিস্তারে উল্লিখিত কিছু শাখাগত দুর্বলতা ছাড়াও উল্লিখিত বিলে বড়ো মাপের কিছু দুর্বলতা এই।

১. উল্লিখিত বিলে জোরপূর্বক জিনার (ধর্ষণ) 'হদ'কে যেভাবে একেবারেই বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, তা কুরআন-সুন্নাহর বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী। মহিলাদের সঙ্গে পুলিশের বাড়াবাড়ির কোনো আশঙ্কা হলে, সেটিকে এভাবে বন্ধ করা যায় যে, আদালতের সব কার্যক্রম শেষ হওয়া পর্যন্ত অভিযোগকারী মহিলাকে অর্ডিন্যান্সের কোনো ধারার অধীনে গ্রেফতার করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত করা হবে।

২. একবার জিনার হদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সেটিকে হালকা করা বা ক্ষমা করার অধিকার দেওয়া সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ। সুতরাং উল্লিখিত বিলে অর্ডিন্যান্সের ২০-এর ৫ নম্বর ধারাকে বিলুপ্ত করার মাধ্যমে সরকারকে শাস্তি মওকুফ বা হালকা করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেটি কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৩. হদযোগ্য জিনাকে ও অশ্লীলতাকে পুলিশি তদন্তযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত না করার মাধ্যমে উল্লিখিত অপরাধকে বিভিন্নভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। যা কার্যত এমন অপরাধকে সাজাহীন অপরাধে পরিণত করার সমতুল্য।

৪. আদালতের ওপর এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যে, সাক্ষীদের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধ সামনে আসলেও সে অন্যান্য অপরাধের শাস্তি দিতে পারবে না। এর মাধ্যমে অপরাধীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অথবা এর কারণে এক আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা হস্তান্তর করতে হবে যার ফলে আদালতে জট তৈরি হবে।

৫. অপবাদ অর্ডিন্যান্স সংশোধনের মাধ্যমে পুরুষকে এই ছাড় দেওয়া যে, মহিলা লিআনের দাবি করা সত্ত্বেও পুরুষ 'লিআন' করতে অস্বীকৃতি জানানোর

মাধ্যমে মহিলাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখতে পারবে এটি কুরআন-সুন্নাহ্র বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৬. অপবাদ অর্ডিন্যান্সের এ সংশোধনটিও কুরআন-সুন্নাহ্র সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জিনা করার বিষয়ে মহিলা স্বীকারোক্তি দেওয়ার পরও তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।

পার্লামেন্ট সদস্য ও নেতৃত্বদাতাদের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন হলো, এই প্রস্তাবগুলোর ওপর ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে তারা যেন বিলের সংশোধন করেন এবং জাতিকে তাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন।

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

সম্মিলিত ইজতিহাদ ও তার প্রয়োজনীয়তা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

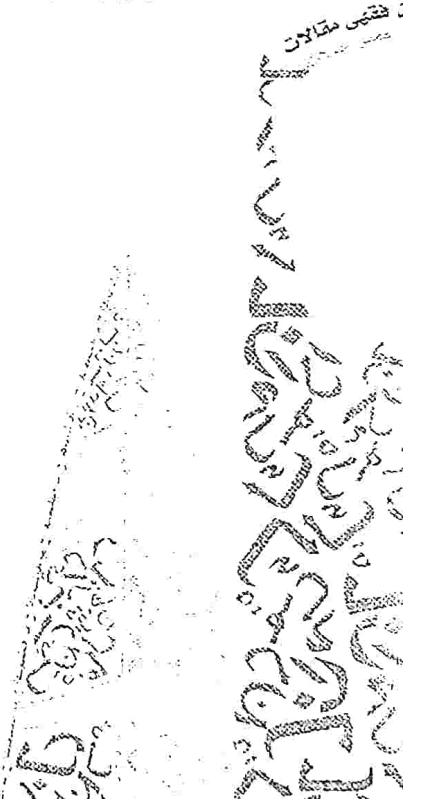

'ইজতিমায়ি ইজতিহাদ ও তার প্রয়োজনীয়তা' '১৪৩০ হিজরি সনের ২০ থেকে ৩০ মুহাররম পর্যন্ত রাবেতা আল-আলাম আল-ইসলামির পক্ষ থেকে সৌদিআরবের মক্কা মুকাররামায় 'ফতোয়া' ব্যানারে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ওই সেমিনারে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) 'আল-ফাতাওয়াল জামায়ি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। জনাব আবু সুফিয়ান সাইদ সাহেব সেটিকে উর্দুতে সংক্ষিপ্ত করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত রূপটি প্রথমে সৌদিআরবের উর্দু পত্রিকা 'রৌশনি'তে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে এটি মাসিক 'আল-বালাগে' প্রকাশিত হয়েছে।'

—আবদুল্লাহ মায়মান

সম্মিলিত ইজতিহাদ ও তার প্রয়োজনীয়তা

হামদ ও সালাতের পর—

কোনো জিনিস অর্জনের লক্ষ্যে যে চেষ্টা করা হয়, আরবিতে তাকে ইজতিহাদ বলে। অনুরূপভাবে কোনো শরয়ি বিধান জানার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়, ইসলামি উসুলে ফিকহের পরিভাষায় তাকেও ইজতিহাদ বলে ব্যক্ত করা হয়। উসুলে ফিকহের আলেমগণ সেটিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, কোনো মাসআলার ধারণাগত শরয়ি বিধান জানতে ফকিহ্ কর্তৃক তার সব যোগ্যতা ব্যয় করাকে ইজতিহাদ বলে।[২২৬] ইমাম গাজালি রহ. তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, শরয়ি বিধান জানতে মুজতাহিদগণ যে কষ্ট ও চেষ্টা করেন, সেটিকে ইজতিহাদ বলে।[২২৭]

প্রথম সংজ্ঞাতে 'নিশ্চিত'-এর স্থানে ধারণাগত শব্দটি এ কারণে ব্যবহার করা হয়েছে যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে অকাট্য জ্ঞান অর্জন হয় না। বরং তা দ্বারা ধারণাগত জ্ঞান পাওয়া যায় এবং তার ওপর আমল করাও আবশ্যক ও জরুরি।

প্রকৃত অর্থে ইজতিহাদ হলো শরয়ি বিধান জানার নাম। মুহাদ্দিসগণ মুয়াজ ইবনু

---

[২২৬] কাশফুল আসরার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৩৪, তালবিহ, আল্লামা তাফতাজানি রহ. খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৭১।

[২২৭] আল-মুস্তাসফা।

জাবাল রা.-এর শাগরিদদের থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়েমেন অভিমুখে পাঠানোর ইচ্ছে করেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন। তোমার কাছে কোনো মাসআলা আসলে তুমি সেটিকে কীভাবে ফায়সালা করবে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের (কুরআন) মাধ্যমে ফায়সালা করবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সে সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে যদি কোনো বিধান না থাকে তাহলে কী করবে? উত্তরে তিনি বলেন, রাসুলের সুন্নাহর ওপর আমল করবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এখানেও তুমি যদি স্পষ্ট কোনো বিধান না পাও, তাহলে কী করবে? মুয়াজ রা. উত্তর দিলেন যে, আমি ইজতিহাদ করবো এবং সে ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি করবো না। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকে হাত রেখে বললেন, সব প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি তাঁর রাসুলের দূতকে এমন বিষয়ের তাওফিক দিয়েছেন, যেটিকে তাঁর রাসুল পছন্দ করেন।[২২৮]

যদিও কোনো কোনো মুহাদ্দিস হারিস ইবনু আমর ও অন্যান্য বর্ণনাকারীদের অর্থাৎ, মুয়াজ ইবনু জাবাল রা.-এর শাগরিদদের মাজহুল হওয়ার ভিত্তিতে উল্লিখিত হাদিসের সূত্রকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। কিন্তু তারপরেও প্রত্যেক যুগ ও এলাকার আলেমগণ এটি গ্রহণ করেছেন।

হাফেজ ইবনুল কইয়িম রহ. বলেন—

এ হাদিসে যদিও মুয়াজ রা.-এর শাগরিদদের নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু তার কারণে হাদিস সহিহ হওয়ার ওপর কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে না। কেননা হাদিসটি প্রসিদ্ধির দিক দিয়ে শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। স্বয়ং হারিছ ইবনু আমর রা. মুয়াজ রা.-এর শাগরিদদের এক জামাত থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। নির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ করে কোনো একজন থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেননি। কারণ, নাম উল্লেখ করে কোনো একজন থেকে হাদিস বর্ণনা করা থেকে কোনো জামাত থেকে হাদিস বর্ণনা করা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। মুয়াজ রা.-এর ছাত্ররা ইলম, মর্যাদা, সততা, স্বচ্ছতা, তাকওয়া, পরহেজগারি, দীনদারি ও আমানতদারীতে উঁচু মর্যাদা রাখতেন। যা কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। তাদের মধ্যে কারও সম্পর্কে মিথ্যে, ভুল বলা বা এ ধরনের কোনো সন্দেহমূলক অভিযোগ আরোপ করা হয়নি। বরং

[২২৮] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৩২৮ ও আবু দাউদ, হাদিস : ৩৫৯২।

তারা উম্মতের সবার চেয়ে উত্তম ও নির্বাচিত ব্যক্তি ছিলেন। আহলে ইলমগণ তাদের ওপর আস্থা রাখতেন। তাদের থেকে একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং শোবা রহ.ও তাদের থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনেক ইমাম তো এমনটি বলেছেন যে, কোনো হাদিসের সূত্রে শোবা রহ.-কে দেখলে সেখান (সমালোচনা) থেকে হাত সংকুচিত করে নাও। খতিব আবু বকর রহ. বলেন, উবাদা ইবনু নুসাই রহ. হাদিসটিকে আবদুর রহমান ইবনু গানাম রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি মুআজ ইবনু জাবাল রা. থেকে বর্ণনা করেন। বিধায় হাদিসটি মুত্তাসিল এবং তার সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন। আমরাও হাদিসটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস রাখি।[২২৯]

এই হাদিসটি আরও একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত। যা শায়খাইন (অর্থাৎ, ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ.) তাদের সহিহে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণনা করেন। তারা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। হাকিম (বিচারক) যখন কোনো মাসআলায় ইজতিহাদ করে এবং তার ইজতিহাদ সঠিক হয়। তখন সে দ্বিগুণ সওয়াব পায়। আর যদি ইজতিহাদে ভুল হয়ে যায়, তাহলেও সে ইজতিহাদ করার সওয়াব পাবে।[২৩০]

অনেক সাহাবি রা.-এর আমল দ্বারা মুয়াজ ইবনু জাবাল রা.-এর হাদিসের অর্থ ও উদ্দেশ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম দারেমি রহ. স্বীয় সুনানে শুরাইহ রহ. থেকে বর্ণনা করেন। উমর ইবনু খাত্তাব রা. তার (শুরাইহ) কাছে একটি পত্র পাঠান। যেখানে তিনি এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছিলেন যে, কোনো মাসআলা সামনে আসলে আল্লাহর কিতাবে যদি তার হুকুম থাকে, তাহলে সে যেন সেটি থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এ ব্যাপারে যেন কোনোভাবেই মানুষদের পরোয়া না করে। আর কোনো মাসআলার হুকুম যদি আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে না থাকে, তাহলে যে হুকুমের ওপর ইজমা হবে সেটিকে গ্রহণ করবে। কোনো মাসআলার হুকুম যদি আল্লাহর কিতাব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও পূর্ববর্তীদের (আমলের) মধ্যে না থাকে, তাহলে দুটি বিষয়ের যে-

---

[২২৯] ইলামুল মুয়াক্কিয়িন।

[২৩০] বুখারি : ৭৩৫২, মুসলিম : ১৭১৬।

কোনো একটি গ্রহণ করতে পারো। তোমরা ইজতিহাদ করতে চাইলে ইজতিহাদ করবে। আর যদি ইজতিহাদ না করতে চাও, তাহলে তা এড়িয়ে চলো। তাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে ইমাম দারেমি রহ. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের কাছে যখন কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর কিতাবে তার হুকুম অনুসন্ধান করবে। সেখানে না পেলে রাসুলের সুন্নাহয় তালাশ করবে। সেখানে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ইজমার ওপর আমল করবে। আর যদি ইজমাও না হয়ে থাকে, তাহলে ইজতিহাদ করবে।

তিনি আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কে কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সবার আগে পবিত্র কুরআনের দিকে দৃষ্টি দিতেন। সেখানে উল্লিখিত মাসআলার হুকুম থাকলে তাকে সেখান থেকে জানিয়ে দিতেন। পবিত্র কুরআনে হুকুম না পাওয়া গেলে রাসুলের সুন্নাহয় খুঁজতেন। সেখানে উল্লিখিত মাসআলার হুকুম না পাওয়া গেলে সাহাবিদের আমলের দিকে দৃষ্টি দিতেন। এখানেও মাসআলার হুকুম অনুসন্ধানে ব্যর্থ হলে নিজের মতামত বলে দিতেন।[২৩১]

বাইহাকি রহ. মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জায়েদ ইবনু সাবেত রা.-এর কাছে গিয়ে বলেন, হে আমার চাচাতো ভাই, আমাদেরকে যদি বিচারকের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হয়, তাহলে আমরা কী করবো? উত্তরে জায়েদ রা. বলেন, আল্লাহর কিতাবের হুকুম অনুযায়ী রায় দেবে। আল্লাহর কিতাবে তার হুকুম না পাওয়া গেলে সুন্নতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তার হুকুম অনুসন্ধান করবে। সেখানে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের একত্রিত করে ইজতিহাদ করবে। ইজতিহাদ করার পর রায় দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। একইভাবে ইমাম বাইহাকি রহ. ইদরিস আওদি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাইদ ইবনু আবু বুরদা রা. একটি পত্র নিয়ে আমাদের কাছে এসে বলেন, এটি হলো সেই চিঠি যা উমর রা. আবু মুসা আশআরি রা.-এর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। যেখানে এ কথা লেখা ছিলো যে, কোনো মাসআলার হুকুম যদি কুরআন-হাদিসে না পাও তাহলে নিজের বুদ্ধি ও যোগ্যতার মাধ্যমে তার হুকুম অনুসন্ধান করবে। সাদৃশ্যপূর্ণ ও অনুরূপ মাসআলার প্রতি লক্ষ রেখে মাসআলায়

---

[২৩১] সুনানে দারেমি : মুকাদ্দিমাহ : ১৬৯, ১৭১, ১৬৮।

চিন্তা-ভাবনা করবে এবং সেসব দিক বিবেচনা করে আল্লাহর কাছে সব থেকে পছন্দনীয় হয় এমন হুকুম গ্রহণের চেষ্টা করবে।[২৩২]

মুআজ ইবনু জাবাল রা.-এর হাদিসে যা কিছু বলা হয়েছে সাহাবিগণ তার ওপর আমল করেছেন। যার মাধ্যমে ওই হাদিস শক্তিশালি হয়। একইসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় যে, 'সব সালাফে সালিহিন মুআজ রা.-এর হাদিসের ওপর আমল করেছেন।' হাদিসটিতে একক ইজতিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এমন অনেক 'নস' রয়েছে, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, মুজতাহিদের জন্য উচিত হলো, আলোচিত মাসআলাতে বিজ্ঞজনের সঙ্গে পরামর্শ করা। আর সমষ্টিগত ইজতিহাদের দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।

এখানে মূলকথা সেটি যা আলি ইবনু আবু তলেব রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল, যদি এমন কোনো বিষয় সামনে আসে, যার ব্যাপারে শরিয়তে কোনো হুকুম পাওয়া যায় না। তাহলে সে বিষয়ে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফকিহ ও খোদাভীরুলোকদের সঙ্গে পরামর্শ করবে এবং নির্দিষ্ট কারও মতামতের ওপর ফায়সালা করবে না।[২৩৩]

খতিব রহ. তার সূত্রে উল্লিখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত ভাষা এমন, মালিকইবনু আনাস রা. ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ রা. থেকে। তিনি সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রা. থেকে। তিনি আলি ইবনু আবু তলেব রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার পরে আমাদের সামনে এমন কোনো মাসআলা আসলে, যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোনো হুকুম নেই এবং আপনার থেকেও আমরা সে সম্পর্কে কিছু শুনিনি। আমরা কী করবো? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের খোদাভীরু ও পরহেজগার লোকদেরকে একত্রিত করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে। আর নির্দিষ্ট কারও অভিমতের ওপর রায় দেবে না।[২৩৪]

---

[২৩২] সুনানে কুবরা, ইমাম বাইহাকি রহ., অধ্যায় : আদাবুল কাজি ১০,পৃষ্ঠা : ১১৫

[২৩৩] মুজামুল আওসাত, ইমাম তাবারানি রহ., মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ১,পৃষ্ঠা : ৪২৮ কিতাবুল ইলম ৮৩৪।

[২৩৪] আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, আল্লামা খতিব রহ., খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৩/ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৭৭।

দারেমি রহ. আবু সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, যার সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহয় কোনো হুকুম নেই। উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন মাসআলার ক্ষেত্রে উম্মতের ফকিহগণ গবেষণা করবে।[২৩৫]

খুলাফায়ে রাশিদিনের অভ্যাস ছিলো, তাদের সামনে যদি এমন কোনো মাসআলা আসতো, যে মাসআলার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় কোনো হুকুম নেই। তাহলে তারা আহলে ইলম ও আহলে ফাতাওয়াদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং উল্লিখিত মাসআলার সমাধান বের করতে চেষ্টা করতেন। ইমাম বাইহাকি রহ. তার 'সুনানে' জাফর ইবনু বুরকান থেকে। তিনি মাইমুন ইবনু মেহরান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর সামনে কোনো মাসআলা আসলে সবার আগে তিনি আল্লাহর কিতাবের দিকে দৃষ্টি দিতেন। সেখানে হুকুম থাকলে তিনি সে অনুযায়ী রায় দেতেন। আল্লাহর কিতাবে সমাধান না থাকলে রাসুলের সুন্নাহয় তার সমাধান অনুসন্ধান করতেন। সেখানে থাকলে তার ওপর ফায়সালা করতেন। অন্যথায় সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং বলতেন, আমার সামনে অমুক মাসআলা এসেছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহয় আমি তার হুকুম অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু সেখানে আমি পাইনি। আপনাদের কি জানা আছে যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মাসআলায় কী হুকুম দিয়েছেন? অনেক সময় সাহাবিদের একটি জামাত দাঁড়িয়ে বলতেন, হ্যাঁ। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসআলাতে এই হুকুম দিয়েছেন। তখন এমন ক্ষেত্রে আবু বকর রা. সে হুকুমকে গ্রহণ করতেন এবং সে অনুযায়ী রায় দিতেন।

জাফর বলেন, মাইমুন ছাড়া অন্যরা আমাকে শুনিয়েছেন যে, আবু বকর রা. তখন বলতেন, সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য। যিনি আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তিদের জন্ম দিয়েছেন। যারা প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সংরক্ষণ করেছেন। আর সে মাসআলার ব্যাপারে কোনো সাহাবির কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম না পাওয়া গেলে আবু বকর রা. বড়ো বড়ো সাহাবিদের একত্রিত করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং যে হুকুমের ওপর তারা সবাই একমত হতেন, সে অনুযায়ী রায় দিতেন।

---

[২৩৫] সুনানে দারেমি ১,পৃষ্ঠা : ৪৭।

জাফর বলেন, মাইমুন আমার কাছে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনু খাত্তাব রা.-এরও এমন নীতি ছিলো। কোনো মাসআলার ব্যাপারে যদি কুরআন-সুন্নাহয় কোনো হুকুম না পাওয়া যেতো, তাহলে তিনি আবু বকর রা.-এর রায় অনুসন্ধান করতেন। সেখানে হুকুম পাওয়া গেলে তিনি তার ওপর ফায়সালা করতেন। অন্যথায় সাহাবিদেরকে একত্রিত করে পরামর্শ করতেন এবং তাদের সর্বসম্মত রায়ের ওপর ফায়সালা করতেন।[২৩৬]

বর্ণনায় আছে, উমর ইবনু খাত্তাব রা. অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে সাহাবিদেরকে একত্রিত করেছেন এবং তাদের একমত হওয়ার পর বিধান জারি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইরাকের ভূমি বণ্টন ও তার ওপর ট্যাক্স আরোপের বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে 'শুরার' আয়োজন করেন। যেখানে আনসার ও মুহাজির সাহাবিদেরকে সদস্য করা হয়েছিলো। সেখানে প্রত্যেকে তাদের অভিমত উপস্থাপন করেন। এরপর সব সাহাবি এ কথার ওপর একমত হয়েছিলেন যে, ইরাকের জমির ওপর ট্যাক্স আদায় করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. 'কিতাবুল খারাজে' উল্লিখিত ঘটনাকে সবিস্তারে বয়ান করেছেন।[২৩৭]

একইভাবে মদপানের 'হদ' নির্ধারণের বিষয়ে উমর ইবনু খাত্তাব রা. সাহাবিদেরকে একত্রিত করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা.-এর মতামত অনুযায়ী ফায়সালা করেছেন।[২৩৮]

ইমাম তহাবি রহ. ইবরাহিম নাখায়ি রহ. থেকে বর্ণনা করেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর জানাজার নামাজে তাকবিরের সংখ্যার ব্যাপারে মানুষের মাঝে যথেষ্ট মতানৈক্য পাওয়া যেতো। কেউ বলতো, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাতটি তাকবির বলতে শুনেছি। অন্য ব্যক্তি বলতো, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ তাকবির বলতেন। আবার কেউ বলতো, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি তাকবির বলতেন। আবু বকর রা.-এর ইনতিকালের পরেও সাহাবিদের মধ্যে এই মতানৈক্য বিদ্যমান ছিলো। উমর ইবনু খাত্তাব রা. যখন খলিফা হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং মানুষের মাঝে এই মতানৈক্য দেখেন। তখন তিনি খুব বেশি ব্যথিত হলেন এবং

---

[২৩৬] সুনানে কুবরা বাইহাকি ১০,পৃষ্ঠা : ১১৪, অধ্যায় আদাবুল কাজি।

[২৩৭] কিতাবুল খারাজ : ২৪-২৬, বুখারি : ২৩৩৪, ৪২৩৫, ৪২৩৬।

[২৩৮] মুসলিম : ৪৪৫৪, আবু দাউদ : ৪৪৭৯।

সাহাবিদেরকে একত্রিত করে বললেন। আপনারা সবাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। কোনো বিষয়ে আপনাদের মাঝে মতানৈক্য থাকলে আপনাদের পরবর্তীদের মাঝেও মতানৈক্য থাকবে। আপনারা যে সিদ্ধান্তের ওপর একমত হবেন, আপনাদের পরবর্তীরাও তার ওপর একমত থাকবে এবং তাদের মাঝে কোনো মতানৈক্য থাকবে না। বিধায় জানাজার নামাজে তাকবিরের ব্যাপারে আপনারা ঐকমত্য হয়ে যান। সাহাবিগণ বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনার মতামত কী? আপনি আমাদেরকে পরামর্শ দিন। উমর ইবনু খাত্তাব রা. বললেন, আমি আপনাদের মতোই একজন মানুষ। আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। তখন উল্লিখিত মাসআলার ওপর চিন্তা-ভাবনা করার পর সাহাবিগণ চার তাকবিরের ওপর একমত হলেন। আর উমর ইবনু খাত্তাব রা. সবাইকে জানাজার নামাজে চার তাকবির বলার নির্দেশ দিলেন।[২৩৯]

আবু ওয়ায়েল থেকে ইমাম বাইহাকি রহ. সংক্ষিপ্তভাবে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উল্লিখিত মাসআলার বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে মতানৈক্য ছিলো। কিছু সাহাবি জানাজার নামাজে সাত তাকবির, কেউ ছয়, কেউ পাঁচ বা চার তাকবিরের পক্ষে ছিলেন। উমর ইবনু খাত্তাব রা. সাহাবিদেরকে একত্রিত করে তাদের থেকে পরার্মশ চাইলেন। প্রত্যেকেই তাদের মতামত দিলেন। এরপর তিনি সব সাহাবিদেরকে চার তাকবিরের ওপর একমত করেন।[২৪০]

এভাবে সাহাবিগণ নতুন মাসআলার শরয়ি হুকুম জানতে বা মতানৈক্যময় মাসআলাতে মতানৈক্য কমানোর লক্ষ্যে পরামর্শ করতেন। সম্মিলিত ইজতিহাদ দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত বর্ণনা ও দলিল থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবিদের যুগে নতুন কোনো মাসআলার হুকুম জানতে সম্মিলিত ইজতিহাদের পন্থা অবলম্বন করা হতো। এমনকি যারা অন্যের সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এমন ব্যক্তিদেরকে অনেক তাবিয়ি অপছন্দ করতেন।

যেমন ইমাম বাইহাকি রহ. আবু হুসাইন রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো কোনো মাসআলার বিষয়ে একাই ফতোয়া দিয়ে

---

[২৩৯] শরহু মাআনিল আসার, ইমাম তহাবি রহ.।

[২৪০] সুনানে কুবরা, ইমাম বাইহাকি রহ.।

দেন। অথচ সেটি যদি উমর ইবনু খাত্তাব রা.-এর সামনে আসতো, তাহলে তার হুকুম জানতে জরুরিভাবে বদরি সাহাবিদেরও একত্রিত করে ফেলতেন।[২৪১]

একইভাবে সাহাবিদের যুগের পরে মুজতাহিদ ইমামগণও নতুন কোনো মাসআলার হুকুম নির্ধারণ করতে পরস্পর পরামর্শ করতেন। অনেক মুজতাহিদ ইমাম নতুন মাসআলার ওপর গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করার জন্য অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে তারা একত্রিত হতেন এবং ফিকহি মাসআলার আলোচনা করতেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. ইজতিহাদের জন্য 'শুরার' নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। মুয়াফ্ফাকে মক্কি রহ. বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. তার মাসলাককে 'শুরা' নীতির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তার সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনার পরই কোনো মাসআলার হুকুম নির্ধারণ করতেন। সেখানে এক একটি মাসআলার ওপর কয়েক দিন এমনকি কয়েক মাস পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা চলতে থাকতো।[২৪২]

আগের বর্ণনা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হয় যে, নতুন মাসআলার শরয়ি বিধান জানতে আমাদের কাছে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো সম্মিলিত ইজতিহাদ। বর্তমাণ সময়ে অনেক নতুন মাসআলা সৃষ্টি হচ্ছে। যার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট কোনো হুকুম নেই। একইভাবে সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী ফকিহগণও নিরব। এমন কিছু নতুন মাসআলা আছে, যার আলোচনা পূর্ববর্তী ফকিহগণের কিতাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এখন এ বিষয়টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, ওই মাসআলাসমূহের হুকুমকে নতুনভাবে পরখ করতে হবে। কেননা, যে কারণ ও ইল্লতের ওপর ভিত্তি করে সেসব মাসআলা ইস্তেম্বাত করা হয়েছিলো, আজ সেটি বাকি নেই। আলি ইবনু আবু তালেব রা.-এর বর্ণিত হাদিস সব যুগের সব আলেমদেরকে আহ্বান করে যে, নতুন মাসআলার হুকুম ইস্তেম্বাত করার জন্য সব মাথা একসঙ্গে বসবে। আলোচনা-পর্যালোচনা এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাসআলার সমাধান করবে। যেমনটি হাদিসে বলা হয়েছে, 'ফকিহ এবং সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করো এবং নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির মতামতকে গ্রহণ করো না।'[২৪৩]

বর্তমান সময়ে সম্মিলিত ইজতিহাদ দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইজতিহাদের

---

[২৪১] আল-মাদখালুল কাবির, ইমাম বাইহাকি রহ.।

[২৪২] মানাকিবে আবু হানিফা রহ, আল্লামা মুয়াফ্ফাক মক্কি রহ.।

[২৪৩] মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস : ৪২৮।

পদ্ধতির ওপর আলোচনা করার আগে কিছু লোকের ভ্রান্ত চিন্তাধারার বিষয়ে সতর্ক করা জরুরি মনে করছি।

এখানে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এতটাই প্রভাবিত এবং তাদের প্রতি এত বেশি নরম অন্তরের অধিকারী যে, তারা এ কথা পর্যন্ত বলছে, শরয়ি সব বিধানকে নতুন করে ইস্তেম্বাত করা উচিত। তাদের ইচ্ছে হলো, শরয়ি সব বিধানের ক্ষেত্রে আলিফ, বা থেকে ইজতিহাদ শুরু করা হোক। আগের ফিকহি মাসআলাকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। তারা এ কথারও কোনো পরোয়া করেনা যে, সর্বজন স্বীকৃত শরয়ি নীতি ও উৎসের ওপর এগুলোর ভিত্তি। তাদের দাবি দেখে মনে হচ্ছে যে, পবিত্র কুরআন আজ নাজিল হয়েছে। আর ফকিহগণ হাদিসের সঙ্গে আজই পরিচিতি লাভ করেছেন। এই পশ্চিমাপুষ্ঠ লোকদের এমন ধারণা রয়েছে যে, চৌদ্দ শতাব্দী যাবত কোনো একজনেরও কুরআন-হাদিসের বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ হয়নি। বা ফকিহগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন-হাদিস বুঝতে ভুল করেছেন। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার মানুষ উম্মতের ফকিহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের মূল্যবান ইজতিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞ। গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের বড়ো ধরনের অজ্ঞতা, ইলম, মর্যাদা, খোদাভীতি, পবিত্রতা, সততা, পরিচ্ছন্নতা, দীনদারী ও আমানতদারীর গুনে গুণান্বিত না হওয়ার কারণে এমন হয়েছে। এর ফলাফল হলো, সম্পূর্ণ শরিয়তকে অস্বীকার করা। সর্বক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি করা এবং নতুন প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট করা। এটিও একটি বাস্তবতা যে, শর্তহীনভাবে ইজতিহাদের দাবিদার লোকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের থেকে এমন একজন দাঁড়াতে পারেনি যে, নতুনভাবে কুরআন-হাদিসের সব বিধানে ইজতিহাদ করার চেষ্টা করবে এবং পবিত্রতা থেকে মিরাস পর্যন্ত সব বিধানকে একটি কিতাবে একত্রিত করবে।

আমরা এ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ইজতিহাদের আহ্বান করছি না যে, পশ্চিমাদের চিন্তাধারার আঙ্গিকে সব ইসলামি বিধানকে ঢেলে সাজানো হবে। এমন উদ্দেশ্য কখনোই নয়। আমাদের সম্মিলিত ইজতিহাদের প্রয়োজন এ জন্যই যে, মানব জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেক নতুন মাসআলার সৃষ্টি হয়েছে। নিত্য-নতুন গবেষণা সামনে আসছে। এ অবস্থাকে সামনে রেখে আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, পূর্ববর্তী ফকিহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের প্রণয়নকৃত নীতি ও

পদ্ধতির আলোকে কুরআন-সুন্নাহয় চিন্তা-ভাবনা করে নিত্য-নতুন মাসআলার সমাধান অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা।

অনেকের ধারণা যে, পার্লামেন্টকে ফিকহি মাসআলা ইজতিহাদের অধিকার দেওয়া হোক। কেননা, এটি দেশের সর্বাধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। যেখানে জাতির নির্বাচিত ব্যক্তিরা থাকে। যারা বিভিন্ন ইলম ও বিষয়ের পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তারা এ কথাও বলে থাকে যে, নতুন ফিকহি মাসআলার সমাধানে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। আমি বলি, এমন অভিমত পোষণকারীরা ফিকহি ইজতিহাদের উদ্দেশ্য, ব্যাখ্যা ও তার চাহিদা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। যে কারণে তারা এমন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছে। শরয়ি বিষয়ে ইজতিহাদের মূল ভিত্তি জ্ঞান বুদ্ধির ওপর নয়। বরং তার মূল ভিত্তি হলো কুরআন-সুন্নাহর ওপর। ফিকহি ইজতিহাদের জন্য কুরআনের ইলম, হাদিস, ফিকহ ও উসুলে ফিকহে পাণ্ডিত্য রাখা একান্ত জরুরি। এই মহান দায়িত্ব তারাই পালন করতে সক্ষম, যারা উল্লিখিত বিষয়ে পাণ্ডিত্য রাখে। এই মহাপবিত্র দায়িত্ব সেসব লোকেরা কীভাবে পালন করবে? যারা শরয়ি ইলমের উসুল ও মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কেও কোনো খবর রাখে না। সবাই এ বাস্তবতা জানে যে, শরয়ি ইলমের ভিত্তিতে বর্তমানে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচন করা হয় না। তাদেরকে যদি ফিকহি মাসআলা ইজতিহাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেটি কেমন যেন তাদের প্রতি এমন দায়িত্ব অর্পণ করা হলো, তারা যার যোগ্য নয়।

ইসলামের একটি কার্যত মহা রহস্য এই যে, খৃস্টানদের 'কাহনুত ইকলিরুসের' মতো বা হিন্দুদের ব্রাহ্মণদের মতো ফিকহি মাসআলা ইজতিহাদের জন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেনি। কারণ অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান সময়ের দীর্ঘসূত্রতার সঙ্গে সঙ্গে মন্দ ও ফিতনার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। সেখানে এমন লোকের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিস্তার হয়, যারা শক্তি ও ক্ষমতার জোরে সমাজে প্রভাব ফেলে যোগ্যতার বলে নয়। আস্তে আস্তে এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি ও বর্ণ-বংশের প্রভাব বিস্তার হতে থাকে। যেমনটি খৃস্টানদের 'বাবুয়ার' ইতিহাসে এসেছে। ফিকহি মাসআলা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইসলাম সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে কেবল ইজতিহাদের শর্ত বর্ণনা করেছে যে, তাদেরকে ফিকহি ইজতিহাদের যোগ্য হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয় বরং উম্মতের নিকট গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে।

বর্তমানে সম্মিলিত ইজতিহাদের উত্তম ও ভালো পদ্ধতি সেটি, যার প্রতি আজ থেকে চৌদ্দ শতাব্দী আগে প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যেমনটি আলি ইবনু আবু তালেব রা. বর্ণনা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ফকিহ ও আবেদদের সঙ্গে পরামর্শ করো এবং নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির রায়ের ওপর ফায়সালা করো না। এবং খুলাফায়ে রাশিদিন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্য ও আমলকে সামনে রাখা।'

ইজতিহাদের জন্য মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে দুটি শর্তের কথা বলেছেন।

১. ফকিহগণ, যারা দীনের জ্ঞান অর্জনে নিজেকে উৎসর্গ করে। সবসময় তারা কুরআন-হাদিস অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। যেমনটি পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলছেন—

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾

'তাদের প্রত্যেক বড়ো জামাত থেকে যেন ছোটো একটি জামাত বের হয়ে দীনের জ্ঞান অর্জন করে।'[২৪৪]

২. খোদাভীতি, পরহেজগারি, তাকওয়া ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হবে। এগুলো এমন উঁচুমানের গুণ, যার মাধ্যমে মানুষ হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নফসের প্রবৃত্তি ও চাহিদা থেকে দূরে থাকতে পারে। মহান আল্লাহর বিধানকে স্পষ্ট করতে কোনো ধরনের টাল বাহানার সুযোগ গ্রহণ করে না। মহান আল্লাহ বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে একটি সমাধানকারী বিষয় দান করবেন।'[২৪৫]

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইলমের সঙ্গে তাকওয়া, পরহেজগারি এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া একান্ত জরুরি। ইমাম তিরমিজি রহ. জুবায়ের ইবনু নুফায়ের রহ. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। যেটি আবু দারদা রা. থেকে

---

[২৪৪] সুরা তাওবা, আয়াত : ১২২।

[২৪৫] সুরা আনফাল, আয়াত : ২৯।

বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর সঙ্গী ছিলাম। এক জায়গায় গিয়ে তিনি আসমানের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষের থেকে ইলম উঠে যাবে। তারা কিছু করার ক্ষমতা রাখবে না।' জিয়াদ ইবনু লাবিদ আনসারি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের থেকে কীভাবে ইলম উঠে যাবে? আমরা তো কুরআন তেলাওয়াত করছি এবং আল্লাহর কসম তা তেলাওয়াত করতে থাকবো। আমাদের স্ত্রী ও বাচ্চাদেরকেও সেটি শেখাতে থাকবো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিয়াদ, আমি তো তোমাকে মদিনার ফকিহদের একজন মনে করতাম। ইহুদি খৃস্টানেরাও তো তাওরাত ইঞ্জিল রাখে এবং তা তেলাওয়াত করে। কিন্তু তা দ্বারা তাদের কী উপকার হচ্ছে?' জুবায়ের রা. বলেন, আমি যখন উবাদা ইবনু সামেত রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তাকে বললাম, আপনি কি জানেন যে, আপনার ভাই আবু দারদা রা. কি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এরপর তার কথাটি উবাদা ইবনু সমেত রা.-এর কানে ঢুকিয়ে দিলে তিনি বললেন, আবু দারদা ঠিক বলেছে। তুমি চাইলে আমি তোমাকে এ কথা শোনাবো যে, ইলমের মধ্যে সবার আগে মানুষের একাগ্রতা উঠে যাবে। তুমি মুসল্লি ভরা মসজিদে দেখবে যে, তাদের মধ্যে একটি লোকও একাগ্রতা ও নিষ্ঠাবান থাকবে না।[২৪৬]

এ কারণে একান্ত জরুরি হলো যে, যারা সম্মিলিত ইজতিহাদে অংশগ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে উল্লিখিত শর্ত দুটি থাকতে হবে। দীনের বুঝ ও তাকওয়া পরহেজগারির ভিত্তিতে তাদেরকে নির্বাচন করতে হবে। রাষ্ট্র বা কোনো পার্টির কালো হাতের শিকার হবে না। রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন হবে এবং খোলামনে পরামর্শে অংশ গ্রহণ করবে। সব ধরনের পক্ষপাতমুক্ত হবে।

বর্তমান সময়ে সম্মিলিত ইজতিহাদের জন্য বিভিন্ন অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কাজ করে। যেমন সৌদি আরবে 'নেতৃস্থানীয় ওলামা বোর্ড'। পাকিস্তানে ফিকরে ইসলামি কাউন্সিল। ভারতে ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি। আবার কোনো অ্যাকাডেমি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন 'ওআইসি'র ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি জেদ্দা ও রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামির ফিকহ

---

[২৪৬] জামে তিরমিজি, অধ্যায় : ইলম, হাদিস : ২৬৫৩।

অ্যাকাডেমি। এসব প্রতিষ্ঠান ও অ্যাকাডেমি নিত্য-নতুন মাসআলা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনেকের মতামত হলো, এই অ্যাকাডেমি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্তাগুলোকে ইজমায়ে উম্মতের মর্যাদা দেওয়া হোক। কিন্তু আমরা তাদের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নই। এসব অ্যাকাডেমি ও প্রতিষ্ঠানের খেদমতকে আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করি। এগুলোর মাধ্যমে অনেক বড়ো বড়ো মাসআলার সমাধান দেওয়া হচ্ছে। মানুষদেরকে সমস্যা থেকে বাঁচানো হচ্ছে। যে কারণে সব উম্মতের পক্ষ থেকে তারা মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। তা সত্ত্বেও তাদের সিদ্ধান্তগুলোকে ইজমায়ে উম্মতের মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়। কেননা, ইসলাম 'একপক্ষ নীতিকে' সমর্থন করে না। আমাদের ইসলামের উজ্জল ইতিহাসে এমন একটি প্রতিষ্ঠানও পাওয়া যাবে না, যেটি অন্যের জন্য ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এ কারণে ইমাম মালিক রহ. এই প্রস্তাবকে অসম্মতি জানিয়েছিলেন যে, সব মানুষ তার ইজতিহাদ মেনে চলবে। ইবনু সাদ রহ. ইমাম মালিক রহ. থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। ইমাম মালিক রহ. বলেন, 'যখন খলিফা আবু জাফর মানসুর হজ আদায়ের লক্ষ্যে পবিত্র ভূমিতে আসেন, তখন তিনি আমাকে স্মরণ করেন। আমি তার কাছে আসলাম। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-মতামত পেশ করা হলো। এরই মাঝে তিনি বললেন, আমি ইচ্ছে করছি যে, আপনার 'মুয়াত্তার' মাধ্যমেই রায় দেবো। সুতরাং আপনি সেটির একাধিক কপি প্রস্তুত করুন। যেন সেগুলোকে সব শহরে পাঠাতে পারি। আর সবাইকে সে অনুযায়ী আমল করতে এবং অন্যান্য কিতাব পরিহার করার আইন জারি করতে পারি। আমি তখন বললাম, আমিরুল মুমিনিন, আপনি কখনোই এমনটি করবেন না। মানুষের কাছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস রয়েছে। তারা তার ওপর আমল করছে। আপনি যদি এখন এমন আইন জারি করেন, তাহলে কঠিন মতানৈক্য দেখা দেবে। বিধায় তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন।[২৪৭]

কোনো ফিকহ অ্যাকাডেমি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটি সম্ভব নয় যে, তারা দুনিয়ার সব ফকিহকে একত্রিত করবে। একইভাবে এমনটি করাও সম্ভব নয় যে, অন্যান্য ফকিহকে তাদের মতামত পেশ করতেও বাধা দেবে। আর যখন এমনটি করা সম্ভব নয়, তখন এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, কোনো অ্যাকাডেমি বা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে অন্যের জন্য পালন করা আবশ্যকীয় করা হবে। অথবা

[২৪৭] তাবাকাতে কুবরা, হজরত ইবনু সাদ রহ.।

তাদের সিদ্ধান্তাগুলোকে ইজমায়ে উম্মতের মর্যাদা দেওয়া হবে। হ্যাঁ, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, তাদের সিদ্ধান্তগুলো অনেক উপকারী। নিত্যনতুন মাসআলার সমাধানে তা থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এগুলো মজবুত দলিল ও প্রমাণসমূহের কারণে উদ্ধৃতি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সুতরাং যদি এসব সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ করা হয় এবং কেউ তার বিরোধিতা না করে, তখন বিশেষভাবে উল্লিখিত মাসআলার বিষয়ে ইজমার পথ সুগম হতে পারে। অনেকের অভিমত হলো, এমন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তাবলীকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করা উচিত। তাদের বক্তেব্যের পক্ষে দলিল হলো, এমনটি করার দ্বারা বিরল ও শরিয়ত বহির্ভূত ফতোয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, একটি প্রতিষ্ঠানের ফতোয়া সব মানুষের ওপর আবশ্যক করে দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, যখন কোনো দুর্বল দলিলের ভিত্তিতে ফতোয়া প্রকাশ করা হয়, তখন সমাজে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না এবং তা স্বাভাবিকভাবেই অচল হয়ে পড়ে। আজ পর্যন্ত এমন ফতোয়াসমূহ কেবল কাগজের পৃষ্ঠায়ই রয়ে গেছে। মানুষের জীবনে তার কোনো অবস্থান সৃষ্টি হয়নি।

সুখবর!

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর ইজতিহাদধর্মী রচনা ও আধুনিক যুগের নতুন নতুন মাসআলার হৃদয়গ্রাহী সমাধানে সাজানো 'ফিকহি মাকালাত'-এর সপ্তম খণ্ড অচিরেই আপনাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। ইনশাআল্লাহ![২৪৮]

[২৪৮] ফিকহি মাকালাতের মূল কিতাবে উপর্যুক্ত এ কথাটি সংযুক্ত আছে। তাই অনুবাদগ্রন্থে আমরা কথাটি বাদ দিইনি।—সম্পাদক

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মদ ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের চার অক্টোবর যশোর জেলার সদর থানায় তালবাড়ীয়া গ্রামের একটি সাধারণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই-বোনের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার হাতেখড়ি। বড়ো ভাইয়ের হাত ধরে ১৯৯৮ সালে তালবাড়ীয়া হুসাইনিয়া মাদরাসায় দীনী শিক্ষায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় তার। কৃতিত্বের সঙ্গে কওমী মাদরাসার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ২০১০ সালে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের অধীনে তিনি দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতকার্য হন। এরপর জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম (মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স) থেকে তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা সম্পন্ন করে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই আরবি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় লেখাপড়ার মাঝে বিভিন্ন সময়ে যোগ্য উস্তাজগণের লেখালেখিতে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মুতাওয়াসসিতাহ জামাতেই শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় হিদায়াতুন্নাহু কিতাবের শরাহ রেওয়ায়াতুন নাহুর অনুবাদ করে শিক্ষকদের প্রশংসা কুড়ান। তিনি অনুবাদ ও গবেষণাধর্মী কিতাব রচনায় অধিক স্বাচ্ছন্নবোধ করেন। এ পর্যন্ত তার পাঁচটি অনুবাদগ্রন্থ ও 'কিতাব পরিচিতি' নামক একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এগারোটি পাণ্ডুলিপির কাজ চলমান।চারটি কিতাব প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন।

বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন একটি মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও অন্য একটি মাদরাসায় হাদিসের খেদমত করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর সফলতা কামনা করি।

ফিকহি মাকালাত ষষ্ঠ খণ্ডে যা আছে

- ট্রাফিক দুর্ঘটনার শরয়ি বিধান
- ঋণ ও ঋণপত্র বিক্রয় এবং তার শরয়ি বিধান
- অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ
- ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের বিধান
- কী পরিমাণ দুধপান করলে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিধান প্রযোজ্য হবে
- ইসলামে দাসত্বের বাস্তবতা
- সংশোধিত হদ বিল কী? নারী অধিকার সংরক্ষণ বিল
- সম্মিলিত ইজতিহাদ ও তার প্রয়োজনীয়তা

মাকতাবাতুল ইসলাম
ISBN 978-984-91049-1-9
www.maktabatul-islam.com